ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত

অর্থাৎ

নবদ্বীপের রাজবংশের বিবরণ।

মহারাজেন্দ্র বাহাদুর কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ রাজা ক্ষিতীশের
পুত্র ভট্টনারায়ণের বাঙ্গালায় আধিপত্য স্থাপনাবধি
বর্ত্তমান ক্ষিতীশচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত এই
রাজবংশের ইতিহাস

এবং

নবদ্বীপ প্রদেশের পূর্ব্বতন ও

অধুনাতন অবস্থা

শ্রীকার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত।

কলিকাতা।

নূতন সংস্কৃত যন্ত্র।

সংবৎ ১৯৩২।

মূল্য ১॥০ এক টাকা আট আনা।

PRINTED By Mathuranath Chatterjee,
14, Goa Bagan Street, Calcutta.
The New Sanskrit Press.

PUBLISHED By Harimohan Mookerjee.
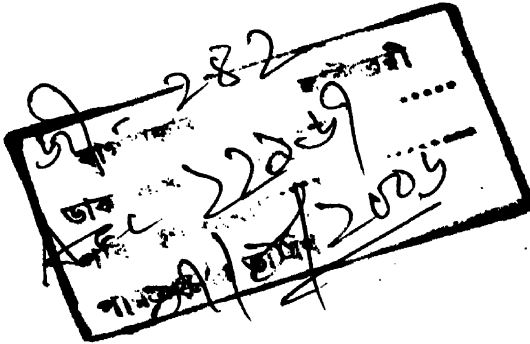
বিজ্ঞাপন।

ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত নামা পুস্তক প্রচারিত হইল। এই পুস্তকের প্রয়োজন ও প্রতিপাদ্য প্রভৃতি অবগত হইলেই, মাদৃশ ব্যক্তির ঈদৃশ বিষয়ে প্রয়াস কেন, এই সংশয় নিরাকৃত হইবে।

নবদ্বীপের রাজপরম্পরার যেরূপ ঐশ্বর্য্য ও আধিপত্য, মান সম্ভ্রম তদপেক্ষা অনেক গুণ অধিক। তন্মধ্যে কোন কোন রাজা এরূপ গুণজ্ঞ ও বদান্য ছিলেন, যে তাঁহারা এক এক জন এক এক দিক্‌পাল বলিয়া পরিগণিত হইয়া গিয়াছেন। পরিবর্ত্তপ্রিয় কাল-বায়ু তাঁহাদিগের বিভব-কুসুম দিন দিন বিশোষিত করিয়াছে বটে, কিন্তু যশঃ-সৌরভে অদ্যাপি অনেক স্থল আমোদিত ও অনেককে পরিতৃপ্ত করিতেছে। কথাক্রমে রাজপরিবারের প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে অনেকে উহা আগ্রহ সহকারে শুনিয়া থাকেন এবং কখন কখন প্রাচীন পরম্পরাগত পুরাতন ইতিহাস শুনিয়া কৌতূহল নিবৃত্তি করেন। এইরূপ শুশ্রূষাদর্শনে ও তাঁহাদের বর্ণনোচিত গুণগ্রামে প্রবর্ত্তিত হইয়া আমাকে এই পুস্তক প্রচারে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছে।

যৎকালে এই রাজবর্গের পূর্ব্বপুরুষেরা ঢাকা অঞ্চলে আধিপত্য করিতেন, সেই সময় হইতে আমার পূর্ব্বপুরুষেরা তাঁহাদের সংসারে দেওয়ানী প্রভৃতি প্রধান প্রধান পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। আমিও এই সংসারে চব্বিশ বৎসর দেওয়ানী ও দশবৎসর অন্যান্য কার্য্য করিয়াছি। আমার রাজানুগত পরিবারে জন্মগ্রহণ, দীর্ঘকাল রাজ-সংসারে স্বীয় সংস্রব, এবং রাজবাটীর পুরাতন কাগজ পত্র পাঠ প্রভৃতি উপায়ে এই বংশের বহুতর বর্ণনীয় বৃত্তান্ত সুতরাং সহজেই সংগৃহীত হইয়াছিল। এই নিমিত্ত কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমার মনে এই বাসনা উদ্বুদ্ধ হয়, যে যদি কোন যোগ্য ব্যক্তি এই রাজবংশের

ইতিহাস লিখিতে প্রবৃত্ত হন, তবে আমি যত্ন পূর্ব্বক যত দূর পারি, তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিয়া দিই। ইত্যবসরে মহারাজ সতীশচন্দ্র বাহাদুর হঠাৎ লোকান্তর গমন করিলেন এবং তৎপরিত্যক্ত সম্পত্তি কোর্ট অব্ ওয়ার্ডসের অধীন হইল। একতঃ মহারাজার বিরহে যার পর নাই কাতর, অপরন্তু উক্ত কোর্টের অধীনতা বশতঃ তৎকালে আমার অবকাশ নিতান্ত বিরল হইয়া উঠিল; সুতরাং পূর্ব্বোক্ত বাসনা অন্তঃকরণ হইতে এককালে অন্তর্হিত হইয়া গেল। কিছুকাল পরে আমার পরমাত্মীয় চব্বিশপরগণার ওয়ার্ডস ডিপার্টমেণ্টের ডেপুটী কালেকটর শ্রীযুক্ত বাবু কালীচরণ ঘোষ আমাকে লিখিলেন, "যিনি যে ওয়ার্ডের সম্পত্তির কর্ম্মাধ্যক্ষ হন, তিনি তত্তদ্বংশের ইতিহাস লিখিয়া কোর্টে অর্পণ করিয়া থাকেন; অতএব আপনি সম্প্রতি নবদ্বীপপতির কর্ম্মাধ্যক্ষ, তদ্বংশের একটি পুরাবৃত্ত লিখিয়া কোর্টে প্রদান করিবেন।" আমি তদীয় নিয়োগানুসারে এই রাজ পরিবারের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিয়া কতিপয় আত্মীয়কে দেখাইলাম। তাঁহারা পাঠ করিয়া কহিলেন "বঙ্গদেশবাসীদিগের এই রাজ-পরম্পরার যাদৃশ পুরাবৃত্ত পাঠে পরিতৃপ্তি জন্মে, তাদৃশ পুস্তক একাল পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই; অতএব তুমি এই বংশের এক খানি ইতিহাস পুস্তকাকারে প্রচারিত কর।" তাঁহাদের প্রবর্ত্তনায় আমার বিগত বাসনা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে, এবং অবিলম্বে আমি নিজেই এ বিষয় সাধনে প্রবৃত্ত হই। যদিও আমার অবকাশ নিতান্ত অল্প, তথাপি আমি এ বিষয়ে যথা-সাধ্য যত্ন করিতে কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই।

কিন্তু যত্ন থাকিলেও এদেশের কোন পুরাবৃত্ত লেখা যে সহজ ব্যাপার নয় ইহা অনেকেই জানেন। আমাদের দেশে ইতিহাস লিখিবার রীতি প্রায়ই ছিল না; সুতরাং, পুরাবৃত্ত সঙ্কলনে প্রবৃত্ত হইলে, পরম্পরাগত প্রবাদের উপরি অনেক নির্ভর করিতে হয়। সৌভাগ্যক্রমে এই রাজবংশের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সংগ্রহে আমার কিম্বদন্তীর প্রতি অধিক নির্ভর করিতে হয় নাই। ইতিহাস, পুরাতন কাগজ, ফরমান ইত্যাদি হইতে প্রায়ই এই ইতিহাস সংকলিত হইল।

কেবল যে সকল ঘটনা এই রাজবাটীতে বিশেষ রূপে প্রসিদ্ধ, এবং পুরুষ-পরম্পরায় অবগত, তাহা লিখিত প্রমাণ অভাবে বর্ণন করা গেল। যে সকল ফর্‌মান ও পুরাতন কাগজ পত্র হইতে এই ইতিহাসের অধিকাংশ সংকলিত হইল, তৎসমুদয় অদ্যাপি রাজবাটীতে বিদ্যমান আছে। পূর্ব্ব সংগৃহীত পুস্তকের মধ্যে, 'ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিতম্,' নামা গ্রন্থ হইতে অনেকাংশ গ্রহণ করা গিয়াছে। ঐ পুস্তক অতি সরল সংস্কৃত ভাষায় রচিত। ইহাতে কান্যকুব্জীয় ভট্টনারায়ণের বঙ্গদেশে উপনিবেশ হইতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুরের রাজ্যাভিষেক পর্য্যন্ত, এই রাজবংশের ইতিহাস সবিস্তর বর্ণিত আছে। এই গ্রন্থ প্রুসিয়া রাজ্যের বর্‌লিন রাজধানীর রাজ-পুস্তকাগারে ছিল। ১৮৫২ খৃঃ অব্দে, ডব্‌লিউ পর্শ (W. Pertsh) নামক জনৈক জর্ম্মাণ জাতীয় পণ্ডিত ইহা ইঙ্গরেজী অনুবাদের সহিত মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। ঐ পুস্তক ইদানীং ইউরোপের প্রায় সমস্ত প্রধান নগরে এবং কলিকাতার কোন কোন সাধারণ পুস্তকালয়েও বিদ্যমান আছে।

ভট্টনারায়ণ হইতে ষষ্ঠিদাস পর্য্যন্ত অষ্টাদশ পুরুষের ইতিহাস উক্ত পুস্তক ব্যতীত আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না। সুতরাং, এই কয়েক পুরুষের বৃত্তান্ত কেবল ঐ গ্রন্থের উপরি নির্ভর করিয়াই লিখিত হইল। যদিচ কাশীনাথ রায় ও তৎপুত্র রামচন্দ্র সমাদ্দারের জীবনচরিত সংক্রান্ত কোন কাগজ পত্র রাজবাটীতে দৃষ্ট হয় নাই, তথাপি এই রাজসংসারের প্রায় সকল প্রাচীন লোকেই তাঁহাদের ইতিবৃত্ত অবগত ছিলেন। ভবানন্দ মজুন্দার ও তৎপরবর্ত্তী পুরুষদিগের সময়ের অনেক কাগজ পত্র রাজবাটীতে বর্ত্তমান আছে। এই নিমিত্ত আমি এই কয়েক পুরুষের ইতিহাস সংগ্রহ জন্য, কেবল উক্ত ক্ষিতীশবংশাবলিচরিত মাত্র অবলম্বন করি নাই। যে স্থানে রাজবাটীর কাগজের সহিত উক্ত ক্ষিতীশ-বংশাবলিচরিতের অনৈক্য দেখিয়াছি, সে স্থানে ঐ কাগজকেই অগ্রগণ্য করিয়াছি; সুতরাং, কোন কোন স্থানে উক্ত গ্রন্থের সহিত আমার বর্ণনীয় বিষয়ের অনৈক্য হইয়াছে।

যবন রাজত্বকালে ও ইঙ্গরেজদের প্রথম সময়ে, এই রাজাদিগের অধিকারস্থ সমস্ত প্রদেশের অবস্থা, রীতি, নীতি, ধর্ম্ম, ব্যবসায়, বিদ্যা, বিচার, শাসনপ্রণালী ইত্যাদি যেরূপ ছিল, এই রাজাদের সহিত তৎসমুহের সবিশেষ সম্বন্ধ থাকাতে, আমি এই পুস্তকের প্রথম কয়েক অধ্যায়ে তদ্বৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম; এবং, এই রাজবংশীয়দিগের বাসস্থান, দিল্লীশ্বর দত্ত ফরমানের মর্ম্ম, রাজা ও রাজপুত্রদিগের রচিত সংস্কৃতকবিতা, রাজাদিগের কৃত বিচারের মীমাংসাপত্র, পৈতৃক সম্পত্তি দানের শাস্ত্রীয় ব্যবস্থা প্রভৃতি ইতিহাসের মধ্যে সন্নিবেশিত করিলে পাছে সকল পাঠকের প্রীতিজনক না হয়, এ নিমিত্ত, তৎসমুদয় পরিশিষ্টে লিখিত হইল।

পরিশেষে, সকৃতজ্ঞহৃদয়ে কহিতেছি এই গ্রন্থের সঙ্কলন বিষয়ে কৃষ্ণনগরস্থ কতিপয় সদ্বিদ্বান্ মহোদয় অনেক আনুকূল্য করিয়াছেন। বিশেষতঃ, শ্রীযুক্ত রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর ইতিহাসের সঙ্কলন বিষয়ে বহু সদুপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত লোহারাম শিরোরত্ন ও ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়েরা, পরিশ্রম স্বীকারপূর্ব্বক, পুস্তকের অনেকাংশ সংশোধন করিয়া দিয়াছেন।

ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিত।

প্রথম অধ্যায়।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অধিকার কালে তাঁহার রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ, দক্ষিণ সীমা গঙ্গাসাগর, পূর্ব্ব সীমা ধুলিয়াপুর ও পশ্চিম সীমা ভাগীরথী ছিল (১)। এতদ্ব্যতিরিক্ত ভাগীরথীর পশ্চিম পারে কুবেজপুর নামে এক বৃহৎ পরগণা অধিকৃত হইয়াছিল। এই রাজ্যের পরিমাণ ফল ৩৮৫০ বর্গক্রোশ। ইহা সুইজারলণ্ড রাজ্য অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ বৃহৎ। ইদানীং ইহার অধিকাংশ স্থান নদীয়া জেলার অন্তর্গত আছে, অবশিষ্ট অংশ চব্বিশপরগণা, মুরশিদাবাদ, যশোহর, এবং বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভূত হইয়াছে। এই অধিকারে ভাগীরথী, জলঙ্গী (খড়িয়া), ইচ্ছামতী, ভৈরব, রায়মঙ্গল, চূর্ণী, যমুনা এবং কতকগুলি ক্ষুদ্র নদী আছে। ইহার প্রধান নগর ও গ্রাম শান্তিপুর, নবদ্বীপ, কৃষ্ণনগর, হালিসহর, কলিকাতা, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ, কুশদ্বীপ, বহির্গাছি, শ্রীনগর, গোপালপুর প্রভৃতি; এবং প্রধান গঞ্জ, শান্তিপুর, কলিকাতা, কৃষ্ণগঞ্জ, হাঁস-

---

(১) রাজ্যের উত্তর সীমা মুরশিদাবাদ। পশ্চিমের সীমা গঙ্গা ভাগীরথী খাদ॥
দক্ষিণের সীমা গঙ্গাসাগরের ধার। পূর্ব্বসীমা ধুল্যাপুর বড় গঙ্গা পার॥
অন্নদামঙ্গল।

খালি, নবদ্বীপ এবং চক্রদ্বীপ ছিল। এই জমীঁদারীর সমস্ত ভূমি সমতল। কলিকাতার দক্ষিণ ও পূর্ব্ব খাড়িজুড়ি ও ধুলিয়াপুর প্রভৃতি কতিপয় পরগণা ব্যতীত অন্য কোন প্রদেশে বৃহৎ বন ছিল না। ইহার প্রায় সমস্ত ভূমি উর্ব্বরা। এই অধিকারে বিবিধ প্রকার আশু ও আমন ধান্য এবং সর্ব্বপ্রকার হরিৎ শস্য উৎপন্ন হয়। ইহার উত্তর অঞ্চলে তুত জন্মিয়া থাকে। এখানে আম্র, কাঁঠাল, নারিকেল, রম্ভা, দাড়িম্ব, আতা, জাম, নিচু, গোলাবজাম প্রভৃতি নানাবিধ সুস্বাদু ফল উৎপন্ন হয়। কলিকাতার সাত আট ক্রোশ উত্তর হইতে প্রায় মুরশিদাবাদ পর্য্যন্ত এ অধিকারস্থ সকল প্রদেশেরই জল বায়ু স্বাস্থ্যকর ছিল। বিশেষতঃ, খড়িয়া নদীর তটস্থ কৃষ্ণনগর প্রভৃতি গ্রাম সকলের জল বায়ু এতই উৎকৃষ্ট বলিয়া বিখ্যাত ছিল যে, বাঙ্গালার নানা অঞ্চলের লোক স্বাস্থ্য লাভার্থে কৃষ্ণনগরে আসিত। ১৮৩২ বা ৩৩ খৃঃ অব্দে যে সংক্রামক জ্বর বিকার আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহাতেই এই অধিকারের প্রায় সমস্ত গণ্ডগ্রাম ও বিস্তর পল্লীগ্রাম অস্বাস্থ্যকর হইয়া উঠে, এবং তন্নিবন্ধন বিস্তর লোকের অকালে আয়ুঃশেষ হয়। যদিও এ রোগ কোন স্থানে প্রায় চারি পাঁচ বৎসরের অধিক কাল ছিল না, কিন্তু যে স্থানে ইহার একবার আবির্ভাব হইয়াছিল, সে স্থান আর পূর্ব্বের ন্যায় স্বাস্থ্যজনক হইতে পারে নাই।

এই বিষম রোগ, ১৮২৪ কি ২৫ খৃঃ অব্দে, যশোহর জেলার অন্তর্গত মহম্মদপুর গ্রামে প্রথমে দৃষ্ট হয়। ক্রমশঃ দালগা, নলডেঙ্গা ও চাসড়া গ্রামে যায়। কিয়ৎকাল পরে ভৈরব নদের কূলবর্ত্তী কশবা প্রভৃতি অন্য অন্য গ্রামে উপস্থিত হয়। ১৮৫৫ কি ৫৬ খৃঃ অব্দে, গদখাট গ্রাম উচ্ছিন্ন করে। তদনন্তর, নিজ যশোহর নগর ও তৎসন্নিহিত অনেক গ্রামবাসীরা বহুকাল পর্য্যন্ত এই রোগে

যৎপরোনাস্তি ক্লেশ পায়। ১৮৩২ কি ৩৩ অব্দে, যশোহর হইতে নদীয়া জেলায় প্রবেশ করিয়া প্রথমে গদখালি গ্রাম আক্রমণ করে, তদনন্তর, গুয়াতেলি, কাঁদবিলা ও সুপপুখুরিয়া গ্রামে উপস্থিত হয়। ১৮৩৫ কি ৩৬ অব্দে, এই তিন গ্রাম উৎসন্ন হইয়া যায়। ১৮৪০ অব্দে ইহা পুনরায় গদখালি আক্রমণ করিয়া প্রায় জনশূন্য করে। ১৮৪৪। ৪৫ অব্দে শ্রীনগর গ্রামে আসিয়া দীর্ঘকাল অবস্থিত হয়। ঐ গ্রাম উচ্ছিন্ন করণানন্তর, গোপালনগর, বাহুরামপুর, দিগড়ে, চৌবাড়িয়া, শিমুলিয়া, গাঙ্গসারি প্রভৃতি কয়েক গ্রাম উচ্ছিন্ন দেয়। ১৮৫০। ৫১ অব্দে, শ্রীনগরের ছয় ক্রোশ দক্ষিণ গৌরপোঁতা গ্রামে দেখা দেয়। তদনন্তর, দেবগ্রাম, মাঝের কালী, মুড়াগাছি, এবং অন্য অন্য গ্রামের মধ্য দিয়া, ১৮৫৬খৃঃ অব্দের বর্ষাকালে, উলাতে (বীর নগর) আইসে। তথা হইতে ১৮৫৭ খৃঃ অব্দে, রাণাঘাটের নিকটবর্ত্তী আনুলিয়া, কায়েতপাড়া, জগপুর দিয়া চাকদহ পর্য্যন্ত যায়, এবং ঐ স্থান হইতে অনেক গ্রাম ধ্বংস করিতে করিতে ১৮৫৯ অব্দে কাঁচড়াপাড়ায় উপস্থিত হয়, এবং তথা হইতে দক্ষিণ দিকে যাইয়া হুগলির উত্তর পূর্ব্বাংশে ও প্রায় সমস্ত বারাশত জেলায় বিস্তারিত হইয়া পড়ে। এ দিকেও ঐ তিন বৎসরের মধ্যে উলার সন্নিহিত বারাশত, বাদকুল্লা, খামার শিমুলিয়া প্রভৃতি গ্রামে ব্যাপ্ত হয়। ১৮৫৯। ৬০ অব্দে, ফুলে, বেলগড়িয়া, মালিপোঁতা দিয়া শান্তিপুরে আইসে। ১৮৬০ অব্দে, শান্তিপুরের উত্তর গোবিন্দপুর, দিগ্‌নগর, ও তন্নিকটবর্ত্তী অনেক গ্রাম আক্রমণ করে।

১৮৬৪ খৃঃঅব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে, কৃষ্ণনগরে দেখা দেয় এবং ১৮৬৭ অব্দ পর্য্যন্ত থাকিয়া নগরবাসীদিগের প্রায় তৃতীয়াংশ ধ্বংস করে।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময়ে, এই জমীদারীর অন্তর্ব্বর্ত্তী ৪৯ পরগণা

এবং ৩৫ কিস্‌মথ (পরগণার কিয়দংশ) ছিল (১)। পরগণার নাম, নদীয়া, উখ্‌ড়া, পাঁচনওর, মানপুর, মূলগড়, বাগোয়ান, মহৎপুর, রায়পুর, সুলতানপুর, সুলতান বেদারপুর, উলা, সাহাপুর, ফতেপুর, লেপা, মারুপদহ, উমরপুর, গড়ুই টবি, রায়সা, জাফরপুর, ভালুকা, সগুণা, মার্টিয়ারি, এঙ্গুরিয়া, কাশিমপুর, গয়াশপুর, আলানিয়া, মহিষপুর, ইস্‌লামপুর, খাড়ি জুড়ি, মামুদপুর, কলারোয়া, এসমহিলপুর, শান্তিপুর, রাজপুর, নাটাগড়ি, আমিরনগর, মগুণ্ডা, আলমপুর, কুখরালি, চারঘাট, খাজরা, হলদহ, ইন্দুরখালি, খালিশপুর, ভাৎসিংহপুর, বেলগাঁও, আষাড়শেনী, বুড়ন, খানপুর; এবং কিসমথের নাম, হালিসহর, হাজরাখালি, পাইকান, মানপুর, কলিকাতা, আমিরাবাদ, আমিরপুর, খোশদহ, আনারপুর, বালিয়া, পাইকহাটি, বালান্দা, কাথুলিয়া, মাইহাটি, জামিরা, পারধুলিয়াপুর, মুর্ব্বই, নমক ও মোন, ধুলিয়াপুর, কুবাজপুর, জয়পুর, ভালুকা, বাগমারি, হোসেনপুর, হিলকি, তালা, কাটশালি, শোভনালি, পলাসি, বেহারোল, সহনন্দ, ভাবসিংহপুর, হাট আলমপুর, সিলেমপুর, আকদহ।

এই সকল পরগণা ও কিসমতের মধ্যে ইদানীং কলিকাতা পরগণা অতি প্রসিদ্ধ। প্রথমে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের প্রপিতামহ রাজা রুদ্র রায় ইহার চারি আনা এক গণ্ডা অংশ প্রাপ্ত হন। এই অংশের রাজস্ব ৬২৫৪৸১৭ অবধারিত ছিল। পরে রুদ্রের পুত্র রাজা রামজীবন রায়, বাং ১১১৬ অব্দে, রামশরণ ও রহমতুল্লা এই দুই ব্যক্তির অংশ পান। এই অংশের রাজস্ব ৩৮২৬৷৶ ছিল। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র

---

(১) অধিকার রাজার চৌরাশী পরগণা। খাড়ি জুড়ি আদি করি দপ্তরে গণনা॥

অন্নদামঙ্গল।

আর কিয়দংশ বর্দ্ধিত করিলে, ইহার মোট রাজস্ব ১৬৭৪৭(১১। ধার্য্য হয়।

যবন রাজত্বকালে, মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের অধিকারে উল্লিখিত ৮৪ পরগণা ও কিসমথের মোট রাজস্ব ৬৫০৮০৬(১৭৫ টাকা অবধারিত ছিল, তদতিরিক্ত পেশকশ বলিয়া আর ২৫০০০ টাকা দিতে হইত। নির্দ্ধারিত রাজস্বের প্রায় হ্রাস বৃদ্ধি হইত না, পুরুষানুক্রমে প্রায় এক পরিমাণেই থাকিত। রাজা রুদ্রের অধিকার হইতে তাঁহার প্রপৌত্র রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত ইহাদের সকল পরগণার রাজস্ব একরূপ ছিল, ইহা রাজবাটীর কাগজে স্পষ্ট প্রকাশ আছে। কোন কোন নবাব, নজরানা বা পেশকশ বলিয়া, যেমন ইহাঁদের নিকট হইতে কখন কখন অনেক টাকা লইতেন, তেমন আবার ইহাঁরাও সময় বিশেষে অনেক রাজস্ব ক্ষমা পাইতেন। খাজানা বাকী পড়িলে মহাল নিলাম হইত, ইংরেজ অধিকারের পূর্ব্বে আর এরূপ শুনা যায় নাই। নবাবেরা ভূম্যধিকারিগণকে বন্দীভূত করিয়া, অথবা তাঁহাদের জমীদারীতে ক্রোক সাজওয়াল দিয়া, বাকী রাজস্ব আদায় করিয়া লইতেন, এবং কখন কখন মহাল খাস করিয়া অন্যের সহিত বন্দবস্ত করিতেন।

রাজা ভবানন্দ হইতে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অধিকার পর্য্যন্ত এই জমীদারী ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। অন্য কোন জমীদার রাজস্ব প্রদানে অশক্ত হইলে ইহাঁরা তাঁহার জমীদারী সম্রাটের নিকট বন্দবস্ত করিয়া লন, এবং কোন কোন জমীদারী অন্য জমীদারের নিকট ক্রয় করিয়া সম্রাট্ সন্নিধানে তাহার ফরমাণ (রাজ সনন্দ) গ্রহণ করেন (১)। ফরমাণের প্রথমে পরগণার নাম ও তাহার

---

(১) কোন কোন পরগণা ইহাঁরা বল পূর্ব্বক অধিকার করেন, এরূপ প্রবাদও আছে।

রাজস্বের পরিমাণ উল্লিখিত হইত, তৎপরে সচরাচর এইরূপ বর্ণনা থাকিত যে "*প্রজাগণ যে নির্দ্ধারিত রাজস্ব দিয়া থাকে, তাহার অধিক এক কপর্দ্দকও লইবে না, এবং ছলে বা কৌশলে তাহাদের নিকট আর কিছু লইবে না।* তাহাদিগকে সুখে রাখিতে যত্ন করিবে, এবং তাহাদের প্রতি কেহ কোন দৌরাত্ম্য করিতে না পারে তদ্বিষয়ে যত্নশীল থাকিবে। কাহারও জায়গিরের (নিষ্কর ভূমি) প্রতি হস্ত প্রশারণ করিবে না। জমীদারীর উন্নতি সাধনে নিরন্তর যত্ন করিবে, এবং নির্দ্ধারিত রাজস্ব প্রদান পূর্ব্বক আমার সরকারের মঙ্গলাভিলাষী থাকিবে।"

পূর্ব্বকালে এই অধিকারের মধ্যে শস্য ক্ষেত্রের কর গড় পড়্তায় প্রতি বিঘায় দুই আনা ছিল। বাস্তু ও বাগানের ভূমির কর গড়ে প্রতি বিঘায় দুই টাকার অধিক ছিল না। নিষ্কর ভূমির খাজানা আরও অল্প ছিল। প্রায় প্রতি গ্রামে নিষ্কর ভূমি থাকাতে কৃষিজীবীদিগের অতিশয় সুবিধা ছিল। যে সকল নিষ্কর ভূমির অধিকারিগণ নিজে কৃষিজীবী, তাঁহাদের ভূমিতে শস্য না জন্মিলেও ভূমির কর দিতে হইবে না বলিয়া, তাঁহারা বিশেষ ক্লেশ অনুভব করিতেন না। যাঁহারা অন্যের নিষ্কর ভূমির উপস্বত্বভোগী, তাঁহাদের, মালের ভূমির কর অপেক্ষা অল্প কর দিতে হইত, এবং তাহাও নির্দ্ধারিত সময়ে দিতে হইত না বলিয়া, তত ব্যস্ত হইতে হইত না। ইদানীং এই সকল নিষ্কর ভূমির কিয়দংশ গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক, ও কিয়দংশ ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক, সকর হওয়াতে, নিষ্কর ভূমির পরিমাণ অতি ন্যূন হইয়া গিয়াছে, এবং সেই সঙ্গে প্রজাদিগের এই সুবিধাটিও লুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

অধুনা ভূম্যধিকারিগণ প্রজার নিকট ভূকর ব্যতীত অন্য যে সকল কর লইয়া থাকেন, যবনাধিকারে ভূম্যধিকারীরা তদতিরিক্ত

অনেক প্রকার কর লইতেন। তৈলকার, কুম্ভকার, কর্ম্মকার *স্বর্ণকার, সূত্রধর, গাঁড়ার, গোপ, ক্ষুরী, রজক, তন্তুবায় প্রভৃতি ব্যবসায়িগণ স্ব স্ব ব্যবসায়ের জন্য ভূম্যধিকারীকে কিছু কিছু কর* দিত। ভূকরের ন্যায় এ সকল করও জমাওয়াসিলবাকী ভুক্ত হইত। যদিও ১৭৯৩ অব্দের অষ্টম বিধি অনুসারে এইরূপ অর্থ গ্রহণ নিষিদ্ধ হয়, তথাপি ভূম্যধিকারীরা, বহুকালাবধি, এই প্রকার বিধি-বিরুদ্ধ কর গ্রহণে ক্ষান্ত হন নাই, বরং কোন কোন ভূম্যধি-কারী এখনও লইয়া থাকেন। পূর্ব্বে ভূমির কর অল্প থাকাতে রাইয়তেরা এই রূপ অর্থ প্রদানে কাতর হইতেন না, বরং ইচ্ছা-পূর্ব্বক দিতেন, এবং জমীদারের শুভাশুভ কর্ম্মকাণ্ডে যথেষ্ট সাহায্যও করিতেন। উপায়ক্ষম সন্তানেরা যে রূপ প্রসন্ন চিত্তে পিতার সাহায্য করেন, তৎকালীন রাইয়তেরাও সেই রূপে জমী-দারের আনুকূল্য করিতেন। কিন্তু ভূম্যধিকারী কর্ত্তৃক ভূমির কর যতই বর্দ্ধিত হইতেছে, ততই তাঁহারা এই সকল কর প্রদানে অসম্মতি প্রকাশ ও আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন্।

ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্বে বঙ্গদেশে পত্তনি, দরপত্তনি, ছেপত্তনি ইত্যাদি বন্দবস্ত প্রচলিত ছিল না, এবং যদিও তালুকদারী বা ইজারা বন্দবস্তের প্রথা ছিল, তথাপি নদীয়ার রাজারা, প্রজাগণ অন্যের অধীন হইবে বলিয়া, তাদৃশ বন্দবস্ত করিতেন না। কর সংগ্রহার্থ প্রত্যেক পরগণায় একজন নায়েব, ও প্রতি গ্রামে একজন গোমস্তা, নিযুক্ত রাখিতেন, এবং তাঁহারা স্বীয় কর্ম্ম সম্পাদনে শৈথিল্য বা প্রবঞ্চনা করিলে, তাহাদিগকে কারারুদ্ধ করিতেন অথবা অন্য রূপ শাস্তি দিতেন। যদিও এরূপ প্রণালী দ্বারা কর সংগ্রহ ব্যাপার সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হইত না, তথাপি প্রজার সহিত চির নিঃসম্বন্ধ হইবে মনে করিয়া, ভূম্যধিকারিগণ

তালুকদারী বন্দবস্ত করণে নিতান্ত নিরুদ্যম থাকিতেন। যৎকালে এই অধিকারের জমীদার রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রায় জমীদারী দশশালা বন্দবস্ত করিয়া লইলেন, তাহার কিঞ্চিৎ কাল পরেই নদীয়া জেলার দেওয়ানী ও কালেক্টরী প্রভৃতি পদাভিষিক্ত কোন সাহেব, এ জেলা পরিত্যাগ কালে, রাজাকে কহিলেন,"আপনি কর সংগ্রহার্থ প্রজা, নায়েব, গোমস্তা প্রভৃতিকে কারারুদ্ধ ও উৎপীড়িত করিয়া থাকেন, ইহা জানিয়াও প্রণয়ানুরোধে আমি আপনার প্রতি রাজ-নিয়মানুযায়ী কার্য্য করি নাই, কিন্তু যিনি আমার স্থলাভিষিক্ত হইয়া আসিতেছেন, তিনি কখনই আপনাকে এরূপ বিধি-বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে দিবেন না। অতএব যত শীঘ্র পারেন, জমীদারী খাসে না রাখিয়া তালুকদারী অথবা অন্য কোনরূপ পাকা বন্দবস্ত করি-বেন।" যদিচ জমীদারী খাস তহসিলে রাখাতে রাইয়তের নিকট খাজানা বাকী পড়িতে লাগিল, এবং তন্নিমিত্ত রাজস্ব অপরি-শোধিত থাকাতে পরগণা সকল উপর্য্যুপরি নিলাম হইতে আরম্ভ হইল, তথাপি রাজ্যসম্বন্ধ বন্ধন শিথিল হইবে শঙ্কা করিয়া ঐ রাজপুরুষের সদুপদেশানুযায়ী কার্য্য করিতে পারিলেন না।

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে যে যবন রাজত্ব কালে রাজস্ব অপরিশোধিত থাকিলে জমীদারী নিলাম হইয়া যাইত না, একারণ তৎকালে তালুকদারী বা অন্য কোন প্রকার চিরস্থায়ী বন্দবস্ত করি-বারও প্রয়োজন হইত না। রাজারা ভূম্যধিকারীর নিকট যে প্রণালীতে রাজস্ব আদায় করিয়া লইতেন, ভূম্যধিকারিগণও সেই প্রণালীতে প্রজার স্থানে কর সংগ্রহ করিতেন। এদেশ ইঙ্গরেজ অধিকৃত হইলেও ভূম্যধিকারীরা আপন আপন জমীদারী যে কয়েক বৎসর মেয়াদী বন্দবস্ত করিয়া লন, তাহার মধ্যেও প্রায় কোন জমীদার স্বীয় জমীদারীর কোন অংশের তালুকদারী বন্দবস্ত করেন

নাই। পরে যখন দশসালা বন্দবস্ত চিরস্থায়ী বন্দবস্তরূপে পরিগণিত হইল, সেই কালাবধি সুবিস্তীর্ণ জমীদারীর অধিকারীরা, নির্দ্ধারিত সময় মধ্যে রাজস্ব পরিশোধে অসমর্থ হইলে জমীদারী হস্তান্তরিত হইবে দেখিয়া, যাহাতে কোন নিরূপিত কাল মধ্যে সমস্ত কর সংগৃহীত হয় তদ্বিষয়ে অনেক চিন্তা করিয়া, অবশেষে তালুকদারী বন্দবস্ত করিবার মানস করিলেন। যদিও ১৭৯৩ খৃঃঅব্দের ৪৪ আইন দ্বারা দশ বৎসরের অধিক মেয়াদে জমীদারীর মফস্বল বন্দবস্ত করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল, তথাচ কোন কোন জমীদার এইরূপ বন্দবস্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। পরে, ১৭৯৩ অব্দের ৪৪ আইনের ব্যবস্থা, ১৮১২খৃঃ অব্দের পঞ্চম আইন দ্বারা, রহিত হওয়াতে তালুকদারী বন্দবস্তকরিবার রীতি আরও প্রচলিত হইল, এবং ক্রমশঃ জমীদারকে পণ দিয়া তালুকদারী পাট্টা লইবার প্রথা হইয়া উঠিল, আর ঐরূপ তালুক পত্তনি-তালুক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। পরে ক্রমে ক্রমে দর-পত্তনি, সে-পত্তনী, চাহার-পত্তনীর সৃষ্টি হইয়া উঠিল। পূর্ব্বকালীন ভূম্যধিকারীদিগের মধ্যে যাঁহারা যে পরিমাণ আপন আপন জমীদারীর ঐরূপ বন্দবস্ত করেন, তাঁহাদের সেই পরিমাণে জমীদারী স্থিরতর থাকে। বঙ্গদেশ মধ্যে বর্দ্ধমানের রাজারা আপনাদের প্রায় সমস্ত জমীদারী এইরূপ বন্দবস্ত করেন, এ কারণ তাঁহাদের জমীদারী প্রায় কিছু মাত্র ক্ষয় প্রাপ্ত হয় নাই।

পূর্ব্বে চিরস্থায়ী তালুকদারী বন্দবস্ত করিবার যে নিষেধ ছিল, যদিও তাহা ১৮১২ খৃঃ অব্দের পঞ্চম আইন দ্বারা রহিত হয়, কিন্তু চিরস্থায়ী বন্দবস্ত করণের স্পষ্ট বিধি প্রচারিত হয় নাই, তথাপি অনেক জমীদার তালুকদারী বন্দবস্ত করণে প্রবৃত্ত হন; এবং যদিও জমীদার, ঐরূপ তালুকের খাজনা অবিলম্বে আদায়ের নিমিত্ত তালুকের এক বর্ষের কিছু মাত্র খাজনা দ্বিতীয় বৎসরের প্রথম

মাসের মধ্যে পরিশোধিত না হইলে, পত্তনী তালুক স্বীয় ক্ষমতায় খাস করিয়া লইব ইত্যাদি কঠিন পণ সকল পত্তনীদারের কবুলতিতে লিখিয়া লইতেন, তথাপি পত্তনীদার সহজে খাজনা নিয়ম মত না দিলে, জমীদার ঐখাজনা শীঘ্র আদায় করণার্থ কোন আইনের সাহায্য পাইতেন না। এ কারণ গবর্ণমেণ্ট, ১৮১৯ খৃঃ অব্দের অষ্টম আইন দ্বারা, এই আদেশ করিলেন যে, পত্তনী দরপত্তনী প্রভৃতি যে সকল চিরস্থায়ী বন্দবস্ত হইয়াছে ও হইবেক, তাহা স্থিরতর থাকিবেক, এবং জমীদার, প্রত্যেক ষাণ্মাসিক খাজনা আদায়ের নিমিত্ত, কালেক্টর সাহেবের সহায়তায় তালুক নিলাম করিতে পারিবেন।

এই অষ্টম আইন ভূম্যধিকারীদিগের পক্ষে যেমন হিতকর হইল রাইয়তদিগের পক্ষে তেমনই অহিতকর হইয়া উঠিল। যদিচ পূর্ব্বে পত্তনী বন্দবস্ত আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু কোন অনুকূল আইন অভাবে সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় নাই। এক্ষণে এই আইন প্রচারিত হওয়াতে এই বন্দবস্তের রীতি সাধারণ হইয়া উঠিল, এবং তৎসঙ্গে রাইয়তদিগের কষ্টবৃদ্ধি হইতে লাগিল। যে হেতুক, জমীদার, বর্ত্তমান লাভের সমুদায় বা অধিকাংশের অধিকারী থাকিতে পারেন, এইরূপ জমা অবধারিত করিয়া জমীদারী পত্তনী দেন। রাইয়তেরা যে জমা জমীদারকে দিতেন তাহা বৃদ্ধি না করিলে পত্তনীদারের লাভ থাকে না, সুতরাং পত্তনীদার, যেরূপে হয়, রাইয়তদিগের পূর্ব্ব জমা বৃদ্ধি করিয়া লন। এইরূপে পত্তনী, দর-পত্তনী, সে-পত্তনী প্রভৃতি যত প্রকার পত্তনী বন্দবস্ত ক্রমাগত হইতে থাকে, ততই রাইয়তদিগের জমাও ক্রমশঃ বৃদ্ধি হইয়া উঠে। যতকাল কোন জমীদারী জমীদারের হস্তে থাকে, ততকাল এইরূপে জমা বৃদ্ধি করিবার বিশেষ প্রয়োজন হয় না, এবং রাইয়তগণেরও কোন অসুখ জন্মে না। আমরা

দেখিয়াছি যে, নদীয়া জেলার যে সকলপ্রদেশ যাবৎ পুরাতন জমী-দারের হস্তে ছিল, তাবৎ সেই সেই প্রদেশের রাইয়তগণের জমা কখনও বৃদ্ধি হয় নাই।

যদিও ১৭৯৩ অব্দের অষ্টম ও চতুর্থ আইন দ্বারা স্পষ্ট আদেশ হইয়াছিল যে, জমীদারগণ রাইয়তদিগকে তাহাদের অধিকৃত ভূমির পাট্টা অবশ্য দিবেন, এবং তাহারা প্রার্থনা করিলে যদি পাট্টা না দেন, তবে এ বিষয় ধর্ম্মাধিকরণে প্রমাণ হইলে, দণ্ডগ্রস্ত হইবেন, তথাপি পূর্ব্বকালে পাট্টা লইবার ও দিবার প্রথা নদীয়ার রাজাদিগের অধিকার মধ্যে সম্পূর্ণ প্রচলিত ছিল না। নায়েব ও গোমস্তার স্বাক্ষরিত দুই এক খানি পাট্টা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু রাজাদিগের প্রকৃত স্বাক্ষরিত ও মুদ্রাঙ্কিত পাট্টা এক খানিও নয়নগোচর হয় না। অধিকাংশ রাইয়ত ওট্‌বন্দি নিয়মে ভূমি আবাদ করিত, এবং তাহা চিরদিনের জন্য রাখিবার বাসনা হইলে, নায়েব বা গোমস্তাকে কিঞ্চিৎ অর্থ দিয়া, জমাওয়াসিলবাকিতে তাহার নাম ও জমার সংখ্যা লেখাইত, অথবা নায়েব বা গোমস্তার স্বাক্ষরিত পাট্টা লইত। কিন্তু পাট্টা প্রদানের ক্ষমতা কোন নায়েব বা গোমস্তার প্রতি অর্পিত হইত, ইহা কখন আমাদিগের শ্রবণ-গোচর হয় নাই। বিশেষ অনুগ্রহপাত্র ব্যতীত, রাজারা স্বীয় স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত পাট্টা কোন রাইয়তকে দিতেন না। রাজাদিগের স্বাক্ষরিত ও মোহরাঙ্কিত যে সকল পাট্টা কখন কখন দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা প্রায় সকলই কৃত্রিম।

এই রাজাদিগের জমীদারীর চতুর্থাংশ ভূমি নিষ্কর ছিল। রাজারা আপনাদের কুটুম্ব, প্রধান বা প্রিয় ভৃত্য, এবং শ্রদ্ধাস্পদ ব্রাহ্মণকে অধিক ভূমি নিষ্কররূপে দান করিতেন। এতদ্ব্যতীত কুটুম্ব ও প্রধান ব্রাহ্মণ ভৃত্যদিগের জামাতারাও নিষ্কররূপে ভূমি

পাইতেন। অধিকারস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণকে তাঁহাদের বাসোপযুক্ত ভূমি নিষ্কররূপে দেওয়া হইত। এমন কি, এ প্রদেশে অদ্যাপি এ কথা প্রচলিত আছে, যে, যে ব্রাহ্মণের নিষ্কর ভূমিতে বাস নয়, তিনি ব্রাহ্মণই নহেন। এইরূপ ভূমিদানের কোন নির্দ্দিষ্ট নিয়ম ছিল না। রাজারা, যাহার প্রতি যেরূপ সদয় হইতেন, তাঁহাকে সেই পরিমাণ ভূমি দান করিতেন। নিকট কুটুম্ব বা অধ্যাপক বিশেষকে কখন কখন সমগ্র গ্রাম নিষ্কররূপে প্রদত্ত হইত। শূদ্র বর্ণের মধ্যে বিশেষ কৃপাপাত্র বা বিশেষ গুণভাজন ব্যতীত কোন ব্যক্তিকে নিষ্কররূপে ভূমি প্রদত্ত হইত না। রাজারা, যবনজাতীয়-দিগকে, কেবল তাঁহাদের দেব সেবার ব্যয়ের নিমিত্ত, ভূমি দান করিতেন। যখন যে রাজা কোন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিতেন, তখন তিনি তাঁহার ব্যয় নির্ব্বাহ যোগ্য কোন গ্রাম বা গ্রামের কিয়দংশ ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিতেন, এবং নিজ অধিকার মধ্যে অন্য কেহ কোন দেবমূর্ত্তি স্থাপিত করিবার প্রার্থী হইলে, ঐ বিগ্র-হের সেবার্থ ভূমি দান করিতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় তাঁহার দুই রাণীকে নানা গ্রামের অনেক ভূমি নিষ্কর রূপে দিয়া যান। জ্যেষ্ঠা রাণীর অংশ বড়দেউড়ি নামে ও কনিষ্ঠা রাণীর অংশ ছোটদেউড়ি নামে প্রসিদ্ধ আছে। প্রজা রঞ্জনার্থ প্রতিগ্রামের গাজনের শিবের সেবার ও চড়কের খরচের জন্য ভূমি প্রদত্ত হইত। এই-রূপে জমীদারীর অনেক ভূমি নিষ্কর হইয়া উঠে। যে ভূমি, হিন্দুদি-গের দেবসেবার্থ দেওয়া হয়, তাহা দেবোত্তর, যে ভূমি, যবনদিগের দেবতার নিমিত্ত, প্রদত্ত হয়, তাহা পিরোত্তর, যে ভূমি ব্রাহ্মণকে দান করা হয়, তাহা ব্রহ্মত্বর, এবং যে ভূমি, শূদ্রকে দেওয়া হয়, তাহা মহত্তরাণ নামে খ্যাত আছে।

এই জমীদারীর মধ্যে আরও দুই প্রকারে কতক ভূমি নিষ্কর হই-

য়াছে। প্রথম প্রকার,—যে সকল শূদ্র জাতীয় ব্যক্তি রাজসংসারে নিযুক্ত থাকিত, তাহাদের মধ্যে কোন কোন ভৃত্যকে, নগদ বেতনের পরিবর্ত্তে, ভূমি দেওয়া হইত। এইরূপ ভূমির নাম চাকরাণ। চাকরাণ দুই প্রকার, খুঁটি ও বেখুঁটি। খুঁটি চাকরাণ সকর ও বেখুঁটি চাকরাণ নিষ্কর। যে সকল ভৃত্য সকর চাকরাণ পাইত, তাহারা ঐ ভূমির যৎকিঞ্চিৎ কর দিত, এবং যে ভৃত্যগণ নিষ্কর চাকরাণ পাইত তাহারা তাহা নিস্করে ভোগ করিত। যাহারা পুরুষানুক্রমে নিযুক্ত থাকিত, তাহারা ঐভূমি পুরুষানুক্রমে ভোগ করিতে থাকিত। যাহারা কর্ম্মচ্যুত হইত তাহাদের চাকরাণ রাজসংসারে প্রতিগৃহীত হইত অথবা অন্য ভৃত্যকে দেওয়া যাইত। যৎকালে, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিষ্কর ভূমির তায়দাদ করিবার আদেশ প্রচারিত হয়, সেই সময়ে, ঐচাকরাণ ভোগীদিগের মধ্যে অনেকে স্ব স্ব চাকরাণ ভূমি নিষ্কর উল্লেখ করিয়া তাহার তায়দাদ করিয়া লয়। দ্বিতীয় প্রকার ;—পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে অনেকেই কৃষিজীবী ছিলেন এবং তাঁহারা অন্য শ্রেণীর ন্যায় গ্রামের মালের ভূমি জমা রাখিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেকে আপনাদের জমাই ভূমির কিয়দংশ নিজের ব্রহ্মোত্তর বলিয়া প্রচার করিতেন এবং অবশেষে তাহার তায়দাদ করিয়া লইলেন। অনেক শূদ্রগণও আপন আপন জমাই ভূমি ঐ রূপে মহত্তরাণ করিয়া লন। এতদ্ব্যতীত গ্রামের মণ্ডল ও হালশানা প্রভৃতিরা মালের কতক কতক ভূমি নিষ্কর করিয়া লয়।

এ প্রদেশে নীলের চাস প্রবর্ত্তিত হইলে অধিবাসীদিগের অবস্থার যেরূপ পরিবর্ত্ত হয় সেরূপ আর কিছুতেই হয় নাই। কোম্পানির বাঙ্গালার দেওয়ানীর সনন্দ প্রাপ্তির অব্যবহিত পরেই কতিপয় ইঙ্গরেজ নবদ্বীপ অধিকার মধ্যে নীলের কুটী স্থাপন

করেন, এবং এই ব্যবসায়ের লাভ দর্শনে ক্রমশঃ নীলকরের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে থাকে। তাঁহারা নীলপাত উৎপাদনের জন্য নিজ আবাদ ও রাইয়তি আবাদ এই দুই প্রণালী অবলম্বন করেন। যে ভূমি নিজ আবাদ থাকিত, তাহার কতকাংশ নিজ ভৃত্য দ্বারা আবাদ করাইতেন, ও কতকাংশ রাইয়তের দ্বারা আবাদ করিয়া, লইতেন। রাইয়তী আবাদের বিবরণ এই যে, প্রত্যেক রাইয়ত যে পরিমাণ ভূমি আবাদ করিবে, তাহার একটা নির্দ্ধারণ করিয়া তাহাকে কিছু টাকা অগ্রে দাদন করিতেন, এবং তাহার দ্বারা এই মর্ম্মে এক অঙ্গীকার পত্র লেখাইয়া লইতেন যে "আমি আপনার নিকট এত টাকা দাদন লইয়া এই অঙ্গীকার করিতেছি যে, আমি এত বৎসর পর্য্যন্ত এত পরিমাণ উত্তম উর্ব্বরা ভূমি যথোচিত রূপে আবাদ করিয়া তদুৎপন্ন নীলপাত আপনার অমুক কুটীতে পৌঁছিয়া দিব। যদি কোন দুষ্টাভিসন্ধি করিয়া ইহার অন্যথা করি, তবে আপনার যে ক্ষতি হইবে, তাহার দায়ী আমি ও আমার উত্তরাধিকারী হইব ও হইবেন।" এক বৎসর হইতে দশ বৎসর পর্য্যন্ত এই অঙ্গীকার পালনের নিয়ম হইত। রাইয়তকে প্রতি বিঘায় দুই টাকা দাদন দেওয়া যাইত। রাইয়তের যে ভূমি উত্তম উর্ব্বরা ও উত্তম রূপে কর্ষিত হইত, তাহাতেই কুটীর ভৃত্যেরা নীল বপনের জন্য চিহ্নিত করিয়া দিত। নীলপাত পরিণত হইলে, রাইয়ত নিজ ব্যয়ে তাহা ছেদন করিয়া নির্দ্দিষ্ট কুটীতে উপস্থিত করিত। নীলগাছ প্রতি টাকায় ৪ বা ৬ অথবা ৮ বাণ্ডিল করিয়া লওয়া হইত। ৬ ফিট শিকলের মধ্যে নীলগাছের মধ্যদেশ যত ধরিতে পারে তাহাই বাণ্ডিল বলিয়া গৃহীত হইত। আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে নীলপাতের হিসাব করিয়া প্রত্যেক রাইয়তের প্রদত্ত নীলপাতের যে মূল্য অবধারিত হইত, তাহা হইতে দাদনের

টাকা, অঙ্গীকার পত্রের ইষ্ট্যাম্পের মূল্য, এবং প্রতি বিঘার নীল-বীজের মূল্য চারি আনা হিসাবে কর্ত্তন করিয়া লওয়া যাইত।

যে পরিমাণ দাদন রাইয়তের অঙ্গীকার পত্রে লিখিত হইত, সকল নীলকরগণ, তাহা সম্পূর্ণ রূপে দিতেন না। যাহা দিতেন, তাহারও কিয়দংশ আবার এ দেশীয় ভৃত্যেরা গ্রাস করিতেন। *প্রায়ই অধার্ম্মিক লোক নীলকর সাহেব দিগের কর্ম্মে নিযুক্ত* হইত। তাহারা, *প্রভুর প্রিয়পাত্র* হওনার্থ তাঁহার ইষ্ট সাধনের জন্য, কোন বিগর্হিত কর্ম্ম করিতে কুণ্ঠিত হইত না। যে সময়ে অন্য প্রকার ফসলের আবাদ করিলে যথেষ্ট লাভ হয়, সেই সময়ে, রাইয়ত দিগের নীলের আবাদ করিতে হইত। তাহারা নিজের ফসলের ভূমির আবাদ কখন স্বেচ্ছানুসারে করিতে পারিত না। শস্য বুনিবার জন্য যে ভূমি উত্তম রূপে আবাদ করিয়া রাখিত, তাহাতে নীলকরের চরেরা নীল বপন করাইত, এবং কোন উর্ব্বরা ও উত্তম রূপে কর্ষিত ভূমিতে শস্য বুনানি হইলেও তাহা ভাঙ্গিয়া তাহাতে নীল বুনাইত। একে প্রতিবৎসর নীলপাত উত্তম রূপে উৎপন্ন হইত না, তাহার উপর আবার রাইয়তেরা তাহার সমুচিত মুল্যও পাইত না, সুতরাং তাহারা প্রায় কখনই দাদনের দায় হইতে বিমুক্ত হইতে পারিত না। একবার দাদন লইলে তিন চারি পুরুষ পর্য্যন্ত ঐ দাদন পরিশোধিত হইত না। তাহাদিগকে চির-দিন যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত। দাদন জালে পতিত না হইবার জন্য কেহ চেষ্টা করিলে তাহার জাতি, মান, ধন, প্রাণ সকলই যাইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিত। পল্লীগ্রামবাসী দিগের মধ্যে যিনি যে অবস্থাপন্ন হউন, বা যে ব্যবসায় করুন না কেন, সকল-কেই ঐ দাদন লইতে হইত। যাঁহাদের নিজের লাঙ্গল গরু না থাকিত তাঁহাদের অন্যের দ্বারা ভূমি আবাদ করাইয়া নীলপাত

উৎপন্ন করিয়া দিতে হইত। এতদ্ব্যতীত নীলকরের নিজ আবাদী জমীতে নীল উৎপন্ন করিবার নিমিত্ত যে কোন কার্য্যের প্রয়োজন হইত, তাহাও নীলকরগণ যৎকিঞ্চিৎ বেতনে রাইয়ত দ্বারা নিষ্পন্ন করিয়া লইতেন। ফলতঃ নীল প্রস্তুত করিতে যত প্রকার কার্য্যের প্রয়োজন, প্রায় তৎসমুদায়ই, রাইয়তকে বলপূর্ব্বক কিঞ্চিৎ দাদন গতাইয়া, তাঁহাদের দ্বারা নিষ্পাদিত করাইতেন। এতদ্ব্যতীত কুটীর প্রয়োজনানুসারে রাইয়তদিগের বাঁশ খড় ও বৃক্ষ ইত্যাদি বিনা-মূল্যে লওয়া হইত।

রাইয়তদিগের দুঃখের সীমা এই পর্য্যন্ত হইলেও তাহারা কথ-ঞ্চিৎ সুখে কালযাপন করিতে পারিত। কিন্তু স্ফোটকের অপেক্ষা বিস্ফোটকের যন্ত্রণায় আরও জর্জ্জরীভূত হইয়াছিল। নীলকর সাহেবদিগের দেওয়ান নায়েব গোমস্তা তাকিদগীর প্রভৃতি এদেশীয় ভৃত্যেরা, প্রভুর অভীষ্ট-সিদ্ধি করণানন্তর, আপনাদের ইষ্ট সাধনে কৃতসংকল্প হইয়া, রাইয়তদিগের প্রায় সর্ব্বস্ব হরণ, এবং তাহাদি-গকে বিবিধপ্রকারে জ্বালাতন করিতেন। নীলকর-সাহেবেরা নীলের দাদন বা কার্য্যের বেতন যাহা কিছু তাহাদিগকে দিতেন তাহারি কিয়দংশ এই কর্ম্মকারকেরা লইতেন। তাহারা যে নীলপাত কুটীতে উপস্থিত করিত, কর্ম্মচারিগণ, কিঞ্চিৎ নাপাইলে, তাহা যথোচিত রূপে পরিমাণ করিয়া লইতেন না, এবং কখন কখন এক রাইয়তের নীলপাত অন্য রাইয়তের নামে জমা করিয়া লইতেন। নীলপাতের হিসাব করিবার সময়ে আবার কিছু হস্তগত না হইলে যথার্থ হিসাব করিতেন না। রাইয়তেরা তাঁহাদিগকে আপন আপন ক্ষেত্র অথবা গৃহজাত কোন দ্রব্যের অংশ না দিলে তাহাদের যন্ত্রণা ও ক্ষতির সীমা থাকিত না। নীলকর সাহেবেরা এ সকল বিষয় জানিয়াও জানিতেন না, এবং শুনিয়াও শুনিতেন না। নরহত্যা গোহত্যা

গৃহদাহ, বাটীভঙ্গ ইত্যাদি যে কিছু কার্য্যের প্রয়োজন হইত, ইহাঁরা তাহা অসঙ্কুচিত চিত্তে সম্পাদন করিতেন। এ জেলার অনেক নীলকর সাহেব সর্ব্বস্বান্ত হইয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহাদের দেওয়ান ও নায়েবের মধ্যে অনেকে কেহ বা জমীদার কেহ বা তালুকদার হইয়াছেন।

দাদনগ্রাহীকে নীলকরের বশীভূত রাখিবার নিমিত্ত, ১৮১৯ অব্দের ৭ আইন, ১৮২৩ অব্দের ৬ আইন, ১৮৩০ অব্দের ৫ আইন, ১৮৩৬ অব্দের ১০ আইন ইত্যাদি অনেক বিধি উপর্য্যুপরি প্রকাশিত হইতে লাগিল, কিন্তু দাদনগ্রহণকারিগণের কষ্ট নিবারণের জন্য প্রায় কোন বিধিই বিধিবদ্ধ হইল না। যদিচ প্রথমে, ভারতবর্ষে ভূসম্পত্তি অধিকার করিতে ব্রিটেন-বাসীদিগের প্রতি গবর্ণমেণ্টের নিষেধ ছিল, তথাপি নীলকরগণ রাইয়ত বশীকরণার্থ, জমীদারের নিকট অনেক গ্রাম, তাঁহাদের এ দেশীয় ভৃত্যদিগের নামে ইজারা লইতেন। ঐ নিষেধ রহিত হইলে যে গ্রামের প্রজারা নীল দাদন লইতে অসম্মত হইত, সেই গ্রাম যে রূপে হউক, পত্তনি বা ইজারা লইয়া তাহাদিগকে বশীভূত করিতেন। যে জমীদার নীলকরের বাসনা পূর্ণ করণে পরাঙ্মুখ থাকিতেন, তাঁহাদের সহিত ঘোরতর বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন এবং দুর্ব্বল জমীদার পাইলে তাহাকে অবসন্ন করিয়া ফেলিতেন। নীলকরসাহেবদিগের বা তাহাদের ভৃত্যদিগের নামে নরহত্যা, গ্রামদাহ, বাটীভঙ্গ, উদ্যানকর্ত্তন, গোধনহরণ, রাইয়তকে বন্দী বা অনুদ্দেশ করণ প্রভৃতি নানাবিধ অপরাধের শত শত অভিযোগ রাজদ্বারে উপস্থিত হইত, এবং কখন কখন তাঁহাদের ভৃত্যেরা অপক্ষপাতী বিচারে বিলক্ষণ শাস্তিও পাইত, তথাপি তৎকালীন দণ্ডবিধি আইনানুসারে ইঙ্গরেজেরা জেলা আদালতের বিচারাধীন না থাকাতে তাঁহাদের

কোন শারীরিক দণ্ড হইত না বলিয়া তাঁহারা আপনাদের অভীষ্ট-সাধনে নিঃশঙ্কচিত্তে অটল থাকিতেন। কোন কোন জমীদার বা *সম্ভ্রান্ত ও সমৃদ্ধিশালী রাইয়ত এই রূপ বিবাদে এক কালে উৎসন্ন* হইয়া যান। নীলকরেরা গ্রাম সকল যে জমায় পত্তনী বা ইজারা লইবার প্রসঙ্গ করিতেন, তাহাতে জমীদারের লাভ ব্যতীত ক্ষতি হইত না, কিন্তু রাইয়তের ভাবী দুর্দ্দশা ভাবিয়া তাঁহারা নীলকরের প্রস্তাবে সম্মত হইতেন না। অবশেষে যখন দেখিলেন যে, নীল-করের সহিত বিবাদ করিলে বিষম বিপদে পতিত হইতে হয়, তখন অগত্যা অনেক জমীদার প্রজার মায়া পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাদের মনোরথ পূর্ণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে নবদ্বীপ অধিকারের প্রায় সকল প্রদেশেই নীলকর সাহেবদিগের কুঠী ও অধিকার সংস্থাপিত হইল। অবশেষে রাইয়ত গণের অবস্থা ঠিক এমেরিকা দেশের দাসদিগের সদৃশ হইয়া উঠিল। অনেক সম্ভ্রান্ত ও ভদ্রলোক, তাঁহাদের উৎপীড়নে, কেহ বা বহুপুরুষের বাসস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্থানান্তরে উপনিবেশ করিলেন, কেহ বা মান ও সম্ভ্রমে জলাঞ্জলি দিয়া নীলকরের ও তাঁহাদের ভৃত্যদিগের পদানত হইয়া থাকিলেন।

১৮৫৭ অব্দে সেপাহি সৈন্য রাজবিদ্রোহী হইলে, অনেক নীলকর সাহেব গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক এসিষ্টাণ্ট মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা পাইলে, রাইয়তদিগের ক্লেশ আরও বৃদ্ধি হইল। দুর্ভাগ্য রাইয়তদিগের কষ্ট নিবারণের জন্য, দেশস্থ মহোদয়গণ ও কয়েক-জন সহৃদয় মিশনরি বিবিধ চেষ্টা করিতে লাগিলেন; অপক্ষপাতী সম্বাদ পত্রের সম্পাদকগণ তাহাদের দুরবস্থা সম্বাদপত্রে লিখিয়া সর্ব্বসাধারণের গোচর করিতে লাগিলেন; এবং কোন কোন রাজপুরুষও এ বিষয়ের প্রতিবিধানার্থ যত্ন করিতে লাগিলেন;

তথাপি নীলকর সাহেবদিগের দল ও বল এতই প্রবল ছিল, যে কেহই তাহাদের দুঃখ মোচনে সমর্থ হইলেন না।

নীলকর সাহেবেরা ও ইংরেজ রাজপুরুষেরা উভয় সম্প্রদায়ই একদেশবাসী, একজাতীয়, একধর্ম্মাবলম্বী, এবং উভয় দলের পরস্পর আহার ব্যবহার, আত্মীয়তা, ও আদান প্রদান থাকাতে, আর রাজপুরুষদিগের মধ্যে কেহ কেহ কখন নীলকরের সাহায্য করাতে, এ প্রদেশস্থ সাধারণ লোকের মনে এই দৃঢ় সংস্কার জন্মে যে, নীল ব্যবসায়ে গবর্ণমেণ্টের বিশেষ স্বার্থ আছে, সুতরাং আমাদের যতই দুঃখ হউক, গবর্ণমেণ্ট কখনই আমাদের প্রতিকুল ব্যতীত অনুকূল হইবেন না, এবং আমাদের ক্লেশের অবসান কখনই হইবে না। এই ভাবিয়া রাইয়তেরা এ কাল পর্য্যন্ত অসাধারণ ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক সকল কষ্ট সহ্য করিয়া আসিতেছিল। কাল সহকারে মফস্বলের অনেক লোক সুশিক্ষিত হইয়া উঠিলেন, এবং জেলার নানা বিভাগে এদেশীয় সুবিজ্ঞ ডেপুটী কালেক্টর ও পুলিসের কার্য্যে সুশিক্ষিত ও ধর্ম্ম-ভীত দারোগা সকল নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। ইহাদের দ্বারা রাইয়তদিগের পূর্ব্ব অমূলক সংস্কার ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে আরম্ভ হইল, এবং আইনের অর্থ ও গবর্ণমেণ্টের অভিপ্রায় অনুভূত হইতে লাগিল। এইরূপে তাহাদের নির্জীব আশা ক্রমে ক্রমে সজীব হইয়া উঠিল। নদীয়া প্রদেশস্থ ভদ্র অভদ্র সকল দাদনগ্রাহী রাইয়ত আপনাদের দুঃখ-শৃঙ্খল ছেদন করিবার মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন, এবং কোন কোন স্থানের রাইতেরা ইহা সাধন করণেও প্রবৃত্ত হইলেন। এই সময়ে জেলা বারাসতের তদানীন্তন মাজিষ্ট্রেট অনরেবল আশলি ইডন সাহেব, ঐ জেলার নীলকর ও রাইয়তদিগের পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে, পুলিশের উপর এইরূপ এক পরওয়ানা

দিলেন যে, রাইয়তেরা আপনাদের ভূমিতে যে ফসল ইচ্ছা সেই ফসল বুনিতে পারিবে, তাহাতে অন্য কেহই বাধা দিতে পারিবেন না। পূর্ব্বে রাইয়তদিগের চিত্তক্ষেত্রে আশাভরসার যে অঙ্কুর হইয়াছিল, তাহা এই পরওয়ানা দ্বারা এক কালে বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল। ১৮৫৯ খৃঃ অব্দে, সমস্ত রাইয়ত "অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক, নীল বুনানি আর কোন মতেই করিব না" এই দৃঢ় সংকল্প করিলেন। অনতি দীর্ঘকাল মধ্যেই নীলকর ও রাইয়তের মধ্যে বিষম বিবাদ আরম্ভ হইল। সে সময় মহামতি জে. পি. গ্রাণ্ট সাহেব বঙ্গ রাজ্যের লেপ্‌টনাণ্ট গবর্ণর হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রস্তাবানুসারে নীলকরের আশু অনিষ্ট নিবারণ, নীল কার্য্যের প্রচলিত প্রণালীর তত্ত্বানুসন্ধান, এবং এই কার্য্যের কোন নির্দ্দোষ প্রণালী নির্দ্ধারণ নিমিত্ত ১৮৬০ অব্দের একাদশ বিধি প্রকাশিত হইল। প্রথমোক্ত বিষয় নিষ্পাদনের জন্য মাজিষ্ট্রেটেরা যত্ন করিতে লাগিলেন এবং শেষোক্ত কার্য্য দ্বয় সম্পাদনার্থ পাঁচজন কমিশনর * নিযুক্ত হইলেন। কমিশনরগণ, জজ ও মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি অনেক প্রধান প্রধান রাজপুরুষ, মিশনরি সাহেব, জমীদার, নীলকর ও রাইয়ত প্রভৃতি বিবিধ শ্রেণীর লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ, এবং নীল সম্বন্ধীয় বিবিধ কাগজ পত্র দর্শন করণানন্তর তাঁহাদের মধ্যে চারিজন বর্ত্তমান নীলকার্য্য প্রণালীর বহুবিধ দোষ কীর্ত্তন করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট বিজ্ঞাপনী প্রদান করিলেন। ইহাতে নীলকর সাহেবেরা পূর্ব্বমত বল প্রয়োগে অশক্ত হইয়া বহুতর চুক্তি ভঙ্গের মোকদ্দমা উত্থাপন করিতে লাগিলেন। এই সকল মোকদ্দমার নিষ্পত্তির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের

---

* W. S. Setonkar, President, R. Temple, W. F. Ferguson, Reverend I Sale, Baboo Chunder Nath Chatterjee

অনেক ডেপুটী কালেক্টর নিযুক্ত করিতে হইল। যদিও এইরূপ মোকদ্দমায় অনেক রাইয়তের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল, তথাপি তাহাদের নীল না করার প্রতিজ্ঞা অটলই থাকিল। অল্প কাল মধ্যেই নীলকরগণের সৌভাগ্য-সূর্য্য অস্তমিত হইল। অনেকেরই কুটী ও ভূসম্পত্তি বিক্রীত হইয়া গেল। এই জেলার মধ্যে ইদানীং যে সকল নীলকর সাহেব আছেন, তাঁহাদের আর পূর্ব্বমত প্রাদুর্ভাব নাই। অধিবাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা নীল ব্যবসায় করিয়াছেন ও করিতেছেন, তাঁহাদের দ্বারা রাইয়তের অবস্থার কোন বিশেষ পরিবর্ত্তন হয় নাই বলিয়া, আমি তাঁহাদের বিষয় কিছু লিখিলাম না। *

দ্বিতীয় অধ্যায়।

যবনাধিকারে বঙ্গ রাজ্যের এ প্রদেশে স্বত্বাস্বত্বের ও অপরাধের যে রূপ বিচার প্রণালী ছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, নবাব নাজিম প্রতি রবিবারে গুরুতর অপরাধের বিচার করিতেন। ঐ দিবস রোজ আদালত্ অর্থাৎ বিচারের দিন বলিয়া খ্যাত ছিল। দেওয়ানের প্রতি ভূসম্পত্তির সত্বাসত্বের বিচার করিবার ভার ছিল। কিন্তু তিনি প্রায় স্বয়ং বিচারাসনে বসিতেন না, আদালৎ দেওয়ানীর দারোগা তাঁহার প্রতিনিধি স্বরূপ হইয়া ঐকার্য্য সম্পন্ন করিতেন। দারোগায় আদালতল আলিয়া অর্থাৎ প্রধান

---

* নীল বিদ্রোহ বিষয়ের তদন্ত জন্য ১৮৬০ অব্দে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত কমিশনরদিগের রিপোর্ট হইতে ইহার অধিকাংশ সঙ্কলিত। পৃ, ১৫, [illegible] ২৭, ২৮, ৩০, ৩১, ৩৩, ৫১, ৫২।

আদালতের দারোগা ভূমি ব্যতীত অন্য সম্পত্তির সত্বাসত্বের বিচার কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন, এবং কোন কোন অপরাধের প্রমাণ গ্রহণ পূর্ব্বক নবাব নাজিম সন্নিধানে তদ্বিবরণ জানাইতেন। ফৌজদার লঘু অপরাধের বিচার করিতেন, এবং গুরু অপরাধের প্রমাণ লইয়া তাহার অবস্থা সমস্ত নবাব সমীপে লিখিয়া পাঠাইতেন। কাজি যবন সম্প্রদায়ের উত্তরাধিকারিত্বের বিচার ও পৌরহিত্য করিতেন। মহতসব মদমত্ততার শাসন ও দোকানীদিগের বাটখরার পরীক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। মুফ্‌তি ধর্ম্মশাস্ত্রের ব্যাখ্যা কারক ছিলেন, এবং কাজিও মহতসবের বিচার কার্য্যের সহায়তা করিতেন। তিনি বাদী প্রতিবাদীর পক্ষের সাক্ষ্য ও প্রমাণ লইয়া ফতোয়া অর্থাৎ ব্যবস্থা দিতেন, এবং কাজি ঐ ব্যবস্থানুসারে বিচার নিষ্পন্ন করিতেন। কাজির ও মহতসবের বিবেচনায় ঐ ব্যবস্থা ন্যায়ানুগত অথবা শাস্ত্রানুমত বোধ না হইলে, নবাব নাজিম কাজি, মহতসব, মুফ্‌তি, দারোগা এবং মৌলবিকে আহ্বান পূর্ব্বক এক সভা করিয়া ঐ বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিতেন। কানুন্‌গো ভূসম্পত্তির রেজিষ্টর ছিলেন। তাঁহার নিজের কোন ক্ষমতা ছিল না, কোন্ স্থানের ভূমির উর্ব্বরতা কি রূপ, তাহার ন্যায্য কর কত ইত্যাদি বিষয়ের হিসাব রাখিতেন এবং নবাব, দেওয়ান এবং দারোগার নিকট তাহা জানাইতেন। কোতয়াল্‌ ফৌজদারের অধীনে থাকিয়া রাত্রিতে নগর রক্ষা করিতেন। এই সমস্ত রাজ-পুরুষ বঙ্গদেশের প্রধান রাজধানীতে অবস্থিতি করিতেন। ইংরাজ অধিকারের অব্যবহিত পূর্ব্বে মুরশিদাবাদ বঙ্গদেশের প্রধান রাজধানী ছিল। সকল প্রদেশের মোকদ্দমা তথায় হইতে পারিত, কিন্তু যাঁহারা স্বয়ং উপস্থিত হওনে অসমর্থ হইতেন তাঁহাদের মোকদ্দমা ঐ স্থানে হইবার উপায় ছিল না। কাজির প্রতিনিধি

সকল প্রদেশে থাকিতেন। রাজধানীর বহিঃপ্রদেশে উপরোক্ত সমস্ত কার্য্যের মধ্যে কাজির কার্য্য ব্যতীত আর আর বিচার কার্য্য জমীদার, ইজারদার, শিকদার, এবং রাজস্ব সংক্রান্ত অন্য অন্য কর্ম্মচারীগণ নির্ব্বাহ করিতেন *।

কোম্পানীর বঙ্গরাজ্যের দেওয়ানী সনন্দ প্রাপ্তির পর ৪ বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশের শাসন ভার পূর্ব্বমত অধিবাসীদিগের হস্তেই থাকে। খৃঃ ১৭৬৯ অব্দে এদেশের প্রতি বৃহৎ বিভাগে এক এক জন ইংরাজ সুপারবাইজর নিযুক্ত হন। খৃঃ ১৭৭২ অব্দে গবর্ণর জেনেরল ওয়ারিন্ হেস্‌টিংস্‌ সাহেব রাজ্যের বিচার কার্য্য স্বহস্তে লন। তিনি, সুপারবাইজরের পদ উঠাইয়া দিয়া, এ দেশের প্রতি বিভাগে কালেক্‌টরী ও দেওয়ানী কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য এক এক জন ইংরাজ নিযুক্ত করেন, এবং ফৌজদারী কার্য্য এ দেশীয় লোকদিগের হস্তেই রাখেন; কিন্তু তাঁহাদিগকে কালেক্‌-টরের অধীন করিয়া দেন। মুরশিদাবাদ হইতে রেবিনিউ বোর্ড কলিকাতায় উঠিয়া যায়, এবং কর সংগ্রহ কার্য্যের কাছারী মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় আনীত হয়। দুই বৎসর অতীত না হইতেই কালেক্‌টরের পদ উঠিয়া যায় এবং তৎসংক্রান্ত কার্য্য পুনরায় অধিবাসীদিগের হস্তে অর্পিত হয়। ১৭৮১ অব্দে ফৌজদারী পদ রহিত হইয়া তৎসম্বন্ধীয় কার্য্য সম্পাদনের ভার সিবিল্‌ জজ ও ভূম্যধিকারিগণের প্রতি প্রদত্ত হয় †। তদনন্তর লর্ড

* খৃঃ ১৭৭২ অব্দের আগষ্ট মাসের পঞ্চদশ দিবসে কমিটী আব সার্‌কিট নামক রাজপুরুষগণ কাশিমবাজার হইতে কলিকাতার কৌনসল্‌কে যে পত্র লেখেন তাহা হইতে উদ্ধৃত।

† Hunter's Annals of Rural Bengal, pp. 262, 265, 266, 392, 393.

করণওয়ালিস্ দেশের রীতি নীতি অবগত হইবার নিমিত্ত প্রত্যেক বিভাগে এক এক জন প্রবীন ও প্রাজ্ঞ ইংরাজ নিযুক্ত করেন, এবং তাহাদের হস্তে কালেক্টরী, দেওয়ানী, ফৌজদারী, এবং পুলিসের কার্য্যের ভার দেন। এই নিয়ম তিন বৎসর থাকে *।

পূর্ব্বে খৃঃ ১৭৬৫ অব্দে নবাবের সহিত কোম্পানির এই রূপ সন্ধি হয় যে, রাজস্ব সংগ্রহের ভার ইংরাজেরা লইবেন এবং ফৌজদারী কার্য্য নবাব সম্পাদন করিবেন। কিন্তু নবাবকে কর্ত্তব্য নিষ্পাদনে অসমর্থ বলিয়া, হেষ্টিংস্ সাহেব, ১৭৭২ অব্দে, এক প্রধান ফৌজদারী আদালত কলিকাতায় এবং তদধীনে এক এক ফৌজদারী আদালৎ প্রতি জেলায় সংস্থাপিত করেন, কিন্তু ১৭৭৫ অব্দে পুনরায় ঐ ফৌজদারী বিচারের ভার নবাবের হস্তে যায় এবং ১৭৯০ অব্দ পর্য্যন্ত থাকে †। লার্ড করণওয়ালিস্ প্রথম ৪ বৎসর এ বিষয়ে হস্তক্ষেপণ করিতে সাহস করেন না, কিন্তু উক্ত কার্য্য সম্পাদনে নবাবকে নিতান্ত অক্ষম দেখিয়া, অবশেষে কলিকাতায় গবর্ণর জেনরেলের কর্ত্তৃত্বাধীন এক সুপ্রীম ক্রিমিন্যাল কোর্ট, এক কৌনসিল, এবং চারি কোর্ট আব্ সার্‌কিট্ সংস্থাপিত করেন। এই সকল বিচারালয়ের বিচারের অযোগ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের বিচারের ভার জেলার ইংরাজ মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পিত হয়। এই সমস্ত রাজপুরুষদিগের কার্য্যপর্য্যালোচনার্থ কলিকাতায় এক সুপ্রিম্‌কোর্ট সংস্থাপিত হয়। অপরাধের বিচার মুসলমান শাস্ত্রানুসারে হইতে থাকে, এবং তজ্জন্য মুসলমান্ এসেসর রাখিতে হয় ‡।

---

* Hunter's Annals of Rural Bengal, P. 267.

† Do. Do. p. 329.

‡ Do. Do. p. 330.

এইরূপে অধিবাসীদিগের হস্ত হইতে প্রায় সমস্ত বিচারের কার্য্য উঠিয়া যায়; কেবল কাজির হস্তে সনন্দ রেজিষ্টরি করিবার ক্ষমতা এবং জমীদারদিগের দশ টাকার অনধিক দাবীর মোকদ্দমার বিচার করিবার অধিকার থাকে। কিয়ৎ কালানন্তর জেলায় জেলায় ফৌজদারী ও দেওয়ানী বিচারালয় সংস্থাপিত হইলে জমীদারগণের ঐ ক্ষমতা রহিত হইয়া যায়, এবং কাজির সনন্দ রেজিষ্টরি করণের যে ক্ষমতা থাকে তাহাও ১৮৬৪ খৃঃ অব্দের একাদশ বিধি দ্বারা বর্জ্জিত হয়।

রাজবাটীতে জনশ্রুতি আছে, যে যবন রাজত্ব কালে নবদ্বীপের রাজারা আপন অধিকার মধ্যে সর্ব্বপ্রকার সম্পত্তির স্বত্বাস্বত্বের ও সর্ব্বপ্রকার অপরাধের বিচার করিতেন। রাজা, প্রতিদিন কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে, বিচারাসনে বসিয়া, সর্ব্বসাধারণের আবেদন শুনিতেন ও তাহার বিচার করিতেন। স্বত্বাস্বত্বের বিচার প্রথমে তাঁহার দেওয়ান করিতেন কিন্তু তাহার চূড়ান্ত আদেশ রাজা দিতেন। অপরাধের বিচারের ভার তাঁহার ফৌজদারের প্রতি অর্পিত ছিল। এই উভয় কর্ম্মচারীর কৃত বিচারের আপীল রাজসন্নিধানে হইত। রাজা অবিচার করিলে তাহার আপীল নবাবের নিকট হইতে পারিত। কিন্তু রাজার বিচারের বিরুদ্ধে আপীল করা অতি দুঃসাহসের কর্ম্ম ছিল। অর্থ ও শারীরিক উভয়বিধ দণ্ড প্রচলিত ছিল। সুশাসনাভাবে জমীদারী মধ্যে কোন বিশৃঙ্খলা ঘটিলে রাজা বা তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারীরা নবাবকর্ত্তৃক দণ্ডিত হইতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের সময়ে, হুগলির ফৌজদারের প্রেরিত রাজস্ব পলাশী গ্রামে অপহৃত হওয়াতে রাজার দেওয়ান রঘুনন্দন মিত্র নবাবের আদেশানুসারে নিহত হন। ইহার বিস্তারিত বিবরণ যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

নবদ্বীপের রাজারা অপহরণ অপরাধে অতি গুরুতর দণ্ড বিধান করিতেন। শুনিয়াছি, চৌর্য্যাপরাধীরা বিবিধ শারীরিক দণ্ড পাইত, বন্দীভূত থাকিত, এবং ধান্য ভোজন করিয়া জীবন ধারণ করিত। কিন্তু শাসনের সুপ্রণালী অভাবে অধিবাসীরা নিশ্চিন্ত চিত্তে কাল-যাপন করিতে পারিতেন না। পাছে দস্যুদিগের লোভপথে পতিত হন, এই আশঙ্কায় যাঁহারা স্বচ্ছন্দাবস্থায় কালাতিপাত করণে সমর্থ ছিলেন, তাঁহারাও অতি দীনাবস্থায় থাকিতেন। তাঁহাদের অর্থ চন্দ্র সূর্য্যেরও গোচর হইত না, নিয়ত গৃহের প্রাচীর মধ্যে অথবা ভূগর্ভে নিহিত থাকিত। ঋণের আদান প্রদান কার্য্য পর্য্যন্ত অতি সঙ্গোপনে সম্পাদিত হইত। অধিক লোকের বিদিত হইবার আশঙ্কায়, ঋণপত্রে অন্য সাক্ষী না করিয়া কখন কখন কেবল ধর্ম্ম সাক্ষী লিখিত হইত। দস্যু তস্কর ভয়ে সাধারণ লোকেরা ঘরের মেঝের মধ্যস্থলে একটি গর্ত্ত রাখিতেন, এবং রাত্রিতে আভরণ ও তৈজসাদি তন্মধ্যে রাখিয়া তদুপরি এক কাষ্ঠ-ফলক প্রদান পূর্ব্বক তাহার উপর শয্যা করিয়া নিদ্রা যাইতেন। সন্ধ্যার পর গ্রামান্তরে যাইতে হইলে বিষম বিপদ্ উপস্থিত হইত। স্থলপথ অপেক্ষা জলপথ আরও বিপজ্জনক ছিল।

যবন-রাজত্বকালে দস্যুদিগের যে শাসন ছিল, ইংরাজাধিকার প্রারম্ভে তাহাও লুপ্তপ্রায় হয়, এবং দেশমধ্যে নিতান্ত অরাজ-কতা হইয়া উঠে। পূর্ব্বে ভূম্যধিকারীদিগের যে ক্ষমতা ও প্রভুত্ব থাকাতে দস্যুবৃত্তির অনেক দমন ছিল, এদেশ ইংরাজ অধিকৃত

হইলে সে ক্ষমতা ও প্রভুত্ব থাকিল না, অথচ তাহার পরিবর্ত্তে কোন সুশাসন প্রণালীও সংস্থাপিত হইল না। সুতরাং দস্যুদল আরও প্রবল হইয়া উঠিল। অনেক জমীদারী-চ্যুত জমীদারগণ বহু দস্যুপোষণ করিয়া চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিল। অপহারকগণ কখন কোম্পানির সৈন্যের পরিচ্ছদ পরিয়া লুট করিতে লাগিল, কখন সন্ন্যাসী বা ফকিরের বেশ ধারণ পূর্ব্বক, কখন ভিক্ষা কখন চুরি আরম্ভ করিল। ১৭৭০ খৃঃ অব্দের দুর্ভিক্ষের পর অনেক কৃষকেরাও চৌর্য্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিল। তাহারা অনেক বার কোম্পানির সৈন্যকেও হত আহত করে। পূর্ব্বে ঠগ ও ডাকাইত নামে দুই তস্কর-সম্প্রদায় ছিল। ইহারা গ্রামে অগ্নি দিয়া লুট করিত। ইংরাজ রাজপুরুষদিগের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও ৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত বঙ্গদেশবাসীরা এইরূপ অত্যাচারে প্রপীড়িত হয়। ১৭৮০ খৃঃ অব্দে দস্যুরা কলিকাতায় পঞ্চদশ সহস্র গৃহ ও দুইশত লোক ভস্মসাৎ করে *। কলিকাতাবাসী ইংরাজরাও রাত্রে ভোজনের সময়ে দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিতেন, এবং যাবৎ তাঁহাদের ভোজন ও পান পাত্র নিরাপদ স্থানে রক্ষিত না হইত, তাবৎ দ্বার উদ্ঘাটিত করিতেন না †।

বর্ত্তমান শতাব্দীর প্রথমে কৃষ্ণনগরের পূর্ব্বাংশে ৬ ক্রোশ মধ্যে বিশ্বনাথ, বৈদ্যনাথ, এবং পীতাম্বর নামে ৩ জন প্রসিদ্ধ দস্যু ছিল। প্রায় পাঁচ শত লোক তাহাদের দলভুক্ত হইয়াছিল। প্রথমোক্ত দুই ব্যক্তি বাগ্দী ও শেষোক্ত ব্যক্তি মোসলমান। কয়েক বর্ষাবধি এপ্রদেশবাসীরা ইহাদিগের ভয়ে সর্ব্বদা উৎকণ্ঠায়

---

* Hunter's "Annals of Rural Bengal," pp. 70, 71—73.

† Do. Do. p. 74.

কালযাপন করিতেন। রজনীতে প্রায় ধনী মাত্রে সুষুপ্তিজনিত সুখ সম্ভোগে বঞ্চিত থাকিতেন। তস্করগণের ঈদৃশী স্পর্দ্ধা হইয়াছিল যে, তাহারা কখন কখন ধনশালী ব্যক্তিদিগকে লিখিয়া পাঠাইত যে তুমি অমুক সময়ে অমুক স্থানে এত টাকা পাঠাইবে। *যদি না পাঠাও তবে রাত্রিতে তোমার সহিত আমাদের সাক্ষাৎ* হইবে। তাহারা অনেক জমীদারের বাটী ও নীলকরের কুটী পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করে।

যদিও তাহাদের আবাসস্থল পুলিশের অগোচর ছিল না, এবং যদিও তাহারা নিতান্ত লুক্কায়িত থাকিত না, তথাপি তৎকালে পুলিশ এতই দুর্ব্বল ও অপটু ছিল যে, কয়েক বৎসরাবধি তাহাদিগকে ধরিতে পারে নাই। অবশেষে ১২১৫ বাঃ অব্দে তাহাদের দলভুক্ত দুই এক জনের বিশ্বাসঘাতকতায় তাহারা পুলিশের হস্তে পতিত হয়। ইহাদের মধ্যে অনেকেরই ফাঁশি হইয়াছিল। বিশ্বনাথ যেমন ধনীদিগের ধন অপহরণ করিয়া লইত তেমনই দুঃখী দরিদ্রদিগকে যথেষ্ট অর্থ দানও করিত। এই কারণে সে বিশ্বনাথ বাবু নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। নবদ্বীপের রাজসংসৃষ্ট কোন ব্যক্তির ধন অপহরণ করিত না। তাদৃশ কোন লোক, তাহাদের হস্তে পতিত হইলে, যদি বলিত যে আমি রাজার চাকর অথবা এই দ্রব্য রাজার, তবে তাহার সঙ্গে নিজের লোক দিয়া নির্ব্বিঘ্ন স্থানে পৌহুঁছিয়া দিত। বিশ্বনাথের পুত্র অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

চতুর্থ অধ্যায়।

এই জমীদারী নবদ্বীপ, অগ্রদ্বীপ, চক্রদ্বীপ, কুশদ্বীপ, এই চারি সমাজে বিভক্ত ছিল। জমীদারিস্থ ব্রাহ্মণ, শূদ্র প্রভৃতি সমস্ত বর্ণ এই চারিসমাজভুক্ত ছিলেন। জমীদারীর কোন্ প্রদেশ কোন্ সমাজের অন্তর্ব্বর্ত্তী, এক্ষণে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু কোন কোন প্রাচীন রাজকুটুম্ব মুখে শুনিয়াছি, যে এই জমীদারীর উত্তর প্রদেশ অগ্রদ্বীপ সমাজ, মধ্য প্রদেশ নবদ্বীপ সমাজ, দক্ষিণ প্রদেশ চক্রদ্বীপ সমাজ, এবং পূর্ব্বপ্রদেশ কুশদ্বীপ সমাজের অন্তর্গত ছিল। চক্রদ্বীপ ও কুশদ্বীপ ইদানীং চাকদহ ও কুশদহ নামে খ্যাত আছে। ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের অধিকাংশ প্রায়ই শাক্ত ও অত্যল্পাংশ বৈষ্ণব, এবং শূদ্রবর্ণের অধিকাংশ বৈষ্ণব ও কিয়দংশ শাক্ত ছিল। রাজারা শাক্ত, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ইহাঁরা পুরাণোক্ত বিবিধ অবতারের ধাতু প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, এবং তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত বিস্তর ভূমি দান করিয়াছেন। কালী কৃষ্ণ উভয়েরই প্রতি ইহাঁদের নির্ব্বিশেষ ভক্তি ছিল। ইহাঁরা কেবল চৈতন্যোপাসক সম্প্রদায়ের প্রতি বিশেষ বিদ্বেষ করিতেন।

এই রাজারা উল্লিখিত চারি সমাজের পতি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, এবং পূর্ব্বোল্লিখিত সমস্ত বর্ণের উপর তাঁহাদের অবিসম্বাদিনী প্রভুতা ছিল। ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহারা যে কোন ব্যবস্থা করিতেন তাহাই বঙ্গদেশের সর্ব্বত্র আদরের সহিত পরিগৃহীত হইত। কদাচারীদিগকে জাতি-চ্যুত এবং পতিতকে উদ্ধার করিতেন।

শূদ্র জাতির মধ্যে কেহ দুষ্কর্ম্ম দোষে পতিত হইলে রাজসনন্দব্যতীত কখনই সমাজ-চলিত হইত না। ধর্ম্ম বিষয়ে কোন সংশয় উপস্থিত হইলে, অন্য প্রদেশের রাজারাও ইহাঁদের নিকট ব্যবস্থা লইতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় জগদ্ধাত্রী ও অন্নপূর্ণা পূজা প্রবর্ত্তিত করেন। ইদানীং বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র এবং অন্য অন্য দেশের কোন কোন স্থানে এই পূজা মহা সমারোহপূর্ব্বক সম্পাদিত হইয়া থাকে। উজনিয়া গোপ সম্প্রদায়ের জল পূর্ব্বে ব্যবহৃত ছিল না। এই রাজারা এপ্রদেশে তাহাদিগকে চলিত করেন। শুনিয়াছি রাজারা যে কোন শূদ্র জাতীয় বালক ক্রয় করিয়া আপনাদের পরিচর্য্যাকার্য্যে নিযুক্ত করিতেন, তাহারা যে জাতি হউক না কেন তাহাদিগকে কায়স্থ বলিয়া প্রসিদ্ধ করিতেন। যদিও তাহারা পূর্ব্বে কায়স্থ শ্রেণীর মধ্যে অপদস্থ ছিল, কিন্তু ইদানীং তাহাদের কেহ কেহ সৌভাগ্য প্রভাবে অন্য অন্য কায়স্থগণের সমকক্ষ হইয়া উঠিয়াছে।

শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে যে, ব্রাহ্মণ স্ববৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহে অসমর্থ হইলে ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিবেন, এবং তাহাতেও জীবনযাত্রা সমাধান না হইলে বৈশ্য বৃত্তির আশ্রয় লইবেন; কিন্তু বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণগণ যে কখন ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন এরূপ শ্রবণগোচর হয় নাই। এ অধিকারস্থ বিপ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে অত্যল্প লোক অধ্যাপন, যাজন এবং মন্ত্রদান ব্যবসায় করিতেন। তদ্ব্যতীত প্রায় সমস্ত ব্রাহ্মণ বৈশ্যবৃত্তি বা কৃষিজীবী অথবা শূদ্রবৃত্তি বা চাকুরে ছিলেন। কৃষিজীবী বিপ্রগণ কৃষিসংক্রান্ত কোন কার্য্য স্বহস্তে করিতেন না, শূদ্র বা যবন জাতীয় ভৃত্য দ্বারা সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করাইতেন। লেখা পড়া চাকুরীর সহিত কিঞ্চিৎ প্রভুত্ব থাকে বলিয়া তাঁহারা প্রায় সকলেই এই চাকুরীর অভিলাষী

হইতেন। কিন্তু পূর্ব্বকালে এরূপ চাকুরীর সংখ্যা অতি অল্প ছিল। কারণ তৎকালে জমীদারী কার্য্য ব্যতীত লেখা পড়ার অন্য কোন-রূপ কর্ম্ম অধিক ছিল না। রাজাদের সদর কাছারিতে ন্যূনাধিক দুই শত কর্ম্মচারী থাকিতেন। মফস্বলে প্রত্যেক পরগণায় নায়েব, পেস্কার, খাজাঞ্চি, আশ্বাট্টা, নবিস্, ও মুহুরী প্রভৃতি দশ বার জন কর্ম্মকারক নিযুক্ত হইতেন, এবং তাঁহাদের অধীন প্রতিগ্রামে সচরাচর এক জন গোমস্তা, ও বৃহৎ গ্রাম হইলে এক জন গোমস্তা ও এক জন মুহুরী কর্ম্ম করিতেন। তদানীন্তন কায়স্থ জাতীয়েরা এই সকল কার্য্যে বিশেষ পটু ছিলেন, সুতরাং ব্রাহ্মণ-শ্রেণীর অধিক লোক এ সকল কর্ম্ম প্রাপ্ত হইতেন না।

অধুনাতন বিপ্রসন্তানগণ যে সকল ক্ষত্রিয়বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সম্মান ও যশের সহিত কাল যাপন করিতেছেন, পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বের ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল বৃত্তি অবলম্বন করিলে অপদস্থ হইতেন। তৎকালীন বিপ্রগণ নাজির বা দারোগার পদ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতে পারিতেন না। এ রাজবাটীর প্রধান দ্বারের জমাদারী পদ অতি সম্ভ্রান্ত ছিল। জমাদার অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পদস্থ কর্ম্মচারীর ন্যায় সভায় বসিতে পাইতেন, ও রাজভবন গমনাগমন ও নগর ভ্রমণ কালে দশ জন অশ্বারোহী তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিত। কান্যকুব্জের অতি সদাচারী ও সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণেরাও ঐ পদ প্রাপ্ত হইলে আপনাকে চরিতার্থ মনে করিতেন, কিন্তু এ প্রদেশস্থ অতি সামান্য ব্রাহ্মণ, যিনি ঐ জমাদারের অধীনে যৎসামান্য মুহুরিগিরী কর্ম্ম করিতেন, তিনিও জমাদারী পদ গ্রহণ করিতেন না। এক্ষণে ইদানীন্তন দ্বিজগণ কনষ্টেবলী কর্ম্ম করিতেছেন, তথাপি সমাজচ্যুত বা অপদস্থ হইতেছেন না।

ইদানীং বিপ্রসন্তানেরা বিবিধ প্রকার দ্রব্যের বিপণি করিয়া

ক্রয় বিক্রয় করত খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করিতেছেন, কিন্তু পূর্ব্বকালীন ব্রাহ্মণেরা লোক দ্বারা ঐ সকল ব্যবসায় করিলেও সমাজ বহির্ভূত হইতেন। ইদানীন্তন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের আচার ব্যবহার যেরূপ হইয়াছে, পূরা কালে সেরূপ ছিল না। তদানীন্তন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা, যে সকল জাতিকে অধ্যাপন বা মন্ত্রদান করিলে অথবা যে জাতির যাজকতা বা দান গ্রহণ করিলে, আপনাকে পাপ-গ্রস্ত জ্ঞান করিতেন এবং ভদ্র মণ্ডলীতে বিশেষ দোষাস্পদ হই-তেন, অধুনাতন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে সেই জাতির অধ্যাপন, মন্ত্রদান, অথবা দান গ্রহণ করিতে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হন না।

ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে পূর্ব্বে আর এক প্রকার ব্যবসায় ছিল, (এক্ষণেও কিয়ৎ পরিমাণে আছে) বোধহয় বঙ্গদেশ ব্যতীত এরূপ আশ্চর্য্য অশ্রদ্ধেয় ব্যবসায় অন্য কুত্রাপি প্রচলিত নাই। ইহার নাম বিবাহ ব্যবসায়। কুলীন ব্রাহ্মণ ও কতকগুলি ভঙ্গকুলীনদিগের মধ্যে অধিকাংশ এই ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁহারা অন্য কোন বিষয় কর্ম্ম করিতেন না, কেবল মনোমত অর্থলাভ হইলেই যত ইচ্ছা বিবাহ করিতেন। তাঁহারা কদাচিৎ নিজ নিকেতনে এবং প্রায় সর্ব্বদাই নিজের বা পুত্রের শ্বশুরালয়ে অবস্থান করিতেন। যিনি যতই দার-পরিগ্রহ করুন, প্রায়ই একটি স্ত্রী লইয়া সংসার ধর্ম্ম করিতেন। আপনার বা তনয়ের উদ্বাহে যে ধন উপার্জ্জন করিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে শ্রোত্রিয়ের বাটীতে বিবাহ উপলক্ষে কুলীন বিদায় বলিয়া যে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্ত হইতেন, তাহাই তাঁহাদের সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের সম্বল হইত। এই কুলীনদিগের মধ্যে প্রায় কেহই কোন বিদ্যানুশীলন করিতেন না, এবং অনেকে সন্ধ্যা আহ্নিক পর্য্যন্তও শিখিতেন না। অহঙ্কারপূর্ব্বক কহিতেন যে আমরা

কুলীন সন্তান, আমাদের বিদ্যাভ্যাসের প্রয়োজন কি? নবদ্বীপ অধিকারস্থ কুলীনদিগের মধ্যে ইদানীং এরূপ ব্যবসায়ের দিন দিন হ্রাস হইতেছে। অধুনাতন অনেক কুলীনেরা শ্রোত্রিয়দিগের ন্যায় বিদ্যাভ্যাস করিয়া কৃতবিদ্য হইতেছেন, এবং ধনোপার্জ্জন করিয়া আপন আপন পরিবার প্রতিপালন করিতেছেন। আর কৌলীন্যাভিমান রক্ষা ব্যতীত ধন-লোভে বহু বিবাহ করা ক্রমেই মন্দীভূত হইয়া আসিতেছে।

পূর্ব্বে শূদ্র জাতির যেরূপ ব্যবসায় ও আচার ব্যবহার ছিল তাহারও বিস্তর পরিবর্ত্ত হইয়াছে। তৎকালে তন্তুবায়ের বস্ত্র বয়ন, কর্ম্মকারের লৌহ দ্রব্য গঠন, স্বর্ণকারের অলঙ্কার নির্ম্মাণ ইত্যাদি যে যে সম্প্রদায়ের যে যে ব্যবসায়, তাহারা তাহাই করিত। সামাজিক নিয়ম লঙ্ঘন শঙ্কায় ভিন্ন-সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইত না। ইদানীং যাঁহার যে ব্যবসায় করিতে ইচ্ছা অথবা সুবিধা হইতেছে তাহাই করিতেছেন। মুচি হাড়ি প্রভৃতি কতিপয় অত্যন্ত অন্ত্যজ জাতির ব্যবসায়ই স্ব স্ব সম্প্রদায় মধ্যে বদ্ধ রহিয়াছে।

এই অধিকারস্থ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক, সপ্তসতি এবং কান্যকুব্জ এই কয়েক শ্রেণী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং এক্ষণেও আছেন। পূর্ব্ব কালে ইহাঁদের মধ্যে পরস্পর আহার ব্যবহার ছিল না। যদি ঘটনাক্রমে এক শ্রেণীর লোক অন্য শ্রেণীর অন্ন ভোজন করিতেন, তবে তাঁহার নিন্দার সীমা থাকিত না। কেহ স্বশ্রেণীর মধ্যেও সজাতি ভিন্ন অন্যের অন্ন ভক্ষণ করিতেন না। অমুকের অন্ন গ্রহণ করা হইবেক না, অমুক দোষী ব্যক্তির অন্ন খাইয়াছেন, অতএব তাঁহার সহিত একত্র আহার করা যাইতে পারে না, ইত্যাদি বিষয় লইয়া সর্ব্বদাই গোলযোগ এবং

দলাদলী উপস্থিত হইত। ব্রাহ্মণের অন্ন ভোজনে শূদ্র জাতির কোন আপত্তি ছিল না। তাহারা বিপ্রের পত্রাবশিষ্ট অন্নও দেবতার প্রসাদের ন্যায় জ্ঞান করিয়া অতি ভক্তি সহকারে ভোজন করিতেন। কিন্তু আপন আপন জাতির মধ্যে ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বিলক্ষণ আঁটাআঁটী ছিল। ইদানীং ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে অন্ন বিচার যেরূপ শিথিলীভূত হইয়া আসিতেছে, শূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যেও ক্রমে ক্রমে সেইরূপ ভাব লক্ষিত হইতেছে।

পূর্ব্বকালে পানভোজনের যে প্রণালী ছিল, অদ্যাপি তাহার অধিক ব্যতিক্রম হয় নাই। অন্ন, ডাল, নিরামিষ ব্যঞ্জন, মৎস্য, দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, এই কয়েক খাদ্য দ্রব্য তদানীন্তন সাধারণ লোকের সচরাচর আহার ছিল। শাক্ত সম্প্রদায়ী লোকে কখন কখন ছাগ মাংস ভোজন করিতেন, কিন্তু এই ছাগ কোন শক্তি পূজার উদ্দেশে ছিন্ন না হইলে তাহার মাংস ভক্ষণ করিতেন না। কদাচিৎ কেহ মেষ ও মৃগ মাংসও ভোজন করিতেন। গোধূম বা যব চূর্ণ পিষ্টকাদি কোন বিশেষ প্রয়োজন ব্যতীত ব্যবহৃত হইত না। ব্রাহ্মণ ও সৎশূদ্রের বিধবারা নিরামিষ ভোজন ও একাহার করিতেন। বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী লোক মাত্রেই মাংস স্পর্শ করিতেন না, এবং অনেকে মৎস্য আহারেও বিরত থাকিতেন। ৪০ বৎসর হইতে হিন্দু শাস্ত্র নিষিদ্ধ পান ভোজন কিয়ৎ পরিমাণে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

ইদানীন্তন স্ত্রী পুরুষেরা যে রূপ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেছেন, পূর্ব্বকালীন লোকের সেরূপ পরিচ্ছদ ছিল না। তৎকালে, মধ্যবিত্ত ও হীনবিত্ত পুরুষেরা গ্রীষ্মকালে ধুতি ও দোবজা অথবা এক পাট্টা এবং শীতকালে ধুতি ও হামাম বা গ্লাপ ব্যবহার করিতেন। শীতকালে কদাচিৎ কেহ গায়ে বেনিয়ান বা মের্জাই ও

মস্তকে টুপী দিতেন অথবা উষ্ণীষ বাঁধিতেন। মধ্যবিত্ত কোন কোন প্রবীণ ব্যক্তি প্রাতে বনাৎ ও রাত্রিতে কার্পাসপূর্ণ রেজাই ব্যবহার করিতেন। তরুণবয়স্কেরা শীত নিবারণার্থ দোলাই ব্যবহার করিত। কোন কোন ধনী সময় বিশেষে পট্ট বস্ত্র পরিধান করিতেন। শাল রুমাল জামেয়ার প্রভৃতি মূল্যবান্ বস্ত্র অতি অল্প লোকেরই থাকিত। *কি গ্রীষ্ম কি শীত সকল সময়েই*, স্ত্রীগণের এক শাটী মাত্র পরিধেয় ছিল। তাহারা শীতানুভব করিলে আর এক খানি শাটী গাত্রে দিত। রাজসংসারের উচ্চ পদস্থ পুরুষেরা রাজভবন গমন কালে জামা ইজার ও পাকুড়ি ব্যবহার করিতেন। করচরণাচ্ছাদনার্থ কোন প্রকার বস্ত্র ব্যবহার করিতেন না। নবদ্বীপের রাজারা দেবার্চ্চন ভোজন ও শয়ন কালে ধুতি ও দোবজা পরিতেন। কিন্তু অন্য অন্য সময়ে পশ্চিমোত্তরীয় নানাবিধ পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন। রাজ্ঞী রাজবধূ ও রাজকন্যারা কার্পাস বা কৌষেয় শাটী পরিতেন; কিন্তু প্রায় সমস্ত শুভকর্ম্মোপলক্ষে পশ্চিমোত্তর দেশীয় সম্ভ্রান্ত মহিলাগণের ন্যায় কাঁচুলি, ঘাগ্ রা এবং ওড়না পরিধান করিতেন। ইহাঁরা শীত কালে বিবিধ বহুমূল্য কৌষেয় ও রাঙ্কব বস্ত্র অঙ্গে দিতেন এবং চর্ম্মপাদুকা ব্যবহার করিতেন। পূর্ব্ব কালে কি উত্তম কি মধ্যম কি অধম কোন শ্রেণীর লোকই পাতলা কাপড় পরিতেন না। কেহ তাদৃশ বস্ত্র পরিলে জনসমাজে অতিশয় নিন্দাস্পদ এবং উপহাসভাজন হইতেন।

প্রথমতঃ নবদ্বীপ অধিকারেই শান্তিপুরে পাতলা ধুতি ও শাটী নির্ম্মিত হইতে আরম্ভ হয়। ঢাকা নগরে বহুকালাবধি অতি সূক্ষ্ম ও পাতলা এক প্রকার বস্ত্র নির্ম্মিত হইয়া থাকে, ইহা এদেশে শব্‌নম্ ও ইউরোপে ঢাকাই মজলিন নামে খ্যাত এবং অতি

আগ্রহ সহকারে গৃহীত হয়। এতদ্দেশীয় হিন্দু সমাজে তথাবিধ বস্ত্র ব্যবহৃত ছিল কিনা তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। অত্রত্য রাজবাটীতে অথবা অন্যত্র এরূপ বস্ত্র দৃষ্টিগোচর হয় নাই। যদিও শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ নিজ ব্যবসায়ে বিশেষ নিপুণ, তথাপি এদেশে ব্যবহার না থাকাতে পাতলা ধুতি বা শাটী বয়ন করিত না। পরে যখন ঐ নগরে কোম্পানির বস্ত্র ব্যবসায়ের কুটী সংস্থাপিত হইল, তখন হইতেই ঐ কোম্পানির নিদেশানুসারে তন্তুবায়গণ ঢাকাই মজলিনের সদৃশ সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিল। আমি শান্তিপুরনিবাসী শতবর্ষ-দেশীয় এক জন তন্তুবায় মুখে অবগত হইয়াছি এবং তত্রত্য অন্য অন্য প্রাচীন লোক মুখে শুনিয়াছি যে, পূর্ব্বে সূক্ষ্ম বস্ত্র বয়নোপযোগী তাঁত্ পর্য্যন্ত এ অধিকারে ছিল না। কোম্পানির লোকেরা শান্তি-পুরের তাঁতিদিগকে ঐরূপ তাঁত প্রস্তুত করিয়া দেন। কুটীর কার্য্য বন্দ হইলে, তন্তুবায়গণ ঐ তাঁতে পাতলা ধুতি, উড়ানি ও শাটী বুনিতে আরম্ভ করে। ইহারা তৎপূর্ব্বে নকশা পাড় বুনিতে জানিত না। কটক প্রদেশের এক জন তন্তুবায় তথা হইতে আসিয়া শান্তিপুরে অবস্থিতি করে। শান্তিপুরের তাঁতিরা তাহারই নিকট নকশা পাড় বুনিতে শিখে। সূক্ষ্ম বস্ত্রে নকশা পাড় যেরূপ সুচারু হয়, ঘন বস্ত্রে সেরূপ হয় না। সুতরাং চিরা-ভ্যস্ত সূক্ষ্ম বস্ত্রে নকশা পেড়ে ধুতি ও শাটী অতি সুন্দররূপে প্রস্তুত হইতে লাগিল।

এই সকল পাতলা কাপড় প্রথমে শান্তিপুর বাসীরাই ব্যব-হার করেন। তদনন্তর কলিকাতা অঞ্চলে ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। ইতি পুর্ব্বে বেশ ভূষা বিষয়ে এ প্রদেশস্থ লোকেরা শান্তি-পুর ও কলিকাতা বাসীদিগের অনুকরণ করিতে উৎসুক ছিলেন।

সুতরাং ঐ প্রকার বস্ত্র ক্রমশঃ এ প্রদেশের সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইতে লাগিল। যদিও ইদানীং সৌভাগ্যক্রমে বিবিধ ঘন বুনানী বস্ত্র এদেশে আমদানি হওয়াতে অনেক পুরুষেরা পাতলা ধুতি পরিধানে বিরত হইয়াছেন, তথাপি তাঁহাদের অন্তঃপুরবাসিনীরা অদ্যাপি সকলে ঐরূপ বস্ত্রের ব্যবহার লজ্জাকর বোধ করেন না। যে সকল লজ্জাশীলা রমণীরা স্বীয় দেবরের সম্মুখেও অনবগুণ্ঠিতা হইতে লজ্জিতা হন, তাঁহারাও ঐরূপ নাম মাত্র বস্ত্র পরিয়া সর্ব্ব সমক্ষে উপস্থিত হইতে কিছু মাত্র সঙ্কুচিতা হন না।

পূর্ব্ব কালে এদেশে বিলাতী সূতার আমদানী ছিল না। এ দেশস্থ স্ত্রীলোকেরা যে সূত্র প্রস্তুত করিতেন তাহাতেই সর্ব্বপ্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হইত। এ প্রদেশে সূতা কাটিবার দ্বিবিধ যন্ত্র বিদ্যমান আছে। তক্রু ও চরকা। প্রথমোক্ত যন্ত্র দ্বারা সূক্ষ্ম সূত্র ও শেষোক্ত যন্ত্র দ্বারা স্থূল সূত্র প্রস্তুত হয়। কিন্তু তক্রু অপেক্ষা চরকায় অল্পকাল মধ্যে অধিক সূত্র হয় বলিয়া অধিকাংশ যোষাগণ চরকা ব্যবহার করিতেন। প্রতিবেশী তন্তুবায়গণ ঐ সকল সূতা কিনিয়া লইত। যাঁহারা যেরূপ সূক্ষ্ম সূত্র কর্ত্তনে সমর্থ হইতেন তাঁহারা সেইরূপ অর্থ লাভ করিতে পারিতেন, এবং স্ত্রী মণ্ডলে তদনুরূপ প্রশংসা ভাজন হইতেন। এই ব্যবসায় দ্বারা নিঃস্ব লোকের সংসার যাত্রা নির্ব্বাহের অনেক আনুকূল্য হইত। যদিচ মধ্যবিত্ত লোকেরা এই ব্যবসায়কে অপমানকর জ্ঞান করিতেন, তথাপি তাঁহাদের স্ত্রীলোকেরা যজ্ঞ-সূত্র বা নিজের বস্ত্র নির্ম্মাণের ছলে অধিক সূত্র কর্ত্তন করিতেন, এবং অতি সঙ্গোপনে অন্য স্ত্রীলোক দ্বারা বিক্রয় করাইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ অর্থ সঞ্চয়ে সমর্থ হইতেন। এই সকল সীমন্তিনীদিগের সূত্র কর্ত্তনের অবস্থা স্মৃতিপথারূঢ় হইলে, অদ্যাপি হৃদয় আনন্দরসে অভিষিক্ত

হয়। তাঁহারা অরুণোদয়ের পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া গৃহকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং ক্রমান্বয়ে গৃহ মার্জ্জন, পানভোজন, পাত্র প্রক্ষালন, রন্ধন, পরিবেশন ইত্যাদি কার্য্য সমাপনানন্তর ভোজন করিতেন, এবং তৎপরে দিবসের শেষ ভাগে তিন চারি জন একত্রিত হইয়া সূত্র কর্ত্তনে বসিতেন। ঐ সময়ে তাঁহারা কখন মধুকরীর ন্যায় মৃদু মধুর স্বরে গান করিতেন অথবা বিবিধ মধুরালাপে পরস্পর আমোদিত হইতেন।

পূর্ব্বে বিশেষ ধনবান্ ও সম্ভ্রান্ত না হইলে, আপনাদিগের কামিনীগণকে অধিক রত্নাভরণ ও স্বর্ণভূষণ দিতেন না। মধ্যবিত্ত মহিলাগণ নাশিকায় নথ, কর্ণদ্বয়ে নল ঝুম্‌কা বা ধেঁড়ি ঝুম্‌কা, গলদেশে পাঁচনর বা শাতনর বা কণ্ঠমালা, এই কয়েক খানি স্বর্ণালঙ্কার পরিতেন। আর বাহুদ্বয়ে তাড়, হস্ত দ্বয়ে বাউটি, গজরা, রুশুন, কুশী, কঙ্কণ ও পঁুইচা, কটিদেশে গোট বা চন্দ্রহার, পাদ যুগলে মল, পদাঙ্গুলিতে পাশুলি, এই কয়েক খানি রজত নির্ম্মিত আভরণ পরিধান করিতেন। অপেক্ষাকৃত হীনবিত্ত রমণীরা স্বর্ণাভরণের মধ্যে কেহ বা কেবল নথ ও কণ্ঠমালা, এবং তিন চারি খানি রূপার অলঙ্কার পাইলেই চরিতার্থ হইতেন। অধমাবস্থার স্ত্রীলোকের স্বর্ণ বা রজত নির্ম্মিত কোন অলঙ্কার থাকিত না। তাঁহারা কাংস্য ও পিত্তলের আভরণ পাইলেই কৃতার্থম্মন্যা হইতেন। রাজপরিবারস্থ কামিনীগণ, তৎকালেও, বিবিধ রত্ন খচিত স্বর্ণ ভূষণে ভূষিত থাকিতেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

নবদ্বীপাধিকারে সংস্কৃত, পারস্য, এবং বঙ্গভাষার অনুশীলন ছিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিত, বৈদ্য, ঘটক, কুলজ্ঞ সন্তানেরা প্রায় সকলেই বাল্যাবস্থায় সংস্কৃত ভাষা অভ্যাসে প্রবৃত্ত হইতেন। এতদ্ভিন্ন, রাজকুমার, কোন কোন রাজকুটুম্ব, ও প্রধান রাজকর্ম্মচারীদিগের পুত্রেরাও, এই ভাষা কিয়ৎ পরিমাণে শিখিতেন। পূর্ব্বে নবদ্বীপ, ভাটপাড়া, কামাল্‌পুর, কুমারহট্ট, শান্তিপুর, উলা, বহির্‌গাছি, বিল্বপুষ্করিণী, বিল্বগ্রাম প্রভৃতি কয়েক স্থানে অনেক টোল চতুষ্পাটী ছিল। বিদ্যার্থিগণ নানা প্রদেশ হইতে ঐ সকল স্থানে অধ্যয়ন করিতে আসিতেন। এতদ্ব্যতীত অনেক গ্রামে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টোল ছিল। নিকটস্থ অধ্যয়নার্থীরা তথায় অধ্যয়ন করিতেন, এবং তন্মধ্যে যাহাদের অধিক বিদ্যালাভের অভিলাষ হইত, তাঁহারা ঐ সকল টোলে কিয়দ্দূর পাঠ সমাপন করিয়া, প্রাগুক্ত কোন এক স্থানের টোলে প্রবিষ্ট হইতেন। তদানীন্তন ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ কেবল অধ্যয়ন, অধ্যাপন, ধর্ম্মালোচনা ও গ্রন্থ রচনা এই সকল অনুষ্ঠানেই জীবন যাপন করিতেন। সাংসারিক সুখ দুঃখের প্রতি প্রায় কিছুই মনোনিবেশ করিতেন না। নবদ্বীপের রাজারা, তাঁহাদের সংসার যাত্রা ও ছাত্রগণের আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহার্থে যে কিছু ভূমি দান বা বাৎসরিক বৃত্তি প্রদান করিতেন, তাহাতেই তাঁহারা পরিতুষ্ট থাকিতেন। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য কোন বর্ণের দান গ্রহণ করিতেন না। প্রবাদ আছে যে একদা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায় নবদ্বীপের কোন এক প্রধান নিঃস্ব নৈয়ায়িককে জিজ্ঞাসা করেন যে, আপনার কোন অনুপপত্তি আছে

কি না। স্থল বিশেষে অনুপপত্তি পদে অসঙ্গতি বুঝায়। রাজার প্রশ্নের তাৎপর্য্য এই যে ভট্টাচার্যের সাংসারিক অসঙ্গতি অর্থাৎ অভাব আছে কি না। কিন্তু ভট্টাচার্য্যের সাংসারিক বিষয়ে এতই অনাস্থা ছিল যে রাজার মনোগত ভাবের প্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য না করিয়া অনুপপত্তি পদে শাস্ত্রীয় অসঙ্গতি অর্থাৎ অসংলগ্নতা ভাবিয়া উত্তর করিলেন যে চারি চিন্তামণির মধ্যে আমার কোন অনুপপত্তি নাই, অর্থাৎ চারি খণ্ড চিন্তামণি গ্রন্থের মধ্যে কোন স্থলই তাঁহার অলাগ ছিল না।

পূর্ব্বোল্লিখিত স্থান সমূহে পূর্ব্বে এ বিদ্যার আলোচনা যেরূপ ছিল ইদানীং আর সেরূপ নাই। কোন স্থানের টোল চতুষ্পাটী এক কালে উঠিয়া গিয়াছে এবং কোন স্থানে অতি সামান্যাবস্থায় রহিয়াছে। একে এই রাজারা নিঃস্ব হওয়াতে ইদানীন্তন পণ্ডিতগণ পূর্ব্ববৎ রাজদত্ত আনুকূল্য লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন, তাহাতে আবার বিষয়ী লোকদিগের ন্যায় তাঁহাদের ভোগাভিলাষ প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং তাঁহারা যাহাতে শীঘ্র শীঘ্র অধ্যাপনা পূর্ব্বক সর্ব্বত্র নিমন্ত্রণ পাইয়া অর্থ লাভ করিতে পারেন, তদ্বিষয়েই তাঁহাদের মন ধাবিত হইতেছে। একারণ অধুনাতন ছাত্রগণ ব্যাকরণ, অভিধান, ভট্টি ও নৈষধের কিয়দংশ পাঠানন্তর কেহবা স্মৃতি কেহবা ন্যায়শাস্ত্র অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন, এবং নব্য ও প্রাচীন স্মৃতির কিয়দংশ অথবা ন্যায় শাস্ত্রের দুই এক খণ্ডের মাথুরী ও জাগদীশী টীকা ও গাদাধরী পাতড়া পাঠ করিয়াই অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করেন। আর যাহাতে অধিক নিমন্ত্রণ পত্র পান এবং সভায় বৃথা বাদ বিতণ্ডা পূর্ব্বক জয়ী হইতে পারেন তৎপ্রতিই ঐকান্তিক যত্ন করিতে থাকেন। এদিকে অনেক মূল গ্রন্থ তাঁহাদের নয়নগোচরও হয় না।

অধুনা সংস্কৃত কালেজ ব্যতীত এ অধিকারে নবদ্বীপ ও ভাট পাড়ায় সংস্কৃত শাস্ত্রের অধিক আলোচনা আছে। যদিও ইদানীং নবদ্বীপে পূর্ব্বতন পণ্ডিতগণের তুল্য অধ্যাপকের অসদ্ভাব হইয়াছে, তথাপি নানাদেশ হইতে বিদ্যার্থীরা তথায় আসিয়া অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। এক্ষণে নবদ্বীপে ধর্ম্মশাস্ত্রের টোল ৯, ন্যায় শাস্ত্রের টোল ৭ এবং বেদান্ত মীমাংসা সাঙ্খ্য ও পাতঞ্জল দর্শন ইত্যাদির টোল ১ খানি আছে।

পূর্ব্বকালে, এই অধিকার মধ্যে সংস্কৃত ভাষার যেমন উৎকৃষ্টাবস্থা হইয়াছিল, বঙ্গ ভাষার তেমনই নিকৃষ্টাবস্থা ছিল। তৎকালে গুরু মহাশয়ের পাঠশালাই বঙ্গভাষানুশীলনের টোল চতুষ্পাঠী ছিল। গুরুমহাশয়গণ প্রায়ই কায়স্থ জাতীয় ছিলেন, এবং বর্দ্ধমান প্রদেশ হইতে এদেশে আসিয়া পাঠশালা করিয়া শিক্ষা দিতেন। তাঁহারা শুভঙ্করীয় অঙ্ক, জমীদারী কার্য্যোপযোগী বিদ্যা, এবং পত্র লিখিবার পাঠাপাঠ জানিতেন। তাঁহাদের শিষ্যগণকে তাহা শিখাইতে পারিলেই আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেন। তাঁহাদের পাঠশালায় কোন প্রকার পুস্তক অধীত হইত না। প্রত্যেক ভদ্র গ্রামে এক এক জন গুরুমহাশয়ের অবস্থান হইত, এবং সন্নিহিত তিন চারি গ্রামের বালক আসিয়া তাঁহার পাঠশালায় লেখাপড়া করিত। পাঠশালার নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্থানের প্রয়োজন হইত না, গ্রামের কোন এক ভদ্র লোকের চণ্ডীমণ্ডপ পাঠ গৃহের প্রয়োজন সাধন করিত। প্রথমে মাটীর উপর খড়ি দিয়া লিখিয়া বালকেরা বর্ণপরিচয় করিতে শিখিত, অনন্তর কলা বানান লেখা ও অঙ্ক শিক্ষার জন্য তাল পত্র তৎপরে রম্ভাপত্র এবং জমীদারী কাগজ পত্র শিক্ষা ও হস্তাক্ষরের সৌন্দর্য্য সাধনের নিমিত্ত কাগজ ব্যবহৃত হইত। ভাষা শিক্ষার প্রণালী কিছু মাত্র ছিল না।

বালকদিগের কেবল সামান্য অঙ্ক শিক্ষা ও হস্তাক্ষরের সৌন্দর্য্য সম্পাদনের প্রতি যত্ন হইত। সুতরাং তাহাদের ভাষা জ্ঞান প্রায় কিছু মাত্রই হইত না। কিন্তু জমীদারী ও বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহোপযোগী বিষয়ে তাহারা এরূপ পারদর্শী হইত যে, তাহারা অঙ্কপাত না করিয়া অল্প কাল মধ্যে যে সকল প্রশ্ন অনায়াসে সমাধান করিত, এক্ষণকার কালেজের সুশিক্ষিত ছাত্রগণ অঙ্কপাত করিয়া তাহার দ্বিগুণ সময় মধ্যেও এই সকল অঙ্ক সমাধান করিতে পারেন না। পূর্ব্বে যবনজাতীয় দিগের মধ্যে গ্রামের মণ্ডল ব্যতীত প্রায় কেহই বঙ্গ ভাষার আলোচনা করিত না।

তৎকালে পরিশুদ্ধ বঙ্গভাষা কহিবার বা লিখিবার প্রথাই ছিল না। সকল কথোপকথন ও লিখনের মধ্যে স্থানে স্থানে অনেক পারস্য ও হিন্দী শব্দ ব্যবহৃত হইত। এ রাজবাটীর মুন্সীরা (পত্র ইত্যাদি লেখকেরা) সংস্কৃত ভাষায় বিলক্ষণ অভিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু তাঁহারাও পত্র মধ্যে অপর ভাষা প্রয়োগ করিতেন। তদানীন্তন পণ্ডিতগণ প্রায়ই অপর ভাষা কহিতেন না, কিন্তু পত্র লিখিবার সময়ে হয় সম্পূর্ণ সংস্কৃত, নয় ত সংস্কৃত মিশ্রিত ভাষা লিখিতেন।

নবদ্বীপের রাজারা এ প্রদেশে সংস্কৃত ভাষার উন্নতি সাধনে বহুতর যত্ন করিয়াছেন বটে, কিন্তু বঙ্গ ভাষার উন্নতি সাধনে কিছু মাত্র মনোযোগ করেন নাই। রাজারা কেন ভাগীরথীর পূর্ব্বপারস্থ প্রায় কোন ব্যক্তি দ্বারাই মাতৃ ভাষার উন্নতি সাধন হয় নাই। ইহার যে কিছু উন্নতি লক্ষিত হইতেছে—তাহা ভাগীরথীর পশ্চিমপারস্থ অধিবাসীদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছে। আদি কবি বিদ্যাপতি, প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস, চৈতন্যচরিতামৃত

রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ, চণ্ডীকাব্য রচয়িতা কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী, মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাস, শিবসঙ্কীর্ত্তন রচয়িতা রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য, এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ অন্নদামঙ্গল রচয়িতা ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর প্রভৃতি সকল কবিগণই ভাগীরথীর পশ্চিম পার বাসী। (১) ভাগীরথীর পূর্ব্ব পারে কেবল চৈতন্যমঙ্গল কাব্য রচয়িতা বৃন্দাবন দাস, রামায়ণ কাব্য রচয়িতা কৃত্তিবাস, এবং বিদ্যা সুন্দর, কালী ও কৃষ্ণ কীর্ত্তন রচয়িতা রাম প্রসাদ সেন প্রাদুর্ভূত হন। (২)

কিন্তু এই তিন জন কবি মধ্যেও প্রাচীন কবি বৃন্দাবন দাসের পিতার বাসস্থান ভাগীরথীর পশ্চিম পারে ছিল। নবদ্বীপ নিবাসী শ্রীনিবাস পণ্ডিতের দুহিতা নারায়ণীর গর্ভে বৃন্দাবন দাসের জন্ম হয়। বঙ্গ ভাষায় গদ্য লিখিবার যে বিশুদ্ধ প্রণালী প্রচলিত হইয়াছে, তাহাও পর-পারবর্ত্তী প্রদেশ বিশেষের মহোদয়গণ কর্ত্তৃক উদ্ভাবিত। প্রথমে রাজা রামমোহন রায় ইহার সূত্রপাত করেন, পরে অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়রা ইহার বর্ত্তমান উন্নত অবস্থা করিয়া তুলেন। ঐ প্রদেশ-বাসীরাই চণ্ডীর গান, যাত্রা, কীর্ত্তন, গাছ রামায়ণ, প্রভৃতির আদর্শ

(১) বিদ্যাপতি,—বাঁকুড়ার অন্তর্গত ছাতনা প্রদেশ বাসী।
চণ্ডীদাস,—বীরভূমের অন্তঃপাতি নান্নুর গ্রাম বাসী।
কৃষ্ণদাস কবিরাজ,—বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্ভূত কামটপুর বাসী।
কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী,—ঐ জেলার অন্তর্গত দামুন্যা গ্রাম বাসী।
কাশীরাম,—ঐ জেলার অন্তর্ভূত সিঙ্গি গ্রাম বাসী।
রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য—মেদিনীপুরের অন্তঃপাতি কর্ণগড় বাসী।
ভারতচন্দ্র,—বর্দ্ধমান প্রদেশের অন্তর্গত পেঁড়ো গ্রাম বাসী।

(২) বৃন্দাবন দাস,—নবদ্বীপ নিবাসী।
কৃত্তিবাস,—নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রাম বাসী।
রাম প্রসাদ সেন,—ঐ জেলার অন্তর্ভুত কুমার হট্ট বাসী।

প্রদর্শন করেন। অঙ্ক বিদ্যার জ্যোতিও ঐ পার হইতে এই পারে বিকীর্ণ হয়। কারণ এ প্রদেশে যে সকল পাঠশালা ছিল তাহার গুরু মহাশয়েরা প্রায়ই পশ্চিম পার বাসী ছিলেন।

পূর্ব্ব কালে রাজপুত্র, রাজদৌহিত্র, এবং রাজার প্রধান কর্ম্মচারীগণের তনয়েরা পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতেন। এ বিদ্যা নিতান্ত অর্থকরী বলিয়া প্রতীতি থাকাতে এবং রাজসংসারের দুই একটি কর্ম্ম ব্যতীত আর কোন কার্য্যে ব্যবহার না থাকাতে, লোক সাধারণে আপনাদের পুত্রগণকে ঐ ভাষা শিখাইবার অভিলাষী হইতেন না। নবাব সংসার ও ফৌজদার প্রভৃতি সম্রাটের প্রধান কর্ম্মচারীর সহিত কথোপকথনে ও লিখন পঠনে, ঊর্দু ও পারস্য ব্যতীত অন্য কোন ভাষার ব্যবহার না থাকায়, রাজা ও তাঁহার প্রধান কর্ম্মসচিবগণ বাল্যাবস্থায় ঐ বিদ্যা অভ্যাস করিতেন। আর যে সকল নগরে নবাব ও ফৌজদার অবস্থান করিতেন, সেই সেই নগরে ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় গ্রামে ঐ ভাষার অনুশীলন হইত। পরে এদেশ ইংরাজ অধিকৃত হইলে মুসলমান রাজাদিগের প্রথানুসারে সকল বিচারালয়ে এই ভাষা প্রচলিত হওয়াতে, এই বিদ্যার ক্রমশঃ সর্ব্বত্র প্রচলন হইয়া উঠে। অনেক গণ্ডগ্রামের ধনশালী ব্যক্তিরা আপন আপন ভবনে এক এক জন উক্ত ভাষাবিৎ-যবন জাতীয় শিক্ষক রাখিয়া স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে এই ভাষা শিক্ষা দিতে আরম্ভ করেন, এবং প্রতি-বাসীদিগের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুগামী হন। এই সকল শিক্ষকের অনেকেই শিক্ষা দান কার্য্যে পারদর্শী ছিলেন না। তাঁহারা মাসিক পাঁচ ছয় টাকা পাইলেই সন্তুষ্ট হইতেন। একারণ যৎকিঞ্চিৎ অধ্যয়ন করিয়াই অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিতেন। ছাত্রগণ দশ বার খানি পুস্তক পাঠ করিয়া কোন বিচা-

রালয়ের প্রচলিত কার্য্য প্রণালী শিখিতে প্রবৃত্ত হইতেন। যদিও তাঁহাদের অধীত পুস্তকের মধ্যে পন্দনামা, গোলেস্তা, বোস্তা তিন খানি উৎকৃষ্ট নীতিগর্ভ গ্রন্থ আছে, তথাপি শিক্ষা পদ্ধতির দোষে বালকেরা ঐ কয়েক খানি গ্রন্থের অর্থ বোধেও সমর্থ হইত না। রচনাশক্তি লাভের প্রতিই পাঠকবৃন্দের বিশেষ মনোনিবেশ থাকিত। ধনবান্ মুসলমানদিগের মধ্যে অনেকে পারস্য ও আরব্য উভয় ভাষাতেই পারদর্শী হইতেন। কিন্তু পারস্য শিক্ষার দ্বারা কি হিন্দু কি মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের বালকেরা ধর্ম্মনীতির ফল লাভ করিতে পারিতেন না।

যখন ১৮৩৭খৃঃ অব্দের ২৯ বিধি অনুসারে, ১৮৩৮ অব্দে, বঙ্গ দেশের জেলার বিচারালয়ে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে বঙ্গভাষা ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইল, সেই সময় হইতে হিন্দু সমাজ মধ্যে পারস্য ভাষার অনুশীলন রহিত হইয়া গেল, এবং মুসলমানদিগের মধ্যেও ইহার আলোচনা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল। আর বঙ্গভাষার আলোচনা অধিক পরিমাণে হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মুসলমান অধিপতিদিগের ন্যায় প্রদেশ শাসন কর্ত্তা ও ভূম্যধিকারীরাও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। যে প্রদেশের শাসন কর্ত্তা ও ভূম্যধিকারী বুদ্ধিমান্ ও ন্যায়বান্, তৎপ্রদেশবাসীরা সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিতেন, এবং যে প্রদেশের শাসন কর্ত্তা ও ভূম্যধিকারী অবিবেচক ও অধার্ম্মিক, সে প্রদেশের লোকেরা অসুখে ও অস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেন। যদিচ

রালয়ের প্রচলিত কার্য্য প্রণালী শিখিতে প্রবৃত্ত হইতেন। যদিও তাঁহাদের অধীত পুস্তকের মধ্যে পন্দনামা, গোলেস্তা, বোস্তা তিন খানি উৎকৃষ্ট নীতিগর্ভ গ্রন্থ আছে, তথাপি শিক্ষা পদ্ধতির দোষে বালকেরা ঐ কয়েক খানি গ্রন্থের অর্থ বোধেও সমর্থ হইত না। রচনাশক্তি লাভের প্রতিই পাঠকবৃন্দের বিশেষ মনো-নিবেশ থাকিত। ধনবান্ মুসলমানদিগের মধ্যে অনেকে পারস্য ও আরব্য উভয় ভাষাতেই পারদর্শী হইতেন। কিন্তু পারস্য শিক্ষার দ্বারা কি হিন্দু কি মুসলমান কোন সম্প্রদায়ের বালকেরা ধর্ম্মনীতির ফল লাভ করিতে পারিতেন না।

যখন ১৮৩৭খৃঃ অব্দের ২৯ বিধি অনুসারে, ১৮৩৮ অব্দে, বঙ্গ দেশের জেলার বিচারালয়ে পারস্য ভাষার পরিবর্ত্তে বঙ্গভাষা ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হইল, সেই সময় হইতে হিন্দু সমাজ মধ্যে পারস্য ভাষার অনুশীলন রহিত হইয়া গেল, এবং মুসলমানদিগের মধ্যেও ইহার আলোচনা ক্রমশঃ মন্দীভূত হইয়া আসিল। আর বঙ্গভাষার আলোচনা অধিক পরিমাণে হইতে লাগিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

মুসলমান অধিপতিদিগের ন্যায় প্রদেশ শাসন কর্ত্তা ও ভূম্য-ধিকারীরাও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন। যে প্রদেশের শাসন কর্ত্তা ও ভূম্যধিকারী বুদ্ধিমান্ ও ন্যায়বান্, তৎপ্রদেশবাসীরা সুখে ও স্বচ্ছন্দে কালাতিপাত করিতে পারিতেন, এবং যে প্রদেশের শাসন কর্ত্তা ও ভূম্যধিকারী অবিবেচক ও অধার্ম্মিক, সে প্রদেশের লোকেরা অসুখে ও অস্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেন। যদিচ

এই রাজারাও স্বেচ্ছাচারী ছিলেন, তথাপি ইহাঁদের প্রজারঞ্জন-বিষয়ে বিশেষ সুখ্যাতি ছিল। যে সকল পরগণা পূর্ব্বাধিকারিগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া জনশূন্য হইয়া যাইত, সে সকল পরগণা এ রাজাদিগের হস্তে আসিলে পুনরায় জনাকীর্ণ হইত। দিল্লী-শ্বরের যে সকল ফরমাণ রাজবাটীতে বর্ত্তমান আছে, তাহার কোন কোন ফরমাণে এই রাজারা প্রজারঞ্জক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। প্রজাগণের সুখ সাধন ও অনিষ্ট নিবারণ বিষয়ে ইহাঁদের আন্তরিক যত্ন ছিল, ইহা অনেক প্রাচীন লোক মুখে শুনিয়াছি এবং ইহার প্রত্যক্ষ প্রমাণও অদ্যাপি দীপ্যমান আছে। প্রজাপুঞ্জের জল-সুখের জন্য বিপুল অর্থব্যয় স্বীকার করিয়া এই বিস্তীর্ণ অধিকার মধ্যে স্থানে স্থানে সুদীর্ঘ জলাশয় সকল প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ঐ সকল জলাশয়ের মধ্যে অদ্যাপি অনেক বর্ত্তমান আছে। ইহাঁরা প্রজার স্থানে অন্যায় ও অসঙ্গত কর গ্রহণে কখনই প্রবৃত্ত হইতেন না, বরং শস্যোৎপত্তির কোন বিঘ্ন হইলে নির্দ্ধারিত করেরও কিয়দংশ ক্ষমা করিতেন। আপন অধিকার মধ্যে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর অধিক বসতি হইবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ মাত্রেরই বাস্তু ভূমির কর গ্রহণ করিতেন না। গুণের উৎসাহার্থে গুণবানকে যথেষ্ট ভূমি দান করিতেন (১)। স্বীয় ইষ্টকর হইলেও প্রজাদিগের অনিষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন না। জমীদারী মধ্যে মদ্য বিক্রীত হইলে প্রজাপুঞ্জের অমঙ্গল হইবেক বলিয়া সুরা বা তাড়ি প্রস্তুত করণে দৃঢ়তর নিষেধ ছিল।

ইংরাজ অধিকারের পূর্ব্বে এই রাজাদিগের জমীদারী মধ্যে

(১) ছিদাম সুবল নামে এক কীর্ত্তন সম্প্রদায়কে শান্তিপুরের সন্নিহিত হরিপুরের চরে শতাধিক বিঘা ভূমি দিয়াছিলেন। ঐ ভূমি অদ্যাপি তাহাদের নামে খ্যাত আছে।

সিদ্ধি ও গাঁজা ব্যতীত আর কোন মাদক দ্রব্য প্রায়ই ব্যবহার ছিল না। সিদ্ধি ভক্ষণে কোন অনিষ্ট বা নিন্দা ছিল না এ নিমিত্ত ভদ্র সমাজস্থ অনেক লোকে ইহারই অনুরাগী ছিলেন। ত্বরিতানন্দ প্রায় ছোট লোকের মধ্যেই ব্যবহৃত হইত। ভদ্র লোকের মধ্যে যিনি ইহাতে আশক্ত হইতেন তিনি অতিশয় নিন্দাস্পদ হইতেন। মদ্যপায়ী ব্যক্তি সমাজ মধ্যে কোন রূপেই স্বপদস্থ থাকিতে পারিত না। সুতরাং প্রায় কেহই ইহাতে অনুরক্ত হইতে সাহসী হইত না। ইংরাজ রাজত্বে এই মাদক দ্রব্যের এতাদৃশ আদর হইয়া উঠিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ রাজপুরুষ অনরেবল শোর সাহেব কহিয়া গিয়াছেন যে, মদ মত্ততা ও অন্য অন্য মাদক দ্রব্যের ব্যবহার ইংরাজ রাজ্যে অতীব বৃদ্ধি হইয়াছে। ঐ সাহেব আরও কহিয়াছেন যে, "প্রায় ৬০ বর্ষ পূর্ব্বে এক জন ভদ্র ইংরাজ ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি এদেশীয় এক জন রাজার ব্যবহারের বিষয় এইরূপে বর্ণন করেন যে, তাঁহার ভারতবর্ষে উপস্থিতির অব্যবহিত পরেই, তিনি কৃষ্ণনগরে অবস্থিতি করেন, এবং তাঁহার জনৈক বন্ধুর নিমিত্ত কিঞ্চিৎ তাড়ি সংগ্রহার্থে এক জন লোকের জন্য তৎপ্রদেশের রাজার নিকট প্রার্থনা করেন। রাজা এই বলিয়া সম্মতি দিলেন যে, যে ব্যক্তি তাড়ি আনিবেক সে পাছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত আনিয়া মদ্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় পূর্ব্বক তাঁহার প্রজাগণের মধ্যে মত্ততার উৎপত্তি করিয়া দেয়, এ কারণ ঐ লোকের সঙ্গে এক জন প্রহরী যাইবেক (১)।" যদিচ ইহাঁদের মধ্যে কোন কোন রাজা লোভ ক্রোধ বা অন্য কোন নিকৃষ্ট বৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া কখন কখন ব্যক্তি বিশেষকে মর্ম্মান্তিক বেদনা দিয়াছেন, তথাপি

(১) জর্জ টমসন সাহেবের বক্তৃতা ১২ পৃষ্ঠা।

এই রাজবংশের প্রায় সকলেই এ প্রদেশবাসী সাধারণের অতীব স্নেহ ও আদরের পাত্র ছিলেন। ইংলণ্ডবাসীরা যেমন ঈশ্বরের উপাসনা সমাপনান্তে প্রথমে স্বদেশের রাজার মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া থাকেন, সেইরূপ এ প্রদেশস্থ স্ত্রীপুরুষ সকলেই, প্রতি দিন স্বীয় ইষ্টদেবতার পূজা সমাধানান্তে, অগ্রে এই রাজাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া পরে স্বীয় সন্তান সন্ততি প্রভৃতিকে আশীর্ব্বাদ করিতেন।

এই রাজাদিগের জমীদারী মধ্যে অতীব খাদ্য-সুখ ছিল। ৪০ বৎসর পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি যে এ প্রদেশ মধ্যে সামান্য তণ্ডুলের মন ৸০ আনা, কলাই ছোলা ও অড়হরের মন ॥০ আনা, মুগের মণ ১ টাকা, তৈলের মন ৫ টাকা, ঘৃতের মন ১০ টাকা, মটর খেঁশারি ও মুসুরির মন ।৶ আনা ছিল। অন্য অন্য খাদ্যও ঐরূপ সুলভ মূল্যে পাওয়া যাইত। ইহার পূর্ব্বে এই সকল দ্রব্যের মূল্য আরও অল্প ছিল। যবন আধিপত্য সময়ে ইহাদের অধিকার মধ্যে যে কখন দুর্ভিক্ষ হইয়াছে ইহা কোন ইতিহাসে পাঠ করি নাই এবং কোন প্রাচীন লোকের মুখেও শুনি নাই। ইংরাজ অধিকার কালের প্রথমে ১৭৭০ খৃঃ অব্দে যে দুর্ভিক্ষ হয়, ইহাই বঙ্গ দেশের প্রথম দুর্ভিক্ষ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। উক্ত অব্দ ও ১৮৬৬ অব্দের মধ্যবর্ত্তী কাল মধ্যে এই প্রদেশে আর তাদৃশী দুর্ঘটনা সংঘটিত হয় নাই।

এই রাজাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। নানা অঞ্চল হইতে বিবিধ বিদ্যা বিশারদপণ্ডিতগণকে আনিয়া স্বীয়াধিকার মধ্যে স্থাপন করিতেন, অথবা রাজধানীতে আদর পূর্ব্বক রাখিতেন। সকল টোল ও চতুষ্পাঠীর অধ্যাপকদিগকে তাঁহাদের ব্যয় নির্ব্বাহ যোগ্য ভূমি প্রদান করিতেন, এবং পাঠকগণের আবশ্যক ব্যয়ের নিমিত্ত প্রত্যেক টোলে কিছু কিছু বার্ষিক

বৃত্তি দিতেন। যখন কোন ছাত্র, আপনার পাঠ সমাপনানন্তর, অধ্যাপনা করিবার মানস করিতেন, তখন তিনি রাজসদনে সমাগত হইয়া আপন বিদ্যার পরিচয় দিতেন, এবং, অধ্যাপনক্ষম হইলে, নিয়মিত বৃত্তি পাইতেন। পাঠকগণ, অধ্যয়ন সমাপন করিয়া, রাজসন্নিধানে পরীক্ষা প্রদানপূর্ব্বক উপাধি গ্রহণ করিতেন। এতদ্ব্যতীত ছাত্রগণ, মধ্যে মধ্যে, রাজসমীপে আসিয়া বিদ্যার পরিচয় দিতেন, এবং রাজাকে সন্তুষ্ট করণে সমর্থ হইলে পারিতোষিক প্রাপ্ত হইতেন। অবকাশানুসারে রাজারাও, সময়ে সময়ে, চতুষ্পাঠীতে যাইয়া অধ্যাপকদিগের সহিত শাস্ত্রালাপ করিতেন, এবং পাঠকগণকে উৎসাহ প্রদানে যত্নবান্ হইতেন। আর প্রত্যহ কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে, সভাস্থ ও অভ্যাগত পণ্ডিতগণের সহিত নানাবিধ শাস্ত্রের আলাপ করিতেন। মধ্যে মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশ হইতে বিখ্যাত পণ্ডিতেরা আসিতেন; রাজা তাঁহাদিগকে যার পর নাই সমাদরে রাখিতেন, এবং যথোপযুক্ত পুরস্কার দিয়া বিদায় করিতেন। ইহাঁরা কেবল নিজ অধিকারস্থ অধ্যাপকদিগের আনুকূল্য করিতেন এমন নহে; ইহাঁরা ভিন্ন অধিকারের প্রধান প্রধান অধ্যাপকগণেরও যথেষ্ট উৎসাহ বর্দ্ধন করিতেন। গুপ্তিপাড়াবাসী প্রসিদ্ধ বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও ত্রিবেণীনিবাসী বিখ্যাত জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, যদিও অন্যের অধিকারে বাস করিতেন, তথাপি এই রাজাদিগের সভাসদ ছিলেন। বাকলা বিক্রমপুর প্রভৃতি দূরবর্ত্তী প্রদেশের পণ্ডিতগণ, এই রাজাদিগের নিকট ব্রহ্মোত্তর পাইয়াছেন, এবং অদ্যাপি তাঁহাদের বংশীয়েরা ভোগ করিতেছেন।

রাজারা আপনাদের সন্তানদিগকে সংস্কৃত বিদ্যা উত্তমরূপে শিখাইবার বিশেষ যত্ন পাইতেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ও তদীয় পুত্রগণের রচিত যে কয়েকটি কবিতা পরিশিষ্টতে উদ্ধৃত করা গেল,

তাহা পাঠ করিলে, পাঠকবৃন্দ তাঁহাদের বিদ্যার পরিচয় পাইবেন, এবং বোধ করি প্রীতও হইবেন। রাজবাটীতে এই ভাষা এত দূর ব্যবহৃত হইত যে, যে সকল পরিচারকেরা সর্ব্বদা রাজার সন্নিকটে থাকিত, তাহাদের মধ্যে অনেকে সংস্কৃত কথা বুঝিতে পারিত। বঙ্গ রাজ্য ইংরাজ অধিকৃত হইলে, নিষ্করৰূপে ভূমি দানের ক্ষমতা আইনানুসারে রহিত হইলেও এই রাজাদিগের যত দিন বিভব ছিল, তত দিন এই বিদ্যার উৎসাহ বর্দ্ধনের নিমিত্ত, ইহাঁরা কিঞ্চিন্মাত্র ত্রুটি করেন নাই।

ইহাঁরা নিজাধিকার মধ্যে সঙ্গীত শাস্ত্রের উন্নতি সাধনার্থ, দিল্লী হইতে সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদগণকে আনাইয়া, আপনার ও অপর ব্যক্তিদিগের সন্তানগণকে, এই বিদ্যা শিক্ষা দেওয়াইতেন। এই কারণে যে পর্য্যন্ত এই রাজাদিগের ঐশ্বর্য্য ছিল, সে পর্য্যন্ত এ প্রদেশস্থ অনেক ব্যক্তি সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। রোশন চৌকি, দম্পবাঁশী, এবং নওবৎ এই তিন প্রকার মনোহর বাদ্য, অতি পূর্ব্বে এ প্রদেশে প্রচলিত ছিল না। এই রাজারাই পশ্চিমাঞ্চল হইতে সুনিপুণ বাদক আনাইয়া, এ প্রদেশীয় লোককে ঐ সকল বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ান। ইংরাজী বাদ্য, (ব্যাণ্ড) পূর্ব্বে এ দেশস্থ লোকের মধ্যে, কেবল কলিকাতার নিকটস্থ স্থান বাসী ফিরিঙ্গীরা জানিত। বহু ব্যয় সমর্থ না হইলে দূরবর্ত্তী লোকেরা তাহাদিগকে আনিতে পারিতেন না। এই রাজবংশোদ্ভব রাজা গিরীশচন্দ্র, কলিকাতার এক দল ইংরাজ বাদ্যকর কৃষ্ণনগরে আনিয়া, চর্ম্মকার জাতীয় কয়েক জনকে তাহাদের দ্বারা শিক্ষা দেওয়ান।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের প্রপিতামহ রাজা রুদ্র, ঢাকা হইতে আলাম-দস্ত নামক এক জন প্রসিদ্ধ স্থপতিকে আনাইয়া, কৃষ্ণনগরের রাজ-

বাটীর চক ও নওবৎখানা ইত্যাদি প্রাসাদ নির্ম্মাণ করান; এবং তাহাকে এখানে রাখিয়া অত্রত্য গাঁড়ার জাতীয় অনেক ব্যক্তিকে তদ্দ্বারা স্থপতি বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ান। এই জাতির মধ্যে এরূপ সুনিপুণ স্থপতি সকল হয়, যে তাহারা কৃষ্ণনগরের রাজভবনে যে বৃহৎ ও শোভান্বিত পূজার দালান ও শিবনিবাসের যে তিন দেব মন্দির নির্ম্মাণ করে, তাহার কল কৌশল অদ্যাপি দেখিলে দর্শকগণ প্রীত ও চমৎকৃত হন। এমন সুন্দর, সুপ্রশস্ত ও সুদৃঢ় পূজার প্রাসাদ, এবং এরূপ উন্নত ও দৃঢ়তর মন্দির, বঙ্গদেশের মধ্যে অন্য কোন স্থানে নয়নগোচর হয় না। প্রথমোক্ত অট্টালিকা প্রায় সার্দ্ধেক শত বর্ষ পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং তাহার আবশ্যক সংস্কার প্রায় কখনই হয় নাই, তথাপি তাহার কোন স্থানে একটি ছিদ্রও দৃষ্ট হয় না। শিবনিবাসের কোন কোন অট্টালিকার প্রাচীরে চূর্ণ ও সুরকি ইত্যাদি সামান্য উপকরণ দ্বারা এরূপ সুন্দর ও সুদৃঢ় জাফরি নির্ম্মিত হইয়াছে যে, যদিও তাহাতে ডেড় শত বৎসর পর্য্যন্ত ঝাড় ও বৃষ্টির আঘাৎ লাগিতেছে, তথাপি এক্ষণ পর্য্যন্ত তাহা অব্যাহত রহিয়াছে। ইহা দেখিলে প্রস্তর ব্যতীত আর কিছু অনুমিত হয় না।

কৃষ্ণনগরের যে কুম্ভকার জাতি ইদানীং নানাবিধ মৃণ্ময় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া লণ্ডন ও প্যারিস্ প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ নগরের এগজিবিশনে প্রেরণ করিয়া, প্রতিষ্ঠা ও পুরস্কার লাভ করিতেছে, এবং প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মিত করিয়া প্রশংসাভাজন হইতেছে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই রাজাদিগের দ্বারা উৎসাহ প্রাপ্ত হওয়াতেই, ইহারা এক্ষণে এতাধিক কৃতকর্ম্মা হইয়াছে। পূর্ব্বে এই রাজারা নানা দেবমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া কুম্ভকারগণকে তাহার মৃণ্মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে আদেশ দিতেন। যাহারা সুচারুরূপে তাহা নির্ম্মাণ করিতে সমর্থ

হইত তাহারা যথেষ্ট পারিতোষিক পাইত। ক্রমশঃ ঐ সকল প্রতিমা অনেকে পূজা করিতে আরম্ভ করিলে, কুম্ভকারগণ, প্রতি-বৎসর বহুতর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে লাগিল, এবং ক্রমে ক্রমে এ বিষয়ে নিপুণ হইয়া উঠিল। অন্য অন্য বাটীতে যে সকল প্রতিমা পূজা হইত, গৃহস্বামীরা তৎসমুদায় রাজভবনে লইয়া যাইতেন। যে সকল মূর্ত্তি সুগঠিত হইত, তাহাদের নির্ম্মাতাগণ রাজ-পুরস্কার পাইয়া আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিত। এই রূপে এ প্রদেশস্থ কুম্ভকারগণ ক্রমশঃ মূর্ত্তি নির্ম্মাণে সুপারগ হইয়া উঠিল।

সপ্তম অধ্যায়।

বঙ্গদেশ মধ্যে নবদ্বীপ যেরূপ প্রসিদ্ধ স্থান, এবং যে স্থানের অধিপতি বলিয়া এই রাজবংশের এত অধিক গৌরব, তাহার পূর্ব্ব বৃত্তান্ত যত দূর অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা এ স্থলে বর্ণনা করিলে বোধ হয় পাঠকবর্গের অপ্রীতিকর হইবে না।

ইতিহাস ও কিম্বদন্তী দ্বারা এই মাত্র অবগত হওয়া যায়, যে বৈদ্য-জাতীয় সেনবংশোদ্ভূত বঙ্গদেশাধিপতি রাজা লক্ষণ সেন নবদ্বীপে অবস্থান করিতেন, এবং ১২০৩ খৃঃ শতাব্দীতে, বখ্‌তিয়ার খিলিজি নামক যবন সেনাপতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া, ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বে, বা তাঁহার সময়ে, ঐ স্থানের কিরূপ অবস্থা ছিল, এবং কোন্ কালে ঐ স্থান নবদ্বীপ নামে খ্যাত হয়, তদ্বৃত্তান্ত কোনরূপে জানিতে পারা যায় না। প্রথিত আছে যে, ঐ লক্ষণসেনের পূর্ব্বপুরুষ রাজা বল্লালসেন অধুনাতন নবদ্বীপের উত্তর-পূর্ব্ব সার্দ্ধ ক্রোশ অন্তর একবাটী নির্ম্মাণ

ও এক দীর্ঘিকা খনন করান। ঐ স্থান বল্লাল দীঘী নামে প্রসিদ্ধ। দীঘীর ও বাটীর চিহ্ন অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। বল্লাল দীঘীর উত্তর দিকে বল্লালসেনের ঢিবী নামে যে একটি উন্নত স্থান আছে, তথায় বল্লালের বাটী ছিল এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ঐ স্থান খনন করিয়া অনেকে কোন কোন দ্রব্য পাইয়াছে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্ব্ব-পুরুষেরা ঐ ঢিবি হইতে অনেকগুলি প্রস্তর স্তম্ভ ও নানারূপ প্রস্তর খণ্ড লইয়া আইসেন, রাজবাটীতে এইমত প্রবাদ আছে। যে স্থান এক্ষণে বল্লাল দীঘী বলিয়া খ্যাত, তাহাকেও পূর্ব্বে নবদ্বীপ কহিত।

উক্ত বঙ্গেশ্বরের রাজত্বকালে নবদ্বীপের যে স্থানে নগর ছিল, সে স্থান ভাগীরথী স্রোতে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে, নবদ্বীপের পশ্চিম ও দক্ষিণে ভাগীরথী, ও পূর্ব্বদিকে খড়িয়া নদী ছিল; এই উভয় স্রোতস্বতী নবদ্বীপের দুই ক্রোশ দক্ষিণ গোয়ালপাড়া গ্রামের নিকট মিলিত হয়। তৎকালে ঐ সন্ধি স্থানকে ত্রিমোহণী বলিত। নবদ্বীপের উত্তরে বিল্লপুষ্করিণী ও যে স্থান বল্লালদীঘী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে, সেই স্থান ছিল। পরে, জাহ্নবী, নবদ্বীপের উত্তর পশ্চিমাংশে যে স্থানে দক্ষিণ মুখী হইয়াছিলেন, সেই স্থান হইতে পুর্ব্বাস্যা হইয়া, নবদ্বীপের উত্তরাংশ ভগ্ন করতঃ, বল্লালদীঘীর দক্ষিণে খড়িয়া নদীর সহিত মিলিত হইয়া দক্ষিণবাহিনী হন। ইদানীং নগরের উত্তরে যে স্থানে সুরধুনী প্রবাহিতা আছেন, সে স্থান হইতে ঐ প্রবাহ, তৎকালে, প্রায় দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী ছিল। পরে, ক্রমশঃ নগরের উত্তর ভাগ উদরস্থ করিতে করিতে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হন। যে অংশ নদী-গর্ভস্থ হইতে লাগিল, সেই অংশেই পুরবাসী-দিগের বসতি ছিল। যাহাদের বাস স্থান জলসাৎ হইল, তাহাদের মধ্যে কেহ বা গ্রামান্তরে, কেহ বা গ্রামের দক্ষিণভাগে যে চর ছিল তথায়, বসতি করিল। এইরূপে, যে ভাগে পৌরদিগের নিকেতন

বৈষ্ণবেরা এই সকল ব্যাপার কে বাল্যলীলা কহিয়া থাকেন *। প্রথমে তিনি গঙ্গাধর পণ্ডিতের নিকট ব্যাকরণ অধ্যয়ন করেন। শৈশব কালেই তাঁহার অপ্রমেয় ধীশক্তি দর্শনে সকলেই বিস্ময়াবিষ্ট হইতেন; এবং কেহ কেহ তাঁহাকে ঐশিক শক্তি সম্পন্ন জ্ঞান করিতেন। অল্প বয়সেই তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রের পারদর্শী হইলেন, এবং অনতি দীর্ঘকাল মধ্যেই অধ্যাপনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণে তাঁহার বিশেষ শ্রদ্ধা ও গাঢ় অনুরাগ জন্মিল এবং বৈষ্ণব ধর্ম্ম সর্ব্ব ধর্ম্মের সারভূত বলিয়া প্রতীত হইল। তৎকালে এ প্রদেশস্থ প্রায় যাবতীয় লোক শক্তি উপাসক ছিলেন। তন্মধ্যে অনেকে তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠানোপলক্ষে পানাসক্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ হইতেন। একারণ শক্তির উপাসনার প্রতি চৈতন্যের অতীব অশ্রদ্ধা জন্মিল, এবং ভাগবত প্রণীত ধর্ম্ম বিস্তারে তাঁহার ঐকান্তিক আগ্রহ হইল। প্রথমতঃ কতিপয় ব্যক্তিকে স্বমতাবলম্বী করিয়া, তাঁহাদের সহিত, আপন আত্মীয় ও ভক্ত শ্রীনিবাসের আবাসে, রজনীতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনা ও হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপে এক বর্ষ অতীত

---

* কহেন আমায় পূজ আমি দিব বর। গঙ্গা দুর্গা দাসী মোর মহেশ কিঙ্কর॥ আপনি চন্দন পরি আর ফুল মালা। নৈবেদ্য কাড়িয়া খান সন্দেশ ও কলা॥ প্রভু কহে তোমা সবে দিব আমি বর। তোমাদের ভর্ত্তা হবে পরম সুন্দর॥ পণ্ডিত বিদগ্ধ যুবা ধন-ধান্যবান। শাত পুত্র হবে চিরায়ু মতিমান॥ যদি নৈবেদ্য নাদেও হইবে কৃপণী। বুড়া ভর্ত্তা হইবে আর চারি সতিনী॥

চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা।

হইলে রাজবর্ত্মে সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। জগাই মাধাই প্রভৃতি সাধারণ লোকের মধ্যে যাঁহারা প্রথমে ঐ সকল অনুষ্ঠানের প্রতিকূলাচরণ করিতেন, তাঁহারাই ক্রমশঃ তাঁহার প্রচারিত ধর্ম্মে রত হইতে লাগিলেন। কিয়ৎকালানন্তর অন্য অন্য নানা স্থানে ধর্ম্ম প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার এমন মনোহর রূপ ও সুমধুর স্বভাব ছিল যে, তাঁহাকে দর্শনমাত্রে তাঁহার প্রতি জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি জন্মিত এবং তাঁহার সহিত ক্ষণকাল আলাপ করিলে সকলে সাতিশয় প্রীতি ও সন্তোষ লাভ করিতেন। আর তাঁহার ধর্ম্মোপদেশের এরূপ চমৎকার মোহিনী শক্তি ছিল যে, তদীয় উপদেশ শ্রবণ মাত্রে সাধারণ-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিবৃন্দের হৃদয়গ্রাহিণী হইত। একারণ অনতিকাল মধ্যেই বিবিধ জাতীয় লোক তাঁহার ধর্ম্মে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। প্রথমে শূদ্র বর্ণের মধ্যে এ ধর্ম্ম যে পরিমাণে বিস্তৃত হয়, ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় মধ্যে সে পরিমাণে হয় নাই। কিয়ৎকাল পরে তিনি গয়ায় গমন করিলেন, এবং তথায় ঈশ্বর পুরী নামে জনৈক মন্ত্রদাতার দ্বারা দীক্ষিত হইলেন। প্রথমে তিনি লক্ষ্মী নাম্নী কামিনীকে বিবাহ করেন। কিছু কাল পরে লক্ষ্মী সর্পাঘাতে গতাসু হন। এক্ষণে গয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া বিষ্ণুপ্রিয়া নামে সীমন্তিনীকে সহধর্ম্মিণী করিলেন (১)।

---

(১) তবেত করিলা প্রভু গয়াতে গমন।
ঈশ্বর পুরীর সঙ্গে তথায় মিলন॥
দীক্ষা অনন্তরে কৈল প্রেম পরকাশ।
দেশে আগমন পুনঃ প্রেমের বিলাস॥
চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা।

চৈতন্য, ১৪৩১ শকে, খৃঃ ১৫০৯ অব্দে, ২৫ বৎসর বয়সে, পরিবারের অগোচরে কাটোয়া গ্রামে যাইয়া, কেশব ভারতী নামক এক জন দণ্ডীর নিকট সন্ন্যাস-ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। কাটোয়া হইতে বৃন্দাবন গমনোদ্দেশে রাঢ় দেশে উপনীত হইলেন, এবং প্রেমাবেশে উন্মত্ত হইয়া দিগ্বিদিক্ জ্ঞান শূন্য হইয়া ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই সুযোগে নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত তাঁহাকে পথ ভুলাইয়া শান্তিপুরে আনিলেন এবং শচীদেবীকে আনাইয়া অদ্বৈত গোস্বামীর বাটীতে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন। চৈতন্য কিছু দিন জননীর সহিত তথায় অবস্থান করণানন্তর জগন্নাথ দর্শনার্থ লীলাচলে গমন করিলেন, এবং তথায় কিয়ৎকাল অবস্থিত হইলেন। তদনন্তর দণ্ডকারণ্য, শ্রীরঙ্গপত্তন ইত্যাদি নানা তীর্থ পর্য্যটন, ও তৎপ্রদেশস্থ অনেক বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বিগণকে বৈষ্ণব করেন। পরে নানাদেশ ভ্রমণ করণানন্তর ধর্ম্ম বিস্তারার্থে স্বদেশে পুনরায় আসিলেন। কিছু কাল পরে দাক্ষিণাত্যে গমন করিলেন। উড়িষ্যার উত্তর-পশ্চিম দেশীয় অনেক জাতি বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তথা হইতে বৃন্দাবন গমন কালে তিনি বারাণসীতে উত্তীর্ণ হইলে, কাশীবাসী বৈদান্তিক পৌরাণিক প্রভৃতি বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বী ও শাস্ত্রব্যবসায়িগণ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ করিতে আইসেন। তিনি বৈদান্তিকগণের সহিত বহুতর বিচার করিলেন, কিন্তু স্বধর্ম্মের প্রাধান্য কোন মতে প্রতিপন্ন করিতে পারিলেন না। কাশী হইতে তিনি মথুরায় গমন করিলেন এবং অল্পকাল মধ্যেই পুনরায় কাশীতে আসিলেন। চৈতন্য সন্ন্যাসাশ্রমী হইয়া বেদান্ত পাঠ করেন না, সাকারবাদীদিগের ন্যায় সর্ব্বদা হরিনাম ও হরিসঙ্কীর্ত্তন করিয়া বেড়ান, ইনি

অতি মূর্খ, সন্ন্যাসধর্ম্মের তত্ত্ব কিছুই না বুঝিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন,—ইত্যাদি নানাপ্রকার, মায়াবাদী দণ্ডিগণ তাঁহার নিন্দাবাদ করিতে লাগিলেন। এক দিবস এক বিপ্রালয়ে তাঁহার ভিক্ষার নিমন্ত্রণ হইল। তিনি তথায় উপনীত হইয়া দেখিলেন, অনেক গুলি সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। তিনি তাঁহাদিগকে প্রণাম করণানন্তর দূরে বসিলেন। সন্ন্যাসিসম্প্রদায়ের প্রধান প্রকাশানন্দ সম্মানপূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার আসনে বসাইলেন, এবং জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আপনি সন্ন্যাসী হইয়া সন্ন্যাস ধর্ম্মের বিপরীতাচরণ কেন করেন। তিনি উত্তর করিলেন যে, যদি আপনারা সুস্থির হইয়া শ্রবণ করেন, তবে আমি তাহার কারণ বর্ণন করি। সন্ন্যাসিগণ এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়াতে, তিনি কহিতে লাগিলেন যে, আমার গুরু আমাকে সন্ন্যাসধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া কহিলেন যে, তুমি মূর্খ, তোমার বেদান্তে অধিকার নাই, অতএব কৃষ্ণনাম জপ কর, তাহাতে তোমার মোক্ষ লাভ হইবেক, এই কথা বলিয়া আমাকে এই শ্লোক শিখাইয়া দিলেন যে,—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

এই আজ্ঞানুসারে আমি হরিনাম ও হরি কীর্ত্তন করিয়া থাকি। ইহা কহিয়া তিনি কৃষ্ণনামের মহিমা বিষয়ে এক অপূর্ব্ব মনোহর বক্তৃতা করিলেন। সন্ন্যাসিগণ সাতিশয় পুলকিত মনে ইহা শ্রবণ করিলেন এবং তাঁহার মতাবলম্বী হইলেন।

অনতিকাল মধ্যে তাঁহার খ্যাতি বারাণসী মধ্যে সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইল এবং তাঁহার ভক্তের শ্রেণী সুদীর্ঘ হইতে লাগিল (১)।

অনন্তর তিনি কাশীতে দুই মাসাধিক কাল অবস্থান করণানন্তর প্রয়াগে প্রস্থান করিলেন, এবং তথায় কিয়ৎকাল যাপন করিয়া বৃন্দাবনে উপনীত হইলেন। এই রূপে নানাদেশ ভ্রমণ ও ধর্ম্ম প্রচারণে ষড়্বর্ষ অতীত হয়। অবশিষ্ট অষ্টাদশ বৎসর লীলাচলে কাল যাপন করেন। তিনি পূর্ব্বে কখন কখন ভক্তিভাবে অভিভূত হইয়া উন্মত্ত প্রায় হইতেন। যৎকালে তিনি নবদ্বীপে অধ্যাপনা করিতেন, তখন এক দিবস তাঁহার এক ছাত্র তদীয় নিকটে যাইয়া দেখিলেন যে, তিনি 'গোপী গোপী' শব্দ করিতেছেন। ইহা শুনিয়া ছাত্র কহিল যে, আপনি কৃষ্ণনাম না লইয়া গোপীনাম কেন লইতেছেন। ইহা শ্রবণে চৈতন্য রাগান্ধ হইয়া যষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। আর যখন সন্ন্যাস ধর্ম্ম গ্রহণ করণানন্তর বৃন্দাবন গমনোদ্দেশে ভ্রমণ করেন, তখনও তিনি জ্ঞান-শূন্য হন। বস্তুতঃ যখন তাঁহার হৃদয় প্রেমরসে পরিপূর্ণ হইত, তখনই তিনি প্রায় উন্মাদগ্রস্ত হইতেন (২)।

---

(১) এইরূপে সব সূত্রের ব্যাখ্যান শুনিয়া।
সকল সন্ন্যাসী কহে বিনয় করিয়া॥
বেদময় মূর্ত্তি তুমি সাক্ষাৎ নারায়ণ।
ক্ষম অপরাধ পূর্ব্বে যে কৈল নিন্দন॥
এইরূপে সন্ন্যাসীর ফিরে গেল মন।
কৃষ্ণ কৃষ্ণ নাম সদা করয়ে গ্রহণ॥
চৈতন্যচরিতামৃত আদিলীলা।

(২) এত বলি চলে প্রভু প্রেমোন্মদের চিহ্ন।
দিথিদিক্ জ্ঞান নাই চলে রাত্রি দিন॥

ইদানীং বয়োবৃদ্ধি সহকারে এই উন্মত্ততা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। প্রতিবৎসর বঙ্গদেশ হইতে বহুতর লোক তাঁহার দর্শনার্থ যাইতেন, এবং তিন চারি মাস তাঁহার সন্নিহিত থাকিতেন। চৈতন্য তাঁহাদের সহিত আমোদ প্রমোদে উন্মত্ত হইতেন। এক জ্যোৎস্নাময়ী যামিনীতে জলধি-নীর মধ্যে শুধাংশু কিরণের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে শ্রীকৃষ্ণ যমুনায় জল-কেলী করিতেছেন জ্ঞান করিয়া জল মধ্যে ঝম্প প্রদান করেন। পরদিন তাঁহার দেহ ধীবরের জাল দ্বারা উত্তোলিত হয়। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে এই প্রবাদ আছে যে, যখন সাগরগর্ভ হইতে তাঁহাকে উত্তোলন করে, তখন তিনি জীবিত ছিলেন এবং কিয়ৎকালানন্তর জগন্নাথ দেবের দেহে লীন হন। অষ্টচত্বারিংশত্ বর্ষ বয়সে তিনি মানব লীলা সম্বরণ করেন।

চৈতন্য যাঁহাকে পরমেশ্বর বলিয়া জানিতেন, তাঁহার সহিত এত দূর প্রীতি করিয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহার প্রেমে অভিভূত হইয়া কখন কখন উন্মত্তপ্রায় হইয়াছেন। এবং তাঁহার বাল্যাবস্থাবধি জীবনের শেষাবস্থা পর্য্যন্ত তাঁহার উপাস্য পরমেশ্বরের প্রতি তিনি একাদিক্রমে এতাদৃশ প্রগাঢ় প্রেম প্রকাশ করিয়াছেন যে, বোধ হয়, অবনীমণ্ডলে কোন নায়ক নায়িকাও তাঁহাদের প্রাণাধিক প্রিয়জনের প্রতি তাদৃশ অসদৃশ প্রণয় প্রদর্শন করিতে পারেন নাই। তিনি স্বীয় শ্রদ্ধা ও ভক্তিভাজন জনক জননী, হৃদয়-বাসিনী প্রণয়িনী, প্রাণোপম বন্ধুগণ এবং অতি প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগ করিয়া পরমেশ্বরের পশ্চাদ্ধাবমান হইয়াছিলেন। তিনি

নিত্যানন্দ আচার্য্য রত্ন মুকুন্দ তিন জন।
প্রভু পাছে পাছে তিন করেন গমন॥

চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা।

কোন নূতন ধর্ম্মের প্রচার ও বিস্তার করেন নাই। তাঁহার জন্ম গ্রহণের পূর্ব্বে বৈষ্ণবদিগের যে ধর্ম্ম ছিল, তাঁহারও সেই ধর্ম্ম। বৈষ্ণবেরা যে নন্দের নন্দন শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিতেন, ইনিও সেই শ্রীকৃষ্ণকে পরব্রহ্ম বলিয়াছেন। যে শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের উপাস্য, সেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারও উপাস্য। ভক্তি, জ্ঞান, তপস্যা, যোগ, দান, বৈরাগ্য, অহিংসা, নম্রতা, অকপটতা, চন্দন বিষ্ঠায় তুল্য জ্ঞান, ইত্যাদি উপাসনার প্রধান অঙ্গ; ইহা তাঁহারাও বলিতেন এবং ইনিও বলিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে, তিনি ধর্ম্মশাস্ত্রানুমত ও দেশাচার বিহিত আচার ব্যবহারের অনুবর্ত্তী ছিলেন না, এবং জাতিভেদ মানিতেন না। আর তিনি সকল জাতিকে শিষ্য এবং সকল জাতির সহিত আহার ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সম্প্রদায়ের রচিত গ্রন্থে দৃষ্ট হয় যে, তাঁহার আচার ব্যবহার সকলই ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত ছিল। তিনি কোন শাস্ত্র বিরুদ্ধ কার্য্য করেন নাই। তিনি যথাশাস্ত্র গুরু-সন্নিধানে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং পরে বেদবিহিত সন্ন্যাসধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া তদুপযোগী আচরণ করেন। তিনি স্বয়ং কোন ব্যক্তিকে মন্ত্র প্রদান করেন নাই। শ্রীকৃষ্ণে প্রীতি করিলে এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে পারিলে, কি হিন্দু কি ম্লেচ্ছ সকলেরই মুক্তিলাভ হইবেক, এই মাত্র প্রচার করিয়াছেন। নীচ বা ম্লেচ্ছ জাতি বলিয়া কোন জনকে ঘৃণা করেন নাই। তিনি সকল ভক্তকেই আলিঙ্গন ও স্নেহ করিতেন। কিন্তু শূদ্রান্ন ভক্ষণ বা শূদ্রের সহিত একত্রে আহার কখন করেন নাই। তিনি শূদ্রের বাটীতে থাকিতেন, কিন্তু ব্রাহ্মণভবনে ভোজন করিতেন (১)।

---

(১) কাশীতে লেখক শূদ্র চন্দ্রশেখর।
তার ঘরে রহিলা প্রভু স্বতন্ত্র ঈশ্বর॥

চৈতন্যের ধর্ম্ম প্রচারকগণের মধ্যে অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, রূপ ও সনাতন গোস্বামী এই চারি জন সুপ্রসিদ্ধ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় রচিত ছাপার চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পাঠ করিলে, রূপ ও সনাতনকে হঠাৎ ম্লেচ্ছ বলিয়া প্রতীত হয়। যখন তাঁহাদের চৈতন্যের সহিত প্রথম মিলন হয়, তখন তাহারা চৈতন্যকে, আমরা ম্লেচ্ছ জাতি, ম্লেচ্ছ সঙ্গী এবং ম্লেচ্ছ কর্ম্ম করি ইত্যাদি অনেক কথা বলেন (১)। কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন। ম্লেচ্ছের দাসত্ব করিতেন বলিয়া আপনাদিগকে আক্ষেপ পূর্ব্বক ম্লেচ্ছ বলিয়াছিলেন। দাবির ও সাকর মল্লিক রূপ ও সনাতনের পদসংক্রান্ত উপাধি। তাঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীজীব গোস্বামী কৃত লঘুতোষণী গ্রন্থে এই রূপ বর্ণিত আছে যে, কর্ণাটরাজ অনিরুদ্ধের দুই পুত্র, রূপেশ্বর ও হরিহর। রূপেশ্বর ভ্রষ্ট-রাজ্য হইয়া সস্ত্রীক পৌরস্থ দেশে উপনিবেশ করেন। তাঁহার তনয় পদ্মনাভ গঙ্গাতীরে অবস্থিত হন। পদ্মনাভের চতুর্থ নন্দন মুকুন্দের কুমার নামক পুত্র বঙ্গ দেশে আইসেন। কুমারের পুত্র সনাতন ও রূপ। রূপ সনাতনের চৈতন্যের সহিত সম্মিলনের পূর্ব্বে, তৎকৃত হংসদূত ও পদ্যাবলি ইত্যাদি কতিপয় গ্রন্থ প্রচলিত হইয়াছিল। চৈতন্যের ভক্তগণের মধ্যে হরিদাস নামে এক জন যবন ছিলেন। তিনি যবন হরিদাস

তপন মিশ্রের ঘরে ভিক্ষা সম্পাদন।
সন্ন্যাসীর সঙ্গে নাহি মানে নিমন্ত্রণ॥
চৈতন্যচরিতামৃত আদি লীলা।

(১) ম্লেচ্ছ জাতি ম্লেচ্ছ সঙ্গী করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম।
গো ব্রাহ্মণ দ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম॥

বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রবাদ আছে, যদিও তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি যবন জাতি বলিয়া জগন্নাথ দেবের পুরী প্রবেশ করিতে পান নাই। ইহাতে স্পষ্ট বোধ হইতেছে যে, চৈতন্য সম্প্রদায় মধ্যেও জাতিভেদ বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। সুতরাং রূপ ও সনাতন যবন জাতি হইলে কখনই হিন্দু বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিতেন না। চৈতন্যের জন্মের পূর্ব্বে বঙ্গদেশ বাসীদিগের মধ্যে অত্যল্প লোক বৈষ্ণব-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন, ইদানীং তাঁহাদিগের তৃতীয়াংশ বৈষ্ণব হইয়াছেন। কিন্তু যে উৎকৃষ্ট ফলোদ্দেশে চৈতন্য এই ধর্ম্ম বিস্তার করণে এত যত্ন করিয়াছিলেন, সে ফল উৎপন্ন হয় নাই। বৈষ্ণব সম্প্রদায় মাত্রে তাঁহাকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া বিশ্বাস করেন, অথচ তাঁহার প্রদর্শিত পথের পথিক হইতে পরাঙ্মুখ থাকেন। যে সকল দোষ দর্শনে, চৈতন্যের শাক্ত ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মে, সেই সকল দোষ ইহাদিগের মধ্যে বহুল পরিমাণে রহিয়াছে, এবং এ ধর্ম্ম ব্যভিচার দোষের এক প্রকার আশ্রয় স্থল হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

নবদ্বীপের রাজা বা পণ্ডিতগণ চৈতন্যকে অবতারের মধ্যে কখন গণ্য করেন নাই; একারণ যদিও চৈতন্যের প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম প্রচারক, অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ গোস্বামী, ও তাঁহাদের পরপুরুষগণ, এই রাজাদিগের অধিকারের চতুঃপার্শ্বে ভূরি ভূরি শিষ্য করিয়াছেন, তথাপি যে প্রদেশে তাঁহাদের বাস, সে প্রদেশে প্রথমে বহুতর শিষ্য করিতে পারেন নাই।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে জন্মেন, কি স্থানান্তর হইতে তথায় অধিবসতি করেন, তাহা নিশ্চয় জানা যায় না। তাঁহার পূর্ব্বে মিথিলাপ্রদেশস্থ বাচস্পতিমিশ্র, বিবেককার শূলপাণি,

ধর্ম্মরত্ন-সংগ্রাহক জীমূতবাহন প্রভৃতি স্মৃতি-সংগ্রহকারগণের ব্যবস্থানুসারে বঙ্গদেশে কর্ম্মকাণ্ড ইত্যাদি চলিয়া আসিত। রঘুনন্দন, স্বকৃত ব্যাখ্যা দ্বারা ঐ মতের দোষ দর্শাইয়া, পুরাতন স্মৃতি সমূহকে শুদ্ধিতত্ত্ব, উদ্বাহতত্ত্ব, তিথিতত্ত্ব, মলমাসতত্ত্ব, সংস্কারতত্ত্ব, দায়তত্ত্ব, একাদশীতত্ত্ব প্রভৃতি অষ্টাবিংশতি তত্ত্বে বিভক্ত করেন। ইদানীং বঙ্গদেশের প্রায় সমস্ত প্রদেশ মধ্যে পূজা বিবাহ প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ড তাঁহার মতানুসারে হইতেছে।

তিনি প্রাচীন মতের দোষ প্রদর্শন করিয়া যে অভিনব মত প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তদ্দ্বারা কি ধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছেন তাহা বুদ্ধিগম্য হয় না। প্রাচীন মতে, বিধবাগণ অত্যন্ত অসুস্থাবস্থা, অতি শৈশবাবস্থা, অথবা অতি বৃদ্ধাবস্থা ইত্যাদি স্থলে একাদশী দিবসে উপবাসের পরিবর্ত্তে যে অনুকল্প করিতে পারিতেন, রঘুনন্দন উক্ত মত খণ্ডন পূর্ব্বক সেই অনুকল্প শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন। সংসারের ইষ্ট সাধন ও অনিষ্ট নিবারণ জন্যই ব্যবস্থার প্রয়োজন হয় এবং এই উভয় সঙ্কল্প যে ব্যবস্থা দ্বারা সম্পন্ন হয় তাহাই যথার্থ শাস্ত্রানুমত ও ন্যায়ানুগত। যে ব্যবস্থা দ্বারা মাতৃহত্যা, ভগ্নীহত্যা, কন্যাহত্যা ইত্যাদি ভয়ানক বিগর্হিত কর্ম্ম করিতে হয়, তাহা কোন মতেই যথার্থ শাস্ত্রানুমোদিত হইতে পারে না। পীড়িতাবস্থায় যে ঔষধ সেবনে এক দণ্ড বিলম্ব হইলে বিগতজীবন হইতে হয়, সেই ঔষধ অষ্ট প্রহর সেবনে নিষেধ। কি আশ্চর্য্য! বোধ হয় যত দিন দেশের অবস্থার উন্নতি হইতে থাকে, তত দিন যদ্দ্বারা লোকের মঙ্গল হয়, এইরূপ সরল ও হিতজনক বিধি ব্যবস্থাপকগণের লেখনী হইতে নিঃসৃত হয়, এবং যখন দেশের অধোগতি হইতে আরম্ভ হয়, তখন

অনিষ্টকর ও কুটিল ব্যবস্থার প্রতি তাঁহাদের মন ধাবিত হইতে থাকে। যাহা হউক, যদিও সৌভাগ্যক্রমে ঐ মত বঙ্গ দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত হয় নাই, তথাপি তাঁহার জন্মভূমির সন্নিহিত প্রদেশ সমূহ, তাঁহার ঐ নিতান্ত নিষ্ঠুর ও বিগর্হিত ব্যবস্থানুসারে, অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতেছে এবং যার পর নাই মনস্তাপ পাইতেছে।

রঘুনাথ শিরোমণি নৈয়ায়িক ছিলেন। ইতিপূর্ব্বে মিথিলাতে ন্যায়শাস্ত্রের যেরূপ চর্চ্চা ছিল, বঙ্গদেশ মধ্যে সেরূপ ছিল না; এ কারণ রঘুনাথের উপাধ্যায় বাসুদেব সার্ব্বভৌম তথায় গমন পূর্ব্বক ন্যায়শাস্ত্রের পাঠ সমাপ্ত করিয়া আইসেন। রঘুনাথের সময়ে মিথিলাতে পক্ষধর মিশ্র নামে এক মহা-মহোপাধ্যায় নৈয়ায়িক ছিলেন। তাঁহার এই নিয়ম ছিল যে, কোন বিচারার্থী আইলে প্রথমতঃ তদীয় কয়েক জন ছাত্রের সহিত ক্রমান্বয়ে বিচার করিতে হইবেক। যদি ছাত্রগণ সকলেই পরাস্ত হন, তখন তাঁহার সহিত বিচার হইবেক। ছাত্রেরা এরূপ পণ্ডিত ও সুতার্কিক ছিলেন, যে তাঁহাদের সকলকে পরাজয় করা এ পর্য্যন্ত কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই। রঘুনাথ, সার্ব্বভৌমের নিকট পাঠ সমাপ্ত করণানন্তর মিথিলায় গমন পূর্ব্বক, প্রথমে শিষ্যগণকে ও তদনন্তর উপাধ্যায়কে বিচারে পরাভূত করিয়া পক্ষধরের গর্ব্ব খর্ব্ব করিলেন। তৎপরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করিয়া অধ্যাপনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার খ্যাতি অনতি দীর্ঘ কাল মধ্যে সর্ব্বত্র বিস্তারিত হইল, এবং নানা দেশের পাঠার্থীগণের আগমনে তাঁহার চতুষ্পাঠী পূর্ণ হইয়া গেল। তিনি চিন্তামণি নামক ন্যায়শাস্ত্রের মূল গ্রন্থের খণ্ড চতু-ষ্টয়ের দীধিতি নামে টীকা, ও বৌদ্ধাধিকারের গঙ্গেশোপাধ্যায়-

কৃত মূল গ্রন্থের টীকা, এবং অনেক বাদার্থ রচনা করেন। তাঁহাকে কাণাভট্ট শিরোমণিও বলিয়া থাকে। তাঁহার সময় হই-তেই নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্রের অধিক আলোচনা ও গ্রন্থ রচনা হইতে থাকে। তাঁহার পরে, রামভদ্র সিদ্ধান্ত, রাজসাহির অন্তঃপাতি নিশিন্দা গ্রাম বাসী উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ি কৃত কুসুমাঞ্জলি গ্রন্থের রামভদ্রীয় নামে টীকা; ও ভবানন্দ সিদ্ধান্তবাগীশ, রঘুনাথ শিরোমণি কৃত দীধিতি গ্রন্থের টীকা ও বহু বাদার্থ গ্রন্থ; তদনন্তর মথুরানাথ তর্কবাগীশ, চারি খণ্ড চিন্তামণি গ্রন্থের টীকা, এবং শিরোমণি কৃত দীধিতি গ্রন্থের টীকা ও বহু বাদার্থ গ্রন্থ; তৎ-পরে জগদীশ তর্কালঙ্কার, সমস্ত দীধিতি গ্রন্থের টীকা, এবং শব্দশক্তি-প্রকাশিকা নামে প্রসিদ্ধ বাদার্থ ইত্যাদি নানা গ্রন্থ; তদনন্তর গদাধর ভট্টাচার্য্য, শক্তিবাদ, মুক্তিবাদ এবং ব্যুৎপত্তিবাদ ও রঘুনাথ কৃত বৌদ্ধাধিকারের বিবরণ গ্রন্থের টীকা ইত্যাদি রচনা করেন।

রঘুনন্দন ও রঘুনাথ শিরোমণির সময়ে বা তাহার কিঞ্চিৎ পরে, নবদ্বীপে কৃষ্ণানন্দ নামক এক জন অসাধারণ তন্ত্রশাস্ত্র বিশারদ প্রাদুর্ভূত হন। তিনিই তন্ত্রসার গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়া আপনাকে সুবিখ্যাত করিয়া গিয়াছেন।

ক্রমশঃ নবদ্বীপে যেমন বিবিধ গ্রন্থ রচিত ও চতুষ্পাঠীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে আরম্ভ হইল, তেমনি নানা অঞ্চল হইতে বিদ্যার্থীগণের সমাগম স্রোত দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। কেহ কেহ পাঠ সমাপনান্তে এই খানেই অধ্যাপনা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। নবদ্বীপের রাজারা, অধ্যাপকগণের জীবিকা নির্ব্বাহার্থে, যথেষ্ট নিষ্কর ভূমি দান, ও ছাত্রদিগকে ছাত্রবৃত্তি প্রদান ইত্যাদি বিবিধ প্রকারে বিদ্যোন্নতির প্রতি বিশেষ উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

এই সকল কারণ প্রযুক্ত নবদ্বীপ বিদ্যোপার্জ্জনের এক অদ্বিতীয় স্থান হইয়া উঠিল। বৈষ্ণবদিগের মধ্যে চৈতন্য গৌরাঙ্গ অবতার বলিয়া বিশ্বাস হওয়াতে নবদ্বীপের মাহাত্ম্য আরও বৃদ্ধি হইল। বৎসর বৎসর নানা স্থান হইতে লোক সমূহ নানা যোগে চৈতন্যের অবতরণ স্থান দর্শন ও তদানুসঙ্গিক গঙ্গাবগাহন করিতে আসিতে লাগিল। এই রূপে নবদ্বীপ তীর্থাবলী মধ্যেও পরিগণিত হইয়া উঠিল।

যবনাধিকার কালে নবদ্বীপ নদীয়া পরগণা বলিয়া খ্যাত হইয়াছিল। নবদ্বীপ হইতে নদীয়া নামের উৎপত্তি হয় তাহার কোন সন্দেহ নাই। এই রাজাদিগের পূর্ব্বপুরুষ ভবানন্দ মজুন্দার এই পরগণা প্রাপ্ত হন। কাশীনাথ রায় নামে এক ব্যক্তি ইহার পূর্ব্ব জমিদার ছিলেন। ইহার রাজস্ব তৎকালে ৩৯৪৯।৶ নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই পরগণার অন্তর্গত অনেক গ্রাম ইদানীং অন্য অন্য পরগণা ভুক্ত হইয়াছে। ক্ষিতীশ-বংশাবলি-চরিতে বর্ণিত আছে যে, প্রথমে ভবানন্দের বৃদ্ধ প্রপৌত্র রাজা রাম-কৃষ্ণ, নবদ্বীপাধিপতি উপাধি ধারণ করেন। অনুমান হয় যে, এই রাজাদিগের অধিকার মধ্যে নবদ্বীপ সর্ব্বপ্রধান ও সুপ্রসিদ্ধ স্থান হেতুক, তিনি ও তাঁহার পর পুরুষেরা ইহার অধিপতি বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় দিয়াছেন, এবং ক্রমশঃ ঐ নামে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হইয়াছেন।

অষ্টম অধ্যায়।

১০৭৭ খৃঃ অব্দে (শক ৯৯৯) বঙ্গদেশের রাজা আদিশূর কোন যাগের অনুষ্ঠান করেন। সেই যজ্ঞ সম্পাদনে এ দেশস্থ ব্রাহ্মণ-

গণকে অসমর্থ দেখিয়া, কান্যকুব্জরাজের নিকট প্রার্থনা করিয়া, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, শ্রীহর্ষ, ছান্দড়, এবং বেদগর্ভ নামে শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী পঞ্চ ব্রাহ্মণকে আনয়ন করেন। তাঁহারা স্ব স্ব সহধর্ম্মিণীকে সমভিব্যাহারে লইয়া আইসেন, এবং যাগ সমাপনান্তে, রাজার নির্ব্বন্ধানুসারে এদেশে সপরিবারে উপনিবেশ করেন (১)। তাঁহাদের মধ্যে ভট্টনারায়ণ সর্ব্বপ্রধান। তিনি কান্যকুব্জান্তর্ভূত কোন প্রদেশের ক্ষিতীশ নামক রাজার পুত্র। একারণ বঙ্গাধিপতি তাঁহাকে কতিপয় গ্রাম দান করিবার প্রস্তাব করিলেন। ভট্টনারায়ণের সঙ্গে অপর্য্যাপ্ত অর্থ ছিল। তিনি, দান গ্রহণে অসম্মত হইয়া, মূল্য প্রদান পূর্ব্বক প্রস্তাবিত কয়েক খানি গ্রাম গ্রহণ করিলেন। তিনি, ইতিপূর্ব্বে, অপর লোকের নিকট আরও কতকগুলি নিষ্কর গ্রাম ক্রয় করিয়াছিলেন। এইরূপে তাঁহার একটি ক্ষুদ্র রাজ্য সংস্থাপিত হয়। (২)

---

(১) ইতি শ্রুত্বা তেন ব্রাহ্মণেন সার্দ্ধং দূতান্ প্রেষ্য বহুমানপুরঃসরং ভট্টনারায়ণ-দক্ষ-শ্রীহর্ষ-ছান্দড়-বেদগর্ভ-সংজ্ঞকান্ পত্নীভিঃ সহিতান সাগ্নিকান্ যজ্ঞোপকরণ-সামগ্রী-সংভৃত্যানানীয় নবনবত্যধিক-নবশতী-শকাব্দে প্রাগুপকল্পিত-বাসে নিবেসয়ামাস।

ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতম্।

(২) অথ কান্যকুব্জে বিদিত-প্রভাব-ক্ষিতীশনামনরেন্দ্র-পুত্রস্য ভট্টস্য লোকাতীত-কর্ম্মভির্ভৃশং পরিতুষ্ট রাজাহ। প্রভো ময়া কিয়ন্তো গ্রামা দীয়ন্তে কৃপয়া তান্ গ্রহীতুমর্হসি। ভট্ট প্রাহ ভূপ্রতিগ্রহ-গোহিরণ্যতিললৌহাদি-সহিতা গ্রামা ময়া ন গ্রহীতব্যা। রাজাহ অনুগ্রহেণ কিঙ্করেণ ময়া তদা কিং কর্ত্তব্যং, মম পারলৌকিক সদ্‌গতির্বা কথং ভবিষ্যতি। ইতি শ্রুত্বা ভট্টঃ পুনরাহ। মম ধনানি বহূনি বিদ্যন্তে তৈর্ময়া কতিচিদ্‌গ্রামাঃ ক্রীয়ন্তে, ভবতা বিক্রীয়তাং, ভবতো যদি মমোপকারে বাঞ্ছাস্তি তত্রৈব সমুচিতোপকারঃ

পূর্ব্বে হিন্দু ও যবন রাজাদিগের সময়ে, বঙ্গরাজ্যে গৌড় ও বিক্রমপুর দুই রাজধানী ছিল। রাজারা কখন গৌড়ে কখন বিক্রমপুরে অবস্থান করিতেন। রাজা আদিশূর যখন এই যাগের অনুষ্ঠান করেন, তখন তিনি কোন্ রাজধানীতে ছিলেন, তাহা কোন ইতিহাসে ব্যক্ত নাই। কিন্তু ভট্টনারায়ণের পরপুরুষেরা যে স্থানে অবস্থিতি ও আধিপত্য করিতেন, তাহা বিক্রমপুরের সন্নিহিত; একারণ অনুমান হয় যে, উল্লিখিত যজ্ঞানুষ্ঠান কালে, আদিশূর বিক্রমপুরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যাহা হউক, ভট্টনারায়ণ, নিপু, হলায়ুধ, হরিহর, কন্দর্প, বিশ্বম্ভর, নরহরি, নারায়ণ, প্রিয়ঙ্কর, ধর্ম্মাঙ্গদ, তারাপতি, কামদেব এই দ্বাদশ পুরুষ, ক্রমান্বয়ে ১৩৯৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, সর্ব্বশুদ্ধ ৩২২ বৎসর এই রাজ্য ভোগ করেন।

কামদেবের চারি পুত্র। পিতার লোকান্তর গমনের পর, তাঁহারা, পৈতৃক রাজ্যের অংশ পাইবার নিমিত্ত, পরস্পর বিবাদ করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের কলহানল ক্রমশঃ প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। অবশেষে, তাঁহারা এই বিবাদ ভঞ্জনার্থ দিল্লির সম্রাটের নিকট আবেদন করিলেন। দিল্লীশ্বর লোভ-পরবশতা প্রযুক্ত বিরোধি-রাজ্যের রাজস্বাভিলাষী হইলেন। ভ্রাতৃগণের মধ্যে তিনজন রাজাজ্ঞা পালনে নানা প্রকার আপত্তি করিতে লাগিলেন, কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিশ্বনাথ রাজস্ব প্রদানে

ক্রিয়তাং। শ্রুত্বা রাজাহ তথৈবাস্তু। ততঃ স্বল্পেন মূল্যেন বহবঃ গ্রামা বিক্রীতাঃ তেষু চ প্রতিবর্ষলব্ধব্যকরা গ্রামান্তরলব্ধব্যকরেষু বর্দ্ধিতাঃ। ভট্টেন চ ক্রীতা গ্রামাঃ চতুর্বিংশতিবর্ষান্ নিষ্করং ভুজ্যন্তেস্ম।

ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতম্।

সম্মত হইলেন। সম্রাট্, তাঁহার উপর সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে উক্ত সমগ্র রাজ্যের অধিকারী করিলেন। কিয়ৎ-কাল পরে, বিশ্বনাথ, সম্রাটের অনুগ্রহে কাঁকুদি প্রভৃতি আরও অনেক গুলি পরগণা প্রাপ্ত হইলেন। তিনি, রামচন্দ্র, সুবুদ্ধি, কংসারি, ত্রিলোচন, ষষ্ঠিদাস, কাশীনাথ, এই সপ্ত-পুরুষ, একাদি ক্রমে, ১৫৯৭ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, সর্ব্বসাকুল্যে ১৯৮ বৎসর, এই জমীদারী ভোগ করেন।

কাশীনাথের অধিকার কালে, ত্রিপুরাধিপতির প্রেরিত কতক গুলি হস্তী তাঁহার জমীদারীর মধ্য দিয়া, দিল্লি-অভিমুখে যাইতেছিল; হঠাৎ তন্মধ্যে একটি হস্তী, মত্ত হইয়া এক গ্রাম প্রবেশ পূর্ব্বক, প্রজাপুঞ্জের যৎপরোনাস্তি ক্ষতি করিতে লাগিল। কাশীনাথ এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, এই করীকে হত্যা করিতে আদেশ দিলেন। তদানীন্তন বঙ্গদেশের নবাবের সহিত তাঁহার অতিশয় অস্বরস ছিল। নবাব অনেক দিবসাবধি বৈরনির্যাতনের ছল অন্বেষণ করিতে ছিলেন, কিন্তু এপর্য্যন্ত কোন ছল পাইয়া উঠেন নাই। এক্ষণে পূর্ব্বোক্ত ব্যাপার শত্রু নিপাতের একটি, বিলক্ষণ সুযোগ ঘটিয়াছে ভাবিয়া নানাবিধ কল্পিত দোষারোপ পূর্ব্বক সম্রাট্ আকবরের নিকট এই বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইলেন। সম্রাট্ নবাবের কল্পিত বাক্যে প্রতারিত হইয়া, রোষ-পরবশ হইলেন, এবং কাশীনাথকে বন্দীভূত করিয়া দিল্লি প্রেরণের আদেশ দিলেন। কাশীনাথ, সংবাদ পাইবা মাত্র, অতিশয় ব্যস্ত সমস্ত হইয়া, স্বীয় সহধর্ম্মিণী ও কতিপয় অনুচর সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিকে পলায়ন করিলেন। নবাবসৈন্যও তাঁহার অনুসরণে ধাবমান হইল। কতিপয় দিবসের পর, তিনি জলঙ্গী নদীর অদূরবর্ত্তী বাগওয়ান পরগণার

অন্তর্গত আন্দুলিয়া গ্রামে উপনীত হইলেন। ঐ গ্রামে মৎস্য বিক্রয় হইতেছে দেখিয়া, ধীবরস্ত্রীর হস্তে স্বীয় অঙ্গুরীয় প্রদান পূর্ব্বক, "আমার ভৃত্যেরা পশ্চাৎ আসিতেছে, তাহাদিগকে এই অঙ্গুরীয় দিলে মৎস্যের স্বীকৃত মূল্য পাইবে" এইকথা বলিয়া মৎস্য লইয়া নদী অভিমুখে গমন করিলেন, এবং তথায় অবগাহন পূর্ব্বক ঈশ্বরার্চ্চনা করিতে বসিলেন। এদিকে নবাবসৈন্যও ঐ গ্রামে আসিয়া লোক মুখে অঙ্গুরীয় সংক্রান্ত কথা শুনিতে পাইল, এবং মৎস্য-ক্রেতাকে দেখাইয়া দিবার জন্য ধীবর-পত্নীকে তাড়না করিতে লাগিল। সে নদী-তীরে গিয়া তাঁহাকে দেখাইয়া দিল। নবাব-সেনাপতি কাশী-নাথকে বন্দীভূত করিয়া দিল্লি অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। কাশীনাথের মৃত্যুর দ্বিবিধ প্রবাদ আছে। ক্ষিতীশ বংশাবলি-চরিতে লিখিত আছে তিনি ধৃত হইয়া নবাব সেনানীর হস্তে নিহত হন, কিন্তু রাজবাটীতে প্রথিত আছে দিল্লির কারাগারে তাঁহার মৃত্যু হয়।

নবম অধ্যায়।

কাশীনাথের অনাথিনী পত্নী,—একজন ব্রাহ্মণ, একজন দাস, ও একটি দাসী এবং দুই সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা সহিত, আন্দুলিয়া নিবাসী বাগওয়ান পরগণার জমীদার হরেকৃষ্ণ সমাদ্দারের আলয়ে আশ্রয় লইলেন, এবং তথায় সম্মান ও সমাদর পূর্ব্বক

গৃহীতা হইলেন। (১) হরেকৃষ্ণ নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি ঐ কামিনীকে অতি সুশীলা দেখিয়া দুহিতৃ-নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতে লাগিলেন। উক্ত রমণী গর্ভবতী ছিলেন, যথাকালে পুত্রবতী হইলেন। হরেকৃষ্ণ, নবকুমারের অপরূপ রূপলাবণ্য দর্শনে পরম প্রীত হইয়া, অন্ন-প্রাশনের সময়, তাঁহার নাম রামচন্দ্র রাখিলেন; এবং যথাকালে তাঁহার উপনয়ন ও বিবাহ দিলেন। পরিশেষে, তাঁহাকে স্বীয় সম্পত্তি সমূহের উত্তরাধিকারী করিলেন, এবং স্ববংশের সমাদ্দার উপাধি ধারণ করাইলেন। এই কারণেই কাশী-নাথ রায়ের পুত্র রাম সমাদ্দার নামে খ্যাত। (২)

রামচন্দ্র সমাদ্দারের চারি পুত্র। ভবানন্দ, জগদীশ, হরিবল্লভ ও সুবুদ্ধি। ভবানন্দ অতি তরুণ বয়সেই সংস্কৃত বিদ্যার পারদর্শী হইলেন এবং অসাধারণ ধীশক্তি প্রকাশ করিতে লাগিলেন। যখন তাঁহার বয়ঃক্রম ১৩ কি ১৪ বৎসর, তখন এক দিবস জলঙ্গী নদীর তীরে ইতস্ততঃ বিচরণ ও দৃষ্টি সঞ্চারণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে, কতকগুলি নৌকা শ্রেণীবদ্ধ হইয়া তথায় আসিতে লাগিল। অন্য অন্য যাঁহারা তথায় ছিলেন, তাঁহারা তরণীতে সৈনিক পুরুষের লক্ষণাক্রান্ত লোক দেখিয়া সভয়ে প্রস্থান করিলেন;

---

(১) কাশীনাথ-পত্নী চ সসত্ত্বা স্বর্ণশতদ্বয়-সহিতা একেন ভৃত্যেনৈকয়া দাস্যা পরিচারকৈকব্রাহ্মণেন চ সহিতা হরিকৃষ্ণ-সমুদ্দারস্য বাট্যাং পিতৃ-মন্দিরেইব তস্থৌ।

ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতম্।

(২) সমুদ্দার-বাটী-জাতত্বাৎ প্রাপ্ত-সমুদ্দার-রাজত্বাচ্চ ত্বমপি সর্ব্বে রাম-সমুদ্দার-নামা প্রথয়ন্তি।

ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতম্।

কিন্তু তিনি নিঃশঙ্ক চিত্তে পোতাবলির সন্নিহিত হইলেন। বস্তুতঃ ঐ নৌকারোহিগণ রাজসংক্রান্ত লোকই ছিলেন। দিল্লির সম্রাট প্রেরিত একজন যবনজাতীয় প্রদেশ-শাসনকর্ত্তা হুগলি অঞ্চলে যাইতেছিলেন।

পূর্ব্বকালে, হুগলির উত্তরে সরস্বতী নদী তীরস্থ সপ্তগ্রাম নামে এক নগর বঙ্গরাজ্যের প্রধান বাণিজ্য-স্থান ছিল। ঐ নগরের অনতিদূরে গঙ্গা, যমুনা, ও সরস্বতী এই নদীত্রয়ের সন্ধিস্থান ছিল। পুরাণে বর্ণিত আছে যে, এই তিনটি নদী প্রয়াগে মিলিত হইয়া, এই স্থান পর্য্যন্ত আইসে, এবং এখানে পরস্পর স্বতন্ত্র হইয়া ভিন্ন ভিন্ন স্থানাভিমুখে গমন করে। যে স্থানে তাহাদের মিলন হয় তাহার নাম যুক্তবেণী, ও যে স্থানে বিচ্ছেদ হয় তাহার নাম মুক্তবেণী। এই উভয় স্থানই ত্রিবেণী নামে খ্যাত এবং তীর্থ মধ্যে পরিগণিত। মুক্তবেণী হইতে গঙ্গা দক্ষিণ মুখী হইয়া কলিকাতা ও খিদিরপুরের মধ্য দিয়া, পূর্ব্ব-দক্ষিণ গমন পূর্ব্বক সুন্দরবন প্রবেশ করে। যমুনা গুস্তের নিকট পূর্ব্ববাহিনী হইয়া, টাকির সন্নিহিত ইচ্ছামতী নদীর সহিত সম্মিলিতা হয়। সরস্বতী, প্রথমে পশ্চিম-দক্ষিণ ও তৎপরে পূর্ব্ব-দক্ষিণ বাহিনী হইয়া, সাঁখ্রালের ও রাজগঞ্জের নিকট গিয়া, পরিশেষে দক্ষিণাস্যা হয়, ও তদনন্তর অন্য নদীর সহিত মিলিতা হইয়া উলুবাড়িয়া অভিমুখে যায়। এই সকল নদী দ্বারা ভারতভূমি-জাত নানা-বিধ পণ্য দ্রব্য নৌকা যোগে সপ্তগ্রামে উপস্থিত হইত, এবং যে সকল বণিক্‌পোত সাগর বাহিয়া আইসে সে সকল সরস্বতী দিয়া তথায় আসিত। যদিও অতি প্রাচীন কালাবধি এই নগর বঙ্গ রাজ্যের এক প্রধান স্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল, তথাপি হিন্দু রাজত্ব সময়ে, এই নগরে রাজ কার্য্য কতদূর হইত তাহার

কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। কিন্তু যবন অধিকার কালে, এই নগরে একজন প্রধান রাজপুরুষ থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, ইহা ইতিহাস পাঠে স্পষ্ট বোধ হয়। সম্রাট্ সাহা জাহান, যখন হুগলি হইতে পর্টুগিজদিগকে দূরীভূত করিয়া, তথায় ঐ নগরের সমস্ত রাজকার্য্যের কাগজপত্র আনিতে আদেশ দেন, এবং ফৌজদার উপাধি (১) দিয়া একজন রাজপুরুষ নিযুক্ত করেন, তখন, নিশ্চয় অনুমিত হয় যে, পূর্ব্বে সপ্তগ্রামে একজন প্রধান রাজপুরুষ থাকিতেন, এবং এ প্রদেশের অনেক রাজকার্য্যের ভার তাঁহার উপর অর্পিত থাকিত। যাবনিক ভাষাতে ঐ নগরকে সাতগাঁও কহিত। বাঙ্গালার দক্ষিণাঞ্চল সাতগাঁও, সলিমাবাদ, ও সোলতানপুর প্রভৃতি যে কয়েক বিভাগে বিভক্ত ছিল, তাহার মধ্যে সাতগাঁও অতি প্রধান। এই রাজবাটীতে দিল্লির সম্রাট দত্ত যে সকল ফরমাণ আছে, তাহাতে এই রাজাদিগের অধিকারস্থ পরগণার অধিকাংশ সরকার সাতগাঁওর অন্তর্গত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

অনন্তর, পূর্ব্বোল্লিখিত শাসনকর্ত্তা ভবানন্দকে নির্ভয়চিত্ত দর্শনে, কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া, তাঁহাকে আহ্বান করিলেন এবং তাঁহার পরিচয় জিজ্ঞাসিলেন। ভবানন্দ, স্বীয় বংশ-বৃত্তান্ত যাহা অবগত ছিলেন তাহা কহিলেন। তদনন্তর এই রাজপুরুষ, কোন্ কোন্ নদী দিয়া ও কত দিনে হুগলি উত্তীর্ণ হইতে পারেন, তদ্বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলেন। ভবানন্দ যে যে নদী বাহিয়া ও যে যে প্রধান গ্রামের নিকট দিয়া যাইতে হইবেক, তাহার

---

(১) ফৌজদার দুষ্টের শাসন ও অপরাধের বিচার করিতেন, এবং কখন কখন ভূম্যধিকারিগণের স্থানে রাজস্ব সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন।

যথাযথ বর্ণন করিলেন। ইহা শ্রবণে রাজপুরুষ জিজ্ঞাসিলেন "তুমি কখন এই পথে গিয়াছিলে?" তিনি বলিলেন "না মহাশয়, আমি যাই নাই। যে সকল নাবিকেরা হুগলি অঞ্চলে গমনাগমন করে, তাহাদের মুখে এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়াছি।" রাজপুরুষ, ঈদৃশ অল্পবয়স্ক বালকের মুখে এতাদৃশ কথাবার্ত্তা শ্রবণে অতিশয় চমৎকৃত ও প্রীত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন "আমার ইচ্ছা, তোমাকে সঙ্গে লইয়া যাইয়া বিদ্যাভ্যাস করাই।" ভবানন্দ, "যদি আমার আত্মীয়দিগের অনভিমত না হয়, তবে আমি নিশ্চয় আপনার সঙ্গে যাইব" এই বলিয়া, বাটী প্রত্যাগত হইলেন। অনন্তর, তিনি সুহৃদ্বর্গের পরামর্শানুসারে এই শাসনকর্ত্তার সঙ্গে সপ্তগ্রাম গমন করিলেন এবং অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে পারস্য বিদ্যায় ও রাজকার্য্যে পারদর্শী হইলেন। রাজপুরুষ, তাঁহার উপর যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া, তদীয় উন্নতির নিমিত্ত, তাঁহাকে এক অনুরোধ পত্র দিয়া নবাবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

ইতি পূর্ব্বে বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তৃগণ গৌড় অথবা রাজমহলে অবস্থান করিতেন। পরে, সম্রাট জাঁহাগিরের রাজত্ব কালে যখন পর্টুগীজ জল-দস্যুগণ সমুদ্রতীরস্থ প্রদেশ সকল বারংবার লুণ্ঠিত ও উৎপাড়িত করে, সেই সময়ে, তাহাদের আশু দমনের জন্য, ১৬০৮ খৃঃ অব্দে, নবাব এস্মাইল খাঁ ঢাকা নগর স্থাপন পূর্ব্বক আপনার আবাসস্থল করেন, এবং সম্রাটের নামে তাহার নাম জাঁহাগির নগর রাখেন। ভবানন্দ ঐ নগরে গমনপূর্ব্বক নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া স্বীয় বংশের ও বিদ্যার পরিচয় দিলেন। নবাব তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে কানুনগুই

পদে (১) নিযুক্ত করিলেন, এবং সম্রাটের নিকট হইতে তাঁহার সনন্দ ও মজুন্দার (২) উপাধি আনাইয়া দিলেন। সেই অবধি তিনি ভবানন্দ মজুন্দার নামে খ্যাত হইলেন।

কতিপয় বর্ষ পরে, তিনি তাঁহার পিতা রাম সমাদ্দারের জমীদারী আপনার ও ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিভাগ করিলেন। হরিবল্লভকে ফতেপুর, জগদীশকে কুড়ুলগাছি, সুবুদ্ধিকে পাটকাবাড়ি দিলেন, এবং অবশিষ্ট জমীদারী আপনি লইলেন। তদনন্তর, তিনি বল্লভপুরে, এবং অনুজেরা স্ব স্ব গ্রামে বসতি করিলেন। (৩)

এই সময়ে, যশোহরের রাজা প্রতাপাদিত্য দিল্লীশ্বরের অবাধ্য হইয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করেন, এবং পার্শ্ববর্ত্তী ভূম্যধিকারিগণের জমীদারী অধিকৃত করিয়া লন। বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা তাঁহাকে কোন মতে পরাভূত করিতে পারেন নাই। প্রতাপাদিত্য, স্বীয় পিতৃব্য বসন্ত রায়ের প্রাণসংহার করিয়া, তদীয় পুত্রকেও হত্যা করিতে চেষ্টিত হইয়াছিলেন; কিন্তু রাজ্ঞী নানা কৌশলে ঐ যুবকের জীবন রক্ষা করেন। একবার কচুবনে লুক্কায়িত হইয়া আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাওয়াতে, তিনি কচু

---

(১) এই পদের কার্য্য দ্বিতীয় অধ্যায়ে লিখিত হইয়াছে।

(২) জেলার রাজস্ব সংগ্রাহকের হিসাবের পরীক্ষক।

(৩) কিয়ৎকালানন্তরং নিজালয়মাগত্য ভ্রাতৃভির্বিভক্তো বল্লভপুর-নামনগরে পুরীং নির্ম্মায় সমুদ্বার-প্রাপ্ত-পৈতৃক-রাজ্যং বিংশতিবর্ষান্ শশাস। হরিবল্লভরায়শ্চ ফতেপুরনামগ্রামে জগদীশঃ কুড়ালগাছি-গ্রামে সুবুদ্ধিরায়ঃ পাটিকাবাড়িগ্রামে পুরীং নির্ম্মায় সুখমবাৎস্যুঃ।

ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতম্।

রায় নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। অবশেষে কচুরায় পলায়ন করিয়া সম্রাটের শরণাগত হইলেন। তৎকালে সম্রাট জাঁহাগির দিল্লির রাজ সিংহাসনে আসীন হইয়াছিলেন। তিনি প্রতাপাদিত্যের নৃশংস ব্যবহারে অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া তাঁহার দমনার্থে রাজা মানসিংহকে পাঠাইলেন (১)।

মানসিংহ বহু সৈন্য সমেত বর্দ্ধমানে উপনীত হইলেন। তৎকালে বীরসিংহের পুত্র ধীরসিংহ বর্দ্ধমানের রাজা ছিলেন। ভবানন্দ কানুনগুই পদোপলক্ষে মানসিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। মানসিংহ বঙ্গদেশের বিবিধ-বিষয়ক সংবাদ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ভবানন্দ তৎসমূহের যথাবথ উত্তর দিলেন। মানসিংহ, তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও বহুদর্শিতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে সন্নিকটে রাখিলেন এবং যথেষ্ট অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। তিনি এক দিন সুন্দরের সুবিখ্যাত সুড়ঙ্গের বৃত্তান্ত মজুন্দারকে জিজ্ঞাসা করিলেন। মজুন্দার বীরসিংহ-দুহিতা বিদ্যার বিবাহের পণ, কাঞ্চিপুরাধিপতির পুত্র সুন্দরের বর্দ্ধমানে আগমন, ও তৎপরে সুড়ঙ্গ খনন করিয়া বিদ্যা বিদ্যমানে গমন, ও তদনন্তর রাজকুমারীকে বিচারে পরাস্ত করিয়া তাঁহার সহিত গান্ধর্ব্ববিবাহ সম্পাদন ইত্যাদি প্রবাদ সকল সবিস্তর বর্ণন করিলেন (২)।

মানসিংহ বর্দ্ধমান হইতে প্রস্থান করণানন্তর, অগ্রদ্বীপে আগমন করিয়া চৈতন্যশিষ্য ঘোষ ঠাকুরের প্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত গোপীনাথ বিগ্রহ দর্শন করিলেন। তথা হইতে নবদ্বীপে আগমন

---

(১) পার্শ সাহেবের ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিতের উপক্রমণিকা। পৃঃ১২

(২) এই উপলক্ষ করিয়া কবিবর ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করেন।

পূর্ব্বক অধ্যাপকগণের সহিত আলাপ করিয়া সাতিশয় প্রীতি লাভ করিলেন। নবদ্বীপ হইতে যাত্রা করিয়া বল্লভপুরে ভবানন্দের ভবনে উত্তীর্ণ হইলেন, এবং তৎসন্নিহিত এক স্থানে শিবির সন্নিবেসিত করিলেন। তথায় অকস্মাৎ অশ্রুতপূর্ব্ব ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এই দুর্যোগ সপ্ত দিন স্থায়ী হয়। ভবানন্দের আলয়ে গোবিন্দদেব নামে এক দেব-মুর্ত্তি স্থাপিত ছিল। ঐ সময়ে এই ঠাকুরের ঠাকুরাণী প্রতিষ্ঠা করিবার দিন স্থির হয়। প্রতিষ্ঠা কার্য্য অতি সমৃদ্ধিপূর্ব্বক নির্ব্বাহ করণোদ্দেশে, ভবানন্দ বিস্তর খাদ্য দ্রব্য আহরণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তিনি ঐ সকল দ্রব্য সৈন্যবর্গকে বিতরণ করিতে লাগিলেন, এবং তাহাদের কষ্ট নিবারণার্থে অসাধারণ যত্ন ও শ্রম করিলেন। ভবানন্দের বংশ-বৃত্তান্ত শ্রবণে এবং তাঁহার দক্ষতা ও ভদ্রতা দর্শনে, মানসিংহের হৃদয়ে তাঁহার উন্নতি সাধনের যে ইচ্ছার অঙ্কুর হইয়াছিল, তাহা এই আনুকুল্য দ্বারা বর্দ্ধিত হইল। দুর্যোগাবসান হইলে, তিনি মজুন্দারকে কহিলেন "যদি প্রতাপাদিত্যের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইতে পারি, তবে তোমার এ অসদৃশ উপকারের বিশেষ প্রত্যুপকার করিব।"

অনন্তর, মানসিংহ ভবানন্দকে সঙ্গে লইয়া যশোহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন, এবং তথায় উপনীত হইয়া প্রতাপাদিত্যকে সংগ্রামে পরাভূত ও পিঞ্জরবদ্ধ করিয়া দিল্লিতে প্রেরণ করিলেন। যশোহর হইতে প্রত্যাগমন কালে, তিনি ভবানন্দকে, তাঁহার প্রার্থনানুসারে মহৎপুর, নদীয়া, মারূপদহ, লেপা, সুলতানপুর, কাশিমপুর, বয়শা, মশুণ্ডা প্রভৃতি ১৪ পরগণার জমীদারী প্রদান করিলেন, এবং বঙ্গদেশ হইতে দিল্লী গমন সময়ে, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া গেলেন। তথায় উপনীত হইয়া, ভবানন্দের বংশের

ইতিহাস, তাঁহার পিতামহের প্রতি সম্রাট আকবরের অবিচার, বাগওয়ানে দুর্যোগ সময়ে তাঁহার অসাধারণ আনুকূল্য, এবং যশোহরের যুদ্ধ-কালে তাঁহার সুমন্ত্রণা ইত্যাদি সম্রাট সমীপে বিশেষরূপে বর্ণন করণানন্তর, তাঁহাকে মহৎপুর প্রভৃতি ১৪ পরগণার ফরমাণ অর্থাৎ রাজ-সনন্দ প্রদানের বিষয় কহিলেন। সম্রাট, ভবানন্দের বংশবৃত্তান্ত ও সদ্‌গুণের বিবরণ শ্রবণ করিয়া, তাঁহার প্রতি সাতিশয় প্রসন্ন হইলেন, এবং মানসিংহ প্রদত্ত চতুর্দ্দশ পরগণার ফরমাণ দিতে অনুজ্ঞা দিলেন (১)। আর তাঁহাকে স্বসন্নিধানে আনাইয়া, তাঁহার সহিত হিন্দুধর্ম্ম প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ে কথোপকথন করিলেন। কিছু দিন পরে, ভবানন্দ, সম্রাটের নিকট বিদায় লইয়া, ফরমাণ, ও নওবৎ, ডঙ্কা, ঘড়ি ও নিশান ইত্যাদি সম্মানসূচক দ্রব্য সহিত, স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। (২)

ভবানন্দ বাটী আসিয়া কিছু দিন পরে, তাঁহার অধিকারের মধ্যস্থলে মাটিয়ারি গ্রামে এক রাজবাটী প্রস্তুত করিলেন, এবং তথায় অবস্থিত হইয়া রাজকার্য্য করিতে লাগিলেন। সপ্ত বর্ষ পরে, সম্রাটের অনুগ্রহে উখ্‌ড়া, ভালুকা, এস্‌মাইলপুর, এস্‌-লামপুর প্রভৃতি আর কয়েক পরগণা প্রাপ্ত হইলেন। (৩) তাঁহার

---

(১) এই ফরমাণের তারিখ হিজরী ১০১৫ খৃঃ ১৬০৬ অব্দ।

(২) ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিতে বর্ণিত আছে যে, ভবানন্দ জমীদারীর সহিত রাজা উপাধি প্রাপ্ত হন। যথা,—অনন্তরং যবনাধিপো মানসিংহেন মন্ত্রয়িত্বা মজুম্‌দারায় অভিলষিতং রাজ্যং দাতুমঙ্গীচকার তৎ-প্রেষিত-পত্রার্থং রাজেতি প্রসিদ্ধখ্যাতিং চ সাক্ষরেণানুমোদয়ামাস।

(৩) এই ফরমাণের তারিখ হিজরী ১০২২ খৃঃ ১৬১৩ অব্দ।

তিন পুত্র; শ্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গোবিন্দ। এই তিন পুত্রের মধ্যে গোপাল বিচক্ষণ ও কর্ম্মদক্ষ ছিলেন; একারণ ভবানন্দ, অন্য তনয়দ্বয়কে তাঁহাদের ভরণপোষণোপযোগী বিষয় নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া, গোপালকে স্বীয় উত্তরাধিকারী করিলেন, এবং কিয়ৎকালানন্তর পরলোকগামী হইলেন। তিনি যেরূপ বিচক্ষণতা, উদ্যোগিতা, কর্ম্মদক্ষতা ইত্যাদি বিবিধ গুণালঙ্কৃত ছিলেন তাহার বর্ণন করা বাহুল্য; কারণ তাঁহার বাল্যাবধি শেষ বয়স পর্য্যন্ত তদীয় সমুদয় কার্য্যে এই সকল গুণ প্রতিভাত হইয়াছে। যদিও তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষ ভট্টনারায়ণ এ প্রদেশে প্রথমাধিপত্য স্থাপন করেন, কিন্তু সে আধিপত্য কাশীনাথের জীবনের সঙ্গে অস্তমিত হইয়াছিল, সুতরাং ভবানন্দকেই নবদ্বীপের এ রাজবংশের প্রথম সূত্রসংস্থাপয়িতা বলিতে হয়।

দশম অধ্যায়।

গোপাল সম্রাটের নিকট হইতে শান্তিপুর, সাহাপুর, ভালুকা, রাজপুর প্রভৃতি কয়েক পরগণার জমীদারী পান। তিনি নরেন্দ্র, রামেশ্বর, ও রাঘব এই তিন পুত্র রাখিয়া লোকান্তর গমন করেন। নরেন্দ্র অতি উদ্ধত-স্বভাব ও প্রজাপুঞ্জের নিতান্ত অপ্রিয় ছিলেন। রামেশ্বরের বিষয় বুদ্ধির বিলক্ষণ অভাব ছিল। রাঘব প্রজারঞ্জক, কর্ম্মদক্ষ এবং ধার্ম্মিক ছিলেন, এজন্য, তিনিই পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন, এবং তাঁহার ভ্রাতৃগণকে মাসিক বৃত্তি নিরূপিত করিয়া দিলেন। তিনি পৈতৃক জমীদারীর অতিরিক্ত রায়পুর, বেদারপুর, আলনিয়া, খাড়িজুড়ি, মুলগড় প্রভৃতি কতিপয় পরগণা সম্রাট সাজাঁহার

নিকট প্রাপ্ত হন, এবং আরও কয়েক পরগণা কোন কোন জমীদারের স্থানে ক্রয় করেন। তিনি মাটিয়ারি পরিত্যাগ করিয়া রেউই (কৃষ্ণনগর) গ্রামে রাজধানী করিয়াছিলেন। তৎকালে কৃষ্ণনগর অতি ক্ষুদ্র গ্রাম ছিল। এখানে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, ও কায়স্থের বসতি প্রায় ছিল না। বিস্তর গোপের বাস ছিল। কেবল গঙ্গার নিকটস্থ বলিয়া এ স্থানে বাসস্থান করেন। ইদানীং যে সকল ভদ্র লোকের বসতি দৃষ্ট হয়, তাঁহারা প্রায় সকলেই রাজকুটুম্ব, রাজকর্ম্মচারী এবং রাজার আনীত।

রাঘব গ্রামের চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন করান। ঐ পরিখা সহর পানার গড় নামে খ্যাত, এবং অদ্যাপি নগরের স্থানে স্থানে বর্ত্তমান আছে। শান্তিপুর ও কৃষ্ণনগরের মধ্যস্থলে দীগনগর নামে যে গ্রাম আছে, তাঁহার সময়ে, ঐ গ্রামের নিকট কোন ভাল জলাশয় না থাকায়, গ্রীষ্মকালে অনেক গুলি গ্রামের লোকের ও পশ্বাদির নিরতিশয় জলকষ্ট হইত, এ কারণ তিনি ঐ গ্রামে একটি সুদীর্ঘ দীর্ঘিকা খনন করাইলেন, এবং গ্রামের নাম দীঘীনগর রাখিলেন। ইহার জলকর দীর্ঘে ১৪৫২ হস্ত ও প্রস্থে ৪২০ হস্ত। সাধারণের হিতকর এই কার্য্য নিষ্পাদন করিতে বিংশতি সহস্র মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল। প্রথমাবধি প্রতি বৎসর বর্ষাকালে নিকটস্থ প্রান্তর হইতে জল-স্রোতের সহিত বিস্তর মৃত্তিকা ইহার মধ্যে আসিয়া পতিত হইতেছে, কিন্তু অদ্যাপি ইহাতে সম্বৎসর অবধি জল থাকে। এরূপ সুপ্রশস্ত দীর্ঘিকা নদীয় জেলার কোন স্থানে আর দৃষ্ট হয় না। এই জলাশয়ের পূর্ব্ব তটে এক বৃহৎ ঘাট, ও এক অট্টালিকা নির্ম্মিত, এবং তাহার অনতিদূরে, রাঘবেশ্বর নামে এক শিব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। অট্টালিকা ও ঘাট

ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, কেবল দুইটি মন্দির মাত্র অবশিষ্ট আছে। তিনি মর্দনা গ্রামে (শ্রীনগর) সুদীর্ঘ পরিখা বেষ্টিত আর একটি পুরী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তথায় মধ্যে মধ্যে যাইয়া অবস্থান করিতেন। তৎকালে ঐ স্থানের সন্নিহিত গোপাল নগর প্রভৃতি গ্রামে অনেক ধনবান্ বণিকের বসতি ছিল, এবং বিপুল বাণিজ্য ব্যবসায় হইত। রাঘব স্বীয় সদ্গুণে সম্রাটের অনুগ্রহ পাত্র হইয়াছিলেন এবং তাঁহার নিকট হইতে হস্তী প্রভৃতি নানাবিধ সম্মানসূচক উপহার পাইয়াছিলেন (১)। ইনি অতিশয় দয়াশীল ছিলেন, ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপকদিগকে অনেক ভূমি দান করেন।

রাঘবের দুই পুত্র, রুদ্র ও প্রতাপনারায়ণ। রুদ্র বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্ এবং ধার্ম্মিক। প্রতাপনারায়ণ প্রজা-পীড়ক ও পিতার অবাধ্য। এ কারণ রাঘব, সম্রাটের অনুমতি লইয়া, জমীদারীর দশাংশ রুদ্রকে ও ছয় অংশ প্রতাপকে দিয়া যান। কিন্তু রুদ্র, জনকের লোকান্তর গমনের পর, ভ্রাতাকে সম্মত করিয়া বাগওয়ান প্রভৃতি কতিপয় পরগণা তাঁহার হস্তে রাখেন ও আর আর যাবতীয় জমীদারী আপনি অধিকার করেন। ১০৮৭ হিজরিতে (১৬৭৬ খৃঃ অব্দ) সম্রাট্ আলমগীরের নিকট হইতে ইহার ফরমাণ লইয়াছিলেন। দিল্লীশ্বর তাঁহাকে সাতিশয় অনুগ্রহ করিতেন। তিনি রুদ্রকে গয়াশপুর, হোসেনপুর, বাগ্মারি প্রভৃতি কয়েক সুবিস্তৃত পরগণা প্রদান করেন, এবং তাঁহার অট্টালিকার উপর কাঙ্গরা নির্ম্মাণ করিবার অনুমতি দেন। মোসলমানদের রাজত্ব সময়ে, রাজার

(১) ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতে বর্ণিত আছে যে তৎপূর্ব্বে গৌড় ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী কোন প্রদেশের রাজারা দিল্লীশ্বরের নিকট হস্তী উপহার পান নাই।

বিশেষ অনুগ্রহের পাত্র ব্যতীত, কেহই ঐরূপ ভূষণ দ্বারা আপনার ভদ্রাসন সুশোভিত করিতে পারিতেন না। ঐ সৌধ-ভূষণ যেমন শোভাকর, তদপেক্ষা অধিক সম্মানসূচক ছিল। কোন অট্টালিকার উপরিভাগে কাঙ্গরা দৃষ্ট হইলেই, সেই অট্টালিকা কোন বিশেষ রাজ-সম্মানিত ব্যক্তির আলয় বলিয়া দর্শকের প্রতীতি জন্মিত। অদ্যাপি এই কাঙ্গরা কৃষ্ণনগরের চকের ও নওবৎখানার শিরোভাগে স্থানে স্থানে বিদ্যমান আছে। বোধ হয় কাঙ্গরার আদর্শ দেখিয়াই এ প্রদেশে প্রতিমার চালের কল্‌কার সৃষ্টি হইয়াছে (১)।

তৎকালে রেউই নগরে অনেক গোপের বসতি ছিল, এবং তাহারা মহা সমারোহপূর্ব্বক কৃষ্ণের পূজা করিত, এ কারণ রুদ্র রেউইর নাম কৃষ্ণনগর রাখিলেন (২)। জাঁহাগীর নগর (ঢাকা) হইতে আলালবখ্‌স নামে এক সুপ্রসিদ্ধ ও সুনিপুণ স্থপতিকে আনাইয়া চক ও নওবৎখানা প্রভৃতি নানাবিধ সুরম্য হর্ম্ম্য নির্ম্মিত করিলেন। জাঁহাগীর নগর ব্যতীত এরূপ সুন্দর চক ও নওবৎখানা বঙ্গদেশের আর কোন স্থানে নাই। যদিও এক্ষণে এই দুই অট্টালিকা অতিশয় জীর্ণ ও ভগ্নাবস্থায় আছে, এবং সহসা দর্শনে কিছুই নয়নপ্রীতিকর বলিয়া বোধ হয় না, তথাপি কিঞ্চিৎ অভিনিবেশপূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিলে, ইহার শিল্প-চাতুর্য্য বিলক্ষণ রূপে প্রতীয়মান হয়। রুদ্র রাজবাটীর তিন দিকে প্রশস্ত পরিখা

---

(১) ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতে উল্লিখিত আছে যে সম্রাট্‌ রুদ্রকে মহারাজা উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন।

(২) রেউই ইতি প্রসিদ্ধগ্রামে গোগোপানাং বহূনামাধিষ্ঠানামতঃ প্রসঙ্গতঃ কৃষ্ণনামস্মরণাদ্যর্থংচ তদ্‌গ্রামস্য কৃষ্ণনগরেতিসংজ্ঞাং চকার।

ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতম্‌।

ও পশ্চিম দিকে এক প্রকাণ্ড দীর্ঘিকা খনন করান। এক্ষণে যে স্থানে ঐ দীঘী অবস্থিত আছে,—পূর্ব্বে ঐ স্থানে অঞ্জনা নদী প্রবাহিত ছিল। এই স্রোতস্বতী জলঙ্গী নদীর একটি শাখা। ইহা কৃষ্ণনগরের পশ্চিম দিয়া দক্ষিণাভিমুখে গমন পূর্ব্বক, যাত্রাপুর গ্রামের অনতিদূরে দ্বিধারা হয়। এক ধারা, জয়পুর, জালাল-খালি, ধর্ম্মদা, বাদকুল্লা প্রভৃতি গ্রামের নিকট দিয়া আড়ংঘাটা সন্নিহিত মামজোয়ান গ্রামের নিকট যাইয়া দক্ষিণ বাহিনী হয়; অপর ধারা, যাত্রাপুর ও বেৎনা প্রভৃতি কতিপয় গ্রামের নিকট দিয়া, হাঁসখালি গ্রামের সমীপস্থ হয়, এবং তদনন্তর, দক্ষিণ মুখে যাইয়া মামজোয়ানের নিকট পূর্ব্ব ধারার সহিত মিলিত হইয়া যায়। রুদ্রের সময়েও অঞ্জনা নদী বদ্ধ প্রায় হইয়াছিল। কেবল বর্ষাকালে প্রবাহিতা হইত। একদা এক যবন সেনাপতি ঐ নদী দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহার সমভিব্যাহারী নৌকা সকল রাজার খিড়কীর ঘাটে উপস্থিত হইলে, দৌবারিকগণ তথায় নৌকা লাগাইতে নিষেধ করিল, যবনেরা তাহাদিগের কথা শুনিল না। ক্রমশঃ উভয় দলের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়া দুই পক্ষেরই কতিপয় লোক হত আহত হইল। একারণ রুদ্র পরবর্ষে নদী বদ্ধ করিয়া দিলেন। এই রূপ বদ্ধ করা তাঁহার নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছিল সন্দেহ নাই; কিন্তু পুরবাসীদিগের যথেষ্ট অসুবিধা ঘটিয়াছিল।

রুদ্র যেমন উল্লিখিত কর্ম্মটি দ্বারা লোকের অনিষ্ট করিয়াছিলেন, তেমনি আর একটি কর্ম্মের দ্বারা সাধারণের যথেষ্ট হিত-সাধন করিয়াছিলেন। তৎকালে কৃষ্ণনগর হইতে শান্তিপুরে গমনাগমনের ভাল বর্ত্ম না থাকায়, এ প্রদেশস্থ জনসাধারণের নিরতিশয় কষ্ট হইত। তিনি বহু ব্যয় পূর্ব্বক প্রথমোক্ত নগর হইতে শেষোক্ত

নগর পর্য্যন্ত এক প্রশস্ত রাজপথ প্রস্তুত করিয়া দেন, এবং তাহার উভয় পার্শ্বে অশ্বত্থ ও বট-বৃক্ষের শ্রেণী রোপণ করেন। ঐ পথ অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে, কিন্তু বৃক্ষশ্রেণী লয়প্রাপ্ত হইয়াছে।(১) মর্দনার সমীপবর্ত্তী জলাশয় সকলে অসঙ্খ্য বিকশিত কমলের অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে, তিনি ঐ নগরের নাম শ্রীনগর রাখেন, এবং তাঁহার পিতা যেমন অবকাশানুসারে তথায় অবস্থান করিতেন, তিনিও তেমনি মধ্যে মধ্যে ঐ নগরে যাইয়া অবস্থিত হইতেন। ঐ স্থান এত রমণীয় ছিল, যে তাঁহার পৌত্র রঘুরাম প্রায় সর্ব্বদাই ঐ বাটীতে কালযাপন করিতেন। এক্ষণে ঐ নিকেতনের নিদর্শনের মধ্যে কেবল গড় মাত্র আছে। নগরটি সংক্রামক জ্বরে উৎসন্ন হইয়া গিয়াছে। এ প্রদেশে এক প্রবাদ আছে যে, রাজা রুদ্র ঐ বাটীতলে কয়েক লক্ষ টাকা প্রোথিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ ধন কোন্ স্থানে নিহিত হয়, ইহা তাঁহার কোষাধ্যক্ষ ব্যতীত আর কেহই জানিত না। রুদ্র তাঁহাকে প্রতিশ্রুত করিয়া লন যে, কোন বিশেষ বিপদ্‌পাত ব্যতীত তদীয় উত্তরাধিকারিগণকে ঐ ধন দেখাইয়া দিবেন না। রুদ্র লোকান্তর গমন করিলে পর, তদীয় পুত্র ঐ ধন দেখাইয়া দিবার জন্য উক্ত ধনাধ্যক্ষকে আদেশ করেন। ধনরক্ষক, পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া, তাঁহার আজ্ঞা পালনে অসম্মত হন। ইহাতে নির্ব্বোধ রাজপুত্র রাগান্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে বলেন। কোষাধ্যক্ষ ঐ প্রহারে প্রাণত্যাগ করেন। রুদ্রের পর পুরুষগণের সকলেরই ঐ ধনের বিষয়ে অটল বিশ্বাস ছিল; সুতরাং

---

(১) রুদ্রের পিতা রাঘব এই পথ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করেন বলিয়া ইহা রাঘব রায়ের জাঙ্গাল নামে প্রসিদ্ধ আছে।

প্রায় সকলেই উহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই পূর্ণমনোরথ হইতে পারেন নাই। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্রের বর্ত্তমান পুত্রের মুখে শুনিয়াছি যে, তাঁহার পিতা ও অগ্রজ ক্রমান্বয়ে ঐ ধন লাভের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সাত কি আট বৎসর হইল, এক জন কৃষক ঐ স্থান কর্ষণ করাতে একটি কাঁচের জালার কিয়দংশ অনেকের নয়নগোচর হয়। ইহাতে এই জনরব হইয়া উঠে যে, ঐ জালার মধ্যে টাকা ছিল, এবং ঐ কৃষক তাহা পাইয়াছে। মহারাজা সতীশচন্দ্রের নিকট এ বিষয় উত্থাপিত হয়, কিন্তু তাঁহার বিশ্বাস না হওয়াতে ইহার কোন অনুসন্ধান হয় নাই।

রুদ্রের দুই রাণী। জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞীর গর্ভে রামচন্দ্র ও রামজীবন, এবং কনিষ্ঠা মহিষীর গর্ভে রামকৃষ্ণ জন্মেন। রামচন্দ্র অসাধারণ বলবান ও মৃগয়াশীল ছিলেন।(১) তিনি সতত মৃগয়ায় কালক্ষেপণ করিতেন; বিদ্যানুশীলন বা বিষয় কর্ম্মে তাঁহার কিছুমাত্র অনুরাগ ছিল না। রামজীবন সর্ব্বদা শাস্ত্রানুশীলন ও রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। একারণ প্রথমোক্ত কুমার পিতার অপ্রিয়, ও শেষোক্ত কুমার তদীয় প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। রুদ্র, রামচন্দ্রকে স্বীয় উত্তরাধিকারী না করিবার যথা-

---

(১) তাঁহার বিক্রমের বহুতর প্রবাদ আছে। তাহার মধ্যে একটি এই, একদা দ্বাবিংশতি নাবিক কর্ত্তৃক বাহিত এক নৌকা তাঁহার সন্নিহিত হইলে তিনি এরূপ প্রতিঘাত করেন যে, তরণী নক্ষত্র বেগে পরপারে যাইয়া ভগ্ন হয়। দ্বিতীয় টি এই যে, একবার তিনি মৃগয়া করিতেছেন, এমত সময়ে এক ভীষণাকার মহিষ তাঁহাকে আক্রমণ করে। তিনি অনায়াসে তাহাকে বহু দূরে উৎক্ষেপণ করেন, এবং তদনন্তর এক গদাঘাতে তাহাকে সংহার করিয়া দুই হস্তে তাহার উভয় শৃঙ্গ ধারণ পূর্ব্বক এক টানে উৎপাটন করিয়া লন।

যথ্থ কারণ লিখিয়া রামজীবনকে জমীদারী দিবার জন্য সম্রাটের অনুমতি আনাইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার পরলোক গমনানন্তর, রামচন্দ্র, হুগলির ফৌজদারের ও জাহাঁগীর নগরের নবাবের স্বপক্ষতায়, পৈতৃক জমীদারীর অধিকারী হইলেন। কিছু দিনানন্তর রামজীবন, রামচন্দ্রকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, জমীদারী অধিকার করেন। তাহার এক বর্ষ পরে রাম চন্দ্র পুনরায় ইহা হস্তগত করিয়া লন। কিয়ৎকালানন্তর, তাঁহার লোকান্তর গমন হইলে, রামজীবন পুনর্ব্বার জমীদারীর অধিকারী হন; কিন্তু অধিক কাল ভোগ করিতে পারেন নাই। তদীয় বৈমাত্র ভ্রাতা রামকৃষ্ণ, তাঁহাকে সংগ্রামে পরাভূত করিয়া, জমীদারী অধিকার করেন, এবং নবাবের সহিত কৌশল করিয়া তাঁহাকে জাঁহাগীর নগরে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন।

রাম কৃষ্ণের সময়ে (১৬৯৫ খৃঃ অব্দে) বর্দ্ধমানের অন্তর্ভূত জোতযার জমীদার শোভা সিংহ, উড়িষ্যা দেশস্থ আফগানদিগের সহায়তায়, বর্দ্ধমানের রাজার সহিত সংগ্রাম করিয়া তাঁহার প্রাণ সংহার পূর্ব্বক তদীয় সমস্ত জমীদারী অধিকার করেন। তদনন্তর, ক্রমশঃ বর্দ্ধমানের পার্শ্বস্থ জামীদারগণের জমীদারী বল পূর্ব্বক হস্ত গত করিলেন। বর্দ্ধমানের রাজনন্দন স্ত্রীবেশ ধারণ পূর্ব্বক রামকৃষ্ণের রাজধানীতে উপস্থিত হন। (১) রামকৃষ্ণ তাঁহাকে মাটিয়ারির বাটীতে লুক্কায়িত রাখেন। কিন্তু রাজা

(১) তদানিমেব কৃষ্ণরাম-রায়েন পরবলমায়াতীতি বিজ্ঞাতং সপরিবারস্য পলায়নাবসর-কালো নাস্তি যুদ্ধ-সামগ্রী চ পূর্ব্বং ন কৃতা ক উপায়; সপরিবারস্য নাশ উপস্থিত ইতি চিন্তয়ন্ স্বপুত্রং শ্রীগতরামনামানং স্ত্রীবেশধারিণং কৃত্বা স্ত্রীনামারোহণযোগ্যযানেন পরবলৈরনুপলক্ষিতঃ রামকৃষ্ণরায়স্য সন্নিধৌ কৃষ্ণনগরে প্রেষয়ামাস।

ক্ষিতীশবংশাবলিচরিতম্।

দুহিতা শত্রু-হস্তে পতিতা হইয়াছিলেন। শোভা সিংহ তদীয় রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়া পড়েন। একদা সুরাপানে হতচেতন হইয়া শয্যাশায়ী ছিলেন, সেই সুযোগে রাজবালা ছুরিকাঘাতে তাঁহাকে যমালয়ে পাঠাইলেন। শোভাসিংহের মৃত্যু-সংবাদ পাইয়া তাঁহার অনুজ হেমাৎ সিংহ অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে বর্দ্ধমানে আসিয়া নগর লুণ্ঠন করিলেন, এবং অগ্রজের স্থলাভিষিক্ত হইলেন। তদনন্তর, বর্দ্ধমানের রাজপুত্রকে রামকৃষ্ণ আশ্রয় দিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার জমীদারী লুণ্ঠনার্থে বহু সৈন্য সামন্ত পাঠাইলেন। কিন্তু এখানে কিছুই করিতে পারিলেন না। তিনি যতবার এ প্রদেশে সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন, ততবারই রামকৃষ্ণ তাহাদিগকে পরাজিত করেন। দিল্লীশ্বর আলম্‌গীর, এই সকল সংবাদ পাইয়া, তাঁহার প্রিয়পুত্র আজিমশ্বানকে বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিলেন। রাজপুত্র বর্দ্ধমান প্রদেশে উত্তীর্ণ হইয়া অবিলম্বে হেমাৎ সিংহকে পরাভূত, এবং তৎকর্ত্তৃক জমীদারীচ্যুত জমীদারগণকে তাঁহাদের স্ব স্ব জমীদারীতে পুনঃস্থাপন করিলেন।

এই সকল কার্য্য সম্পাদনার্থ আজিমশ্বান যখন বর্দ্ধমানে অবস্থান করেন, সে সময়ে, বঙ্গদেশস্থ অনেক ভূম্যধিকারী তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তৎকালে এই প্রথা ছিল যে, বাদসাহ বা নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইলে, স্ব স্ব অবস্থানুযায়ী আড়ম্বর না করিয়া অতি দীনাবস্থায় যাওয়া হইত, সুতরাং, অন্য অন্য ভূম্যধিকারিগণ ঐ প্রথানুবর্ত্তী হইয়া যৎসামান্যাবস্থায় গিয়াছিলেন। সম্রাট্‌পুত্রও তাঁহাদিগকে সামান্য রূপে সমাদর করিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণ উক্ত প্রথা অবহেলন করিয়া বহু সমারোহ পূর্ব্বক উপস্থিত হওয়াতে বিশেষ সম্মান পূর্ব্বক গৃহীত হইলেন।

আজিমশ্বান তাঁহার সহিত নানা প্রকার আলাপ করিলেন, এবং তৎপরে তাঁহার প্রতি অতীব অনুগ্রহ করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ উভয়ের মধ্যে বিলক্ষণ প্রণয় জন্মিল। আজিমশ্বান রামকৃষ্ণের অনেক প্রশংসার কথা সম্রাট্‌কে লেখেন, এবং রামকৃষ্ণ যখন যাহা প্রার্থনা করিতেন, তাহাই তিনি আহ্লাদপূর্ব্বক সিদ্ধ করিয়া দিতেন। রামকৃষ্ণের তিন সহস্র অশ্বারোহী ও সপ্ত সহস্র পদাতিক সৈন্য ছিল, এতদ্ব্যতীত, তৎকালে কলিকাতার দক্ষিণে যে ইউরোপীয়গণ বাস করিতেন, তাঁহাদের অধ্যক্ষ বেদা সাহেবের সহিত তাঁহার বিশেষ সখ্য থাকাতে, সাহেব স্বীয় সুশিক্ষিত দ্বি-সহস্র পঞ্চাশৎ সৈন্য তাঁহাকে দিয়াছিলেন। এই কারণে তিনি এ প্রদেশে মহাবল পরাক্রান্ত ভূম্যধিকারী হইয়া উঠেন। একদা জমীদারীর সীমা লইয়া যশোহরের রাজার সহিত বিবাদ হওয়াতে, তিনি, বহু সৈন্য সহিত যশোহরে গমন পূর্ব্বক, রাজাকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়া তাঁহার নগর লুণ্ঠন করেন। তদ্দর্শনে তদীয় সমকালীন জমীদারগণ তাঁহার সহিত সৌহৃদ্য রাখিবার বিশেষ যত্ন করিতেন। তিনি জমীদারীর রাজস্ব যথানিয়মে দিতেন না, তথাপি তিনি আজিমশ্বানের প্রিয়পাত্র বলিয়া, তৎকালীন নবাব মুরশিদকুলি খাঁ তাঁহার প্রতি কোন উৎপাত করিতে সাহসী হইতেন না। একাদশবর্ষ এইরূপে স্বেচ্ছা-মত রাজস্ব দেওয়াতে, অনেক রাজস্ব দেনা হইল। পরিশেষে নবাব কোন বিশ্বাসঘাতী কৌশলে তাঁহাকে ঢাকায় লইয়া যাইয়া কারারুদ্ধ করিলেন। রামকৃষ্ণ অল্প দিনের মধ্যে বসন্ত-রোগাক্রান্ত হইয়া কারাগারেই পঞ্চত্ব পাইলেন।

এই রাজা স্বীয় পূর্ব্বপুরুষ অপেক্ষা এ প্রদেশে বিদ্যার উন্নতি সাধন বিষয়ে অধিকতর যত্নবান্ ও উৎসাহী ছিলেন।

তিনি অধ্যাপকগণকে, তাঁহাদের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহার্থে, ভূরি ভূরি নিষ্কর ভূমি দান করেন, এবং নবদ্বীপে বিদেশীয় পাঠকদিগের ব্যয়ের নিমিত্ত, অনেক টাকার সম্পত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। ঐ টাকা অধ্যাপকগণ প্রত্যেক রাজার সময়ে রাজকোষ হইতে পাইতেন। পরে যখন, এই রাজবংশোদ্ভূত রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সহিত জমীদারী দশসালা বন্দবস্ত হইল, তখন, যে সম্পত্তির আয় হইতে এই রাজারা ঐ টাকা দিতেন, গবর্ণমেণ্ট, তাহা স্বহস্তে লইয়া, অধ্যাপকগণকে সরকারী রাজকোষ হইতে মাসিক দুই শত টাকা দিবার বন্দবস্ত করেন। অদ্যাপি অধ্যাপকেরা নদীয়া জেলার কালেক্টরী হইতে মাসিক এক শত টাকা প্রাপ্ত হইতেছেন। কি কারণে, ও কোন্ সময় হইতে, দুই শত টাকার স্থলে এক শত টাকা অবধারিত হয়, তাহা অবগত হইতে পারা যায় নাই। এখনও ঐ টাকা রাজা রামকৃষ্ণের প্রদত্ত বলিয়া খ্যাত আছে।

ঢাকার কারাগারে রামকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে, আজিমশ্বান তাঁহাকে যেরূপ কৃপা করিতেন, তাহা স্মরণ করিয়া, নবাব আজিমশ্বানকে রামকৃষ্ণের মৃত্যু সংবাদ লিখিয়া, এক্ষণে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত কাহাকে করা যাইবেক, ইহা জানিতে প্রার্থনা করিলেন। রাজপুত্র রামকৃষ্ণের মৃত্যু সংবাদ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ব্যথিতহৃদয় হইলেন, এবং নবাবের পত্রের এই উত্তর দিলেন, "যদি রামকৃষ্ণের পুত্র পৌত্র অথবা দৌহিত্র কেহ থাকে তাহাকেই জমীদারী দিবে।" নবাব প্রত্যুত্তরে লিখিলেন "তাঁহার স্বসম্পার্কীয় এরূপ কোন ব্যক্তি নাই।" এই প্রত্যুত্তর পাইয়া আজিমশ্বান এই আদেশ দিলেন যে "রামকৃষ্ণের পরিবারের প্রতিপালন ও বিষয়াদি রক্ষণাবেক্ষণে সমর্থ এরূপ কোন যোগ্য ও বিশ্বস্ত ব্যক্তি তাঁহার কর্ম্মচারীর মধ্যে থাকিলে তাঁহার হস্তেই এই জমীদারী বিন্যস্ত করিবে।" তদুত্তরে

নবাব লিখিলেন "তাঁহার এরূপ কোন কর্ম্মকারক নাই; তাঁহার ভ্রাতা রামজীবন বহুকালাবধি বন্দীভূত আছেন, তাঁহাকে জমীদারী দিবার অনুমতি হইলে উত্তম হয়।" আজিমশ্বান আদেশ প্রদান করিলেন "আচ্ছা তাহাই করিবে।" এই রূপে রামজীবন কারামুক্ত ও পৈতৃক সম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু কিয়ৎকাল পরেই মানব-লীলা সম্বরণ করেন।

রামজীবনের কবিত্ব ও গীতশক্তি ছিল। তাঁহার দয়ার সীমা ছিলনা। যখন কারাগারে বাস করিতেন, তখনও বিস্তর ভূমি ও অর্থ দান করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন রাণী, প্রথমা রাণীর গর্ভে রাজারাম ও কৃষ্ণরাম; দ্বিতীয়া মহিষীর গর্ভে রঘুরাম; তৃতীয়া রাজ্ঞীর গর্ভে রামগোপাল জন্মেন। রঘুরাম সর্ব্বাপেক্ষা কার্য্যদক্ষ, ধর্ম্মপরায়ণ ও প্রজারঞ্জক ছিলেন, একারণ রামজীবন পরলোক গমন কালে, তাঁহাকেই আপন উত্তরাধিকারী করিয়া যান। কৃষ্ণ-নগর হইতে নবদ্বীপের সন্নিহিত ভাগীরথী পর্য্যন্ত যে বর্ত্ম অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে, তাহা রাজা রামকৃষ্ণের যত্নে প্রস্তুত হয়, কিন্তু এ রাজপথের উভয় পার্শ্বে যে সকল অতি প্রাচীন অশ্বত্থ ও বট বৃক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, সে সমস্তই রাজা রামজীবনের রোপিত এই নিমিত্ত ঐ বৃক্ষশ্রেণী রামজীবনের সার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

রাজা রঘুরাম অত্যন্ত বলবান্, সাহসী এবং অসামান্য ধনুর্দ্ধর ছিলেন। এ প্রদেশ মধ্যে তিনি রঘুবীর বলিয়া খ্যাত। নবাব মুরশিদকুলি খাঁ, ১৭০৪ খৃঃ অব্দে, ভাগীরথী তীরে এক নগর পত্তন করিয়া তাহাতে আপনার রাজধানী করেন, এবং স্বীয় নামানুসারে ঐ নগরের নাম মুরশিদাবাদ রাখেন। তিনি অনাদায়ী রাজস্ব আদায়ের জন্য, সমস্ত জমীদারকে মুরশিদা-বাদে বন্দীভূত করেন। ঐ সঙ্গে রাজা রামজীবনও কারাবদ্ধ

হন। এই সময়ে, রাজসাহির রাজা উদয়চাঁদের সহিত নবাবের এক যুদ্ধ উপস্থিত হয়। রঘুরাম পিতার সমভিব্যাহারে মুরশিদাবাদে ছিলেন। তিনি নবাব-সেনাপতি লাহরিমালের সঙ্গে ঐ যুদ্ধে গমন করেন। উভয় পক্ষের সৈন্য বারাকোটি গ্রামের নিকট উপস্থিত হইলে, লাহরিমাল স্বীয় সেনা নিবেশের বহুদূরে রঘুরামের সহিত কি মন্ত্রণা করিতে ছিলেন। ঐ সময়ে, তাঁহার পাঁচটি মাত্র যোদ্ধা সঙ্গে ছিল। এই অসতর্কতার সুযোগ পাইয়া, উদয় রায়ের সেনাধ্যক্ষ আলি মহম্মদ, অসি চর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক অশ্বারোহণে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রধারী ঊনবিংশতি জন সৈন্য সমভিব্যাহারে, লাহরিমালের দিকে আসিতে লাগিলেন। তদ্দর্শনে লাহরি অতিমাত্র ভীত ও ব্যস্ত সমস্ত হইয়া রঘুরামকে কহিলেন, "আমাদের সৈন্যগণ বহুদূর আছে, শত্রু নিকটে আসিল, এক্ষণে উপায় কি। আমরা যেরূপ দুর্ব্বল, এবং বিপক্ষ পক্ষ যেরূপ প্রবল, তাহাতে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে, নিশ্চয়ই পরাভূত হইতে হইবে।" রঘুরাম উত্তর করিলেন, "প্রথমতঃ রণবিমুখ হওয়া অতি লজ্জাকর। দ্বিতীয়তঃ আমরা পলায়ন করিলে, আমাদের সৈন্যগণ অবশ্যই পলাইবে। তৃতীয়তঃ এইরূপে পরাভূত হইলে, শত্রু হস্তেই হউক, আর নবাবের হস্তেই হউক, আমাদের বিষম দুর্দ্দশা ঘটিবেক। আপনি বিচলিত-চিত্ত হইবেন না, প্রথমে চারি পাঁচ জন আমার হস্তেই নিহত হইবে, এবং তৎপরে, আর কয়েক জনকে অবশ্যই পরাভূত করিতে পারা যাইবেক।"

তাঁহারা এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে, আলিমহম্মদ, নিষ্কোষিত অসি হস্তে কালান্তকের ন্যায়, নবাব-সেনাপতির অভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। লাহরিমাল

কম্পিত কলেবর হইয়া রঘুরামের পশ্চাৎ ভাগে আসিয়া কহিলেন, “শত্রু নিকটস্থ হইল তথাপি তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া রহিয়াছ।” রামজীবন-পুত্র বলিলেন “ও আর একটু অগ্রসর হইলেই আমি যথাবিধান করিতেছি।” তদনন্তর, রঘুরাম আকর্ণ পূরিত শরসন্ধানপূর্ব্বক আলিমহম্মদের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার বাণ শত্রুর বর্ম্ম ও দেহ ভেদ করিয়া বহু দূরে বিক্ষিপ্ত হইল। আলি মহম্মদ অশ্ব হইতে পতিত হইলেন, এবং অতি কাতরস্বরে স্বীয় সংহর্ত্তাকে কহিলেন, “আমি অনেক সংগ্রাম দেখিয়াছি ও অনেক যুদ্ধ করিয়াছি, কিন্তু তোমার তুল্য ধনুর্দ্ধর কখন দর্শন করি নাই। দেখ, তোমার বলবিক্রম দর্শনে আমার সমস্ত সঙ্গী পলায়ন করিয়াছে। আমার অত্যন্ত পিপাসা হইয়াছে, আমাকে কিঞ্চিৎ জল দেও।” দয়ার্দ্র-চিত্ত রঘুরাম তাঁহাকে বারি প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, “আমার ইচ্ছা তোমাকে আমাদের শিবিরে লইয়া গিয়া চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা করি। যদি তোমার আর কোন ইচ্ছা থাকে বল, আমি যত্ন পূর্ব্বক তাহা সম্পাদন করিব”। পরাজিত পুরুষ উত্তর করিলেন “ আর ও কথা কেন বল। তোমার বজ্রসম শরাঘাতে আমার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে। এমন বীরপুরুষের হস্তে মৃত্যু উপস্থিত হওয়ায় অকালমরণ নিমিত্ত আমার কিছুমাত্র দুঃখ হইতেছে না। আমার সপক্ষগণ আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, অতএব, যতক্ষণ জীবিত আছি, তুমি আমার নিকটে থাক, আমার এই প্রার্থনা”। এই কথা শুনিয়া, সদয়স্বভাব রঘুরামের নেত্র যুগল হইতে অজস্র অশ্রু ধারা বিগলিত হইতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পরেই, আহত সেনানী বিগত জীবন হইলেন। তদনন্তর, লাহরিমাল জয়পতাকা উড্ডীন করিয়া মুরশিদাবাদে উপনীত হইলেন। নবাব রঘুরামের বীরত্বের বিবরণ শ্রবণ করিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন,

এবং তাঁহার গুণের পুরস্কার স্বরূপ, তদীয় পিতার কারামোচনের আদেশ প্রদান করিলেন (১)।

রঘুরাম প্রায়ই শ্রীনগরের বাটীতে থাকিতেন। তাঁহার পুর্ব্বপুরুষের সময়ে যে বিপুল রাজস্ব দেনা ছিল, তাহা পরিশোধ করিতে না পারাতে, তিনি বারংবার মুরশিদাবাদে কারাগারস্থ হন। প্রথিত আছে যে, তাঁহার এমনই দানশীলতা ছিল যে, যখন তিনি বন্দিশালায় অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতে ছিলেন, তখনও পাত্র বিশেষে যথেষ্ট ভূমি দান করেন। ১৭২৮ খৃঃঅব্দে (১৬৫০ শক) তিনি পরলোক যাত্রা করেন। রামসমাদ্দারের জন্ম হইতে রঘুরামের মৃত্যু পর্য্যন্ত ১৩১ বৎসর গত হয় (২)।

(১) রঘুরামের অসাধারণ বলের অনেক প্রবাদ আছে। একদা মুরশিদাবাদে নবাব বাটীতে দুই প্রসিদ্ধ মল্ল আইসে। তাহাদের প্রতিযোগী তৎপ্রদেশে নাথাকাতে নবাব রঘুরামকে দুই তিন জন মল্ল পাঠাইতে লিখিলেন। রঘুরাম উক্ত মল্লদ্বয়ের বিক্রম শুনিয়া তথায় স্বয়ং উপস্থিত হইলেন। নিরূপিত দিবসে নবাব তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন যে, তোমার মল্লেরা কোথায়? তিনি উত্তর করিলেন তাহারা নিকটে আছে এই কথা বলিয়া তিনি গাত্র হইতে জামা ও মস্তক হইতে উষ্ণীষ উন্মোচন করিয়া রণভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং যেমন মল্লদ্বয় দণ্ডায়মান ছিল, অমনি উভয়ের গলদেশ আপনার বাহুযুগলে বদ্ধ করিলেন। ক্ষণেক কাল পরে নবাব কহিলেন, "যুদ্ধ কর"। তিনি উত্তর করিলেন যে, "যাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব, তাহারা পঞ্চত্ব পাইয়াছে।"

(২) ততঃ স্বয়মপি কৃতযাগাদিক্রিয়ঃ ত্রয়োদশবর্ষ-শাসিতরাজ্যঃ পঞ্চাশদধিক-ষোড়শশতীশকে ভাগীরথীতীরে মুক্তপ্রাণঃ পরম গতিমবাপ।

ততস্তস্মিন বর্ষে মুরশিদাবাদাধিকৃত-যবনানুমত্যা তৎসুতং

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রনামানং বহুগুণনিধানমমাত্যা রাজ্যেঽভিষিষিচুঃ।

ক্ষিতীশ বংশাবলি চরিতম্।

একাদশ অধ্যায়।

যখন রাজা রঘুরাম লোকান্তরগত হন, তখন তদীয় তনয় সুপ্রসিদ্ধ রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের বয়ঃক্রম অষ্টাদশ বর্ষ। রাজা রামজীবন বর্ত্তমানে ১৭১০ খৃঃ অব্দে (১৬৩২শক) তাঁহার জন্ম হয়। রাজবাটীতে এরূপ প্রবাদ আছে যে রঘুরাম, আপন উত্তরাধিকারী ইঁহাকে না করিয়া, নিজ বৈমাত্র ভ্রাতা রামগোপালকে করিবার জন্য, নবাবের সম্মতি লইয়াছিলেন। তিনি কি কারণে পুত্রকে বঞ্চিত করিয়া ভ্রাতাকে সমস্ত সম্পত্তি প্রদানের বাসনা করেন, তাহার নিগূঢ় বৃত্তান্ত কেহই অবগত নহেন। ফলতঃ, তিনি পরলোক গত হইলে, রামগোপাল নবাবের সন্নিধানে রাজ্য অধিকার প্রার্থনা করিলেন। এ দিকে, কৃষ্ণচন্দ্র পিতৃব্যের অভীষ্ট ব্যর্থ করিবার জন্য, নবাবের প্রধান প্রধান অমাত্য ও কর্ম্মাধ্যক্ষ, এবং জগৎশেঠ প্রভৃতি অতীব প্রতিপন্ন ব্যক্তিগণের উপাসনা করিতে লাগিলেন। রামগোপালের বুদ্ধি বিদ্যা বা বিজ্ঞতা প্রায় কিছুই ছিল না, বিশেষতঃ তিনি নিতান্ত ধূমপান-পরতন্ত্র ছিলেন এবং নিরন্তর কেবল ধূমপানেই কাল ক্ষেপন করিতেন। সুচতুর কৃষ্ণচন্দ্র পিতৃব্যের এই ধূমপানাসক্তিকেই স্বীয় মনোরথ পূর্ণ করিবার প্রধান অবলম্বন স্থির করিলেন। যে সময় রামগোপাল নবাবের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইবেন, সেই সময়ে কৃষ্ণচন্দ্রের নিয়োগানুসারে মুরশিদাবাদের চকের রাজপথের উভয় পার্শ্বে কয়েক ব্যক্তি অতি উৎকৃষ্ট সুগন্ধ তামাক খাইতে লাগিল, তিনি ঐ স্থানে উপনীত হইলে ঐ তামাকের সুসৌরভ তাঁহাকে এক কালে বিমোহিত করিল। তিনি নবাব সদনে উপস্থিত হইলে অনেক ক্ষণ তামাক খাওয়া ঘটিবেক না, এবং ঐ তামাকটাও

অতি চমৎকার, এক ছিলম খাইয়া যাওয়া যাউক, এই মনে করিয়া, বাহকগণকে যান নামাইতে আদেশ দিলেন, এবং ভৃত্যকে কহিলেন, "উহারা যে তামাক খাইতেছে, ঐ তামাক এক ছিলম সাজিয়া দে।" ধূমপায়ীরা পূর্ব্বশিক্ষানুসারে নানা ছলে ও কৌশলে তামাক দিতে অতিশয় বিলম্ব করিল। এদিকে তাঁহার তামাক সাজা হইতে লাগিল, ও দিকে নবাববাটীতে নবাব সভাস্থ হইলেন। কৃষ্ণচন্দ্র, সমীপস্থ হইয়া, অশ্রুপূর্ণ নয়নে ও বিনয় বচনে, আপনার প্রার্থনা সিদ্ধির অনুকূল যাবতীয় কথা সবিশেষ সমস্ত নিবেদন করিতে লাগিলেন। নবাব তাঁহার বুদ্ধি, বিদ্যা ও বিজ্ঞতা দর্শনে যৎপরোনাস্তি সন্তুষ্ট হইয়া অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসিলেন, "এমন উপযুক্ত পুত্র থাকিতে ভ্রাতাকে উত্তরাধিকারী করিবার কারণ কি?" তাঁহারা কহিলেন, "বোধ হয়, পুত্রের বয়স অল্প বলিয়া ভ্রাতাকে স্বীয় বিষয়াধিকারী করিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার বুদ্ধিহীন ভ্রাতা অপেক্ষায় তরুণবয়স্ক এই বুদ্ধিমান্ তনয় বিষয়কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিতে পারিবেন, তাহার সন্দেহ নাই।" নবাব জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামগোপাল কোথায়?" কৃষ্ণচন্দ্রের স্বপক্ষ নবাবের এক জন কর্ম্মচারী বলিলেন, "শুনিলাম তিনি চকের পথিমধ্যে বসিয়া তামাক খাইতেছেন।" এই কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস না হওয়াতে, নবাব এক জন দূত প্রেরণের আদেশ করিলেন। ঐ দূত প্রত্যাগত হইয়া নিবেদন করিল, "যাহা ধর্ম্মাবতারের কর্ণগোচর হইয়াছে তাহা অযথার্থ নয়। আমি গিয়া দেখিলাম তিনি বাস্তবিক রাজপথে দোলাযানে বসিয়া তামাক খাইতেছেন।" নবাব রামগোপালকে নিতান্ত অসার ও অপদার্থ ভাবিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে রঘুরামের স্থলাভিষিক্ত করিবার আদেশ দিলেন।

কৃষ্ণচন্দ্র তরুণবয়সেই যেমন উদ্যোগী, সাহসী, কর্ম্মদক্ষ হইয়াছিলেন, তেমনিই বিষয়-সংক্রান্ত নানাবিধ ঘোরতর বিপদ তাঁহাকে উদ্বেজিত করিয়াছিল। তাঁহার পিতামহ রাজা রামজীবন এবং পিতামহের অগ্রজ রাজা রামচন্দ্র ও পিতামহের বৈমাত্র রাজা রামকৃষ্ণ এই তিন জন নির্দ্ধারিত রাজস্ব না দেওয়াতে ২০ লক্ষ টাকা দেনা হয়। তাহার মধ্যে তদীয় পিতামহ ও পিতা দশ লক্ষ পরিশোধ করেন। তিনি একেত পৈতৃক বিষয়াধিকারের সঙ্গে সঙ্গে অবশিষ্ট দশ লক্ষ টাকার দায়ী হন, তাহাতে আবার নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ, নজরানা বলিয়া তাঁহার স্থানে দ্বাদশ লক্ষ টাকা চাহেন, এবং ঐ টাকা দিতে না পারাতে তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখেন। তাঁহার জমীদারী মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ লুণ্ঠিত হওয়াতে, প্রজাদিগের এমন দুরবস্থা হইয়াছিল যে, রাজার এ বিপদ উদ্ধারার্থ তাহারা যে কোন আনুকূল্য করিবে, ইহার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তিনি আপন প্রধান প্রধান কর্ম্মচারীগণকে ডাকাইয়া এই দেনা পরিশোধের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। এত অধিক টাকা কোথা হইতে সংগৃহীত হইবে, তাহার কোন উপায় প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষদিগের মধ্যে কেহই উদ্ভাবন করিতে পারিলেন না। কায়স্থজাতীয় রঘুনন্দন নামে এক জন সামান্য কর্ম্মচারী নিবেদন করিলেন, "মহারাজ! যদি কিছু দিনের নিমিত্ত, আপনার অধিকার ও ক্ষমতা আমাকে প্রদান করেন, তবে আমি মহারাজকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারি।" এই বলিয়া যেরূপে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন, তাহা সবিশেষ বর্ণন করিলেন। বিচক্ষণ রাজা, অনতিবিলম্বেই, তাঁহাকে দেওয়ানি পদ প্রদান ও আপনার ক্ষমতা অর্পণ করিয়া, কৃষ্ণনগরে পাঠাইলেন।

তৎকালে, রাজপুত্র, রাজজামাতা ও রাজভাগিনেয়গণ জমীদারীর অনেকাংশ ইজারা রাখিতেন, এবং স্বেচ্ছামত কর প্রদান করিতেন। দেওয়ানেরা তাঁহাদের উপর বিশেষ ক্ষমতা প্রকাশ করিতে পারিতেন না। সুতরাং, তাঁহাদের নিকট বিস্তর খাজানা বাকী পড়িয়া থাকিত। রঘুনন্দন দেওয়ানী পদে নিযুক্ত হইয়া, প্রথমেই, এক রাজজামাতার স্থানে তাঁহার দেয় কর চাহিয়া পাঠাইলেন। রাজজামাতা উত্তর করিলেন, "এক্ষণে আমার টাকা দিবার সঙ্গতি নাই।" এই কথা শুনিয়া দেওয়ান এক জন কর্ম্মচারী দ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করাইলেন। জামাতা তাহাতে উপেক্ষা করিয়া কহিলেন, "এখন ত আমার যাইবার অবকাশ নাই।" এরূপ উত্তর পাইবেন তাহা সুচতুর দেওয়ান পূর্ব্বেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ দশ জন পদাতিককে আপন মনোনীত আদেশ দিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিলেন। তাহারা রাজজামাতার সমীপস্থ হইয়া করপুটে নিবেদন করিল যে, "দেওয়ানজী আপনাকে লইয়া যাইতে আমাদিগকে পাঠাইয়াছেন।" রাজজামাতা নিরুপায় হইয়া অবিলম্বে দেওয়ানের নিকট আগমন করিলেন। দেওয়ান যথোচিত অভ্যর্থনা ও সম্মান পুরঃসর তাঁহাকে বসিতে আসন দিয়া কহিলেন, "আমি যদর্থে আপনাকে এই ক্লেশ দিলাম, তাহা বোধকরি, আপনার অনুভূত হইয়াছে। অতএব, যাহাতে আর আপনার এরূপ ক্লেশ পাইতে না হয় তাহা শীঘ্র করুন।" জামাতা, দেওয়ানের মনের ভাব বুঝিয়া, তদীয় প্রস্তাবে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইয়া প্রতিগমন করিলেন। ইহা দেখিয়া অন্য অন্য রাজজামাতাগণও সর্ব্বাধিকারীর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। তদনন্তর, রঘুনন্দন রাজপুত্রগণের নিকট তাঁহাদের দেয় কর প্রদানের জন্য বলিয়া

পাঠাইলেন। তাঁহারা, দেওয়ান আমাদের ভগ্নাপতির সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন আমাদের সহিত সেরূপ ব্যবহার করিতে কখনই সাহসী হইবেন না, এইরূপ মনে করিয়া গর্ব্বিত বচনে কহিলেন, "আমাদের তহবিলে এক্ষণে টাকা নাই।" দেওয়ান এই বাক্য শুনিয়া পরদিন তাঁহাদের নিত্য পূজার দ্রব্য জাত কেহ বাটীর মধ্যে লইয়া যাইতে না পারে, দ্বারপালগণের প্রতি এইরূপ আদেশ করিলেন, এবং তাঁহাদিগকে বলিয়া পাঠাইলেন, "আপনাদের পরমারাধ্য পিতৃদেব চিরদিন কারাবাস নিবন্ধন অশেষ ক্লেশ ভোগ করিবেন, আর এদিকে আপনারা স্বচ্ছন্দে ভোগসুখে কালাতিপাত করিতে থাকিবেন, ইহা কোন মতেই আপনাদের কর্ত্তব্য নহে। অতএব, অদ্য তাঁহাকে কারামুক্ত করিবার উপায় করিয়া পূজাদি করুন। যদি আপনারা রিক্তহস্তও হন, এবং আশু ধনাহরণের উপায়ান্তর না থাকে, তথাপি ঠাকুরাণীদিগের (অর্থাৎ রাজপুত্রবধূদিগের) অভরণ বন্ধক দিয়াও এ অবশ্য কর্ত্তব্য সাধন করা বিধেয় হইতেছে।" রাজকুমারগণ, সর্ব্বাধিকারীর এই ভয় প্রদর্শন বাক্যে ভীত হইয়া, অনতিবিলম্বে স্ব স্ব দেয় কর প্রদানের অঙ্গীকার করিলেন। ভাগিনেয় ও অপর কুটুম্বগণ অবিলম্বে তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুগামী হইলেন। অপরাপর ইজারদারেরা, রাজনন্দন ও রাজজামাতাদিগের অবস্থা দর্শনে, সভয়চিত্তে অনতিবিলম্বে নিজ নিজ দেনা পরিশোধ করিলেন। রঘুনন্দন এইরূপে অল্প কাল মধ্যে অনেক টাকা সংগ্রহ করিয়া মুরশিদাবাদ প্রেরণ করিলেন, এবং রাজা ঐ টাকা নবাব সরকারে দাখিল করিয়া অবশিষ্ট টাকা পরিশোধের বন্দবস্ত করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন।

কিয়ৎকালানন্তর, দেওয়ান সমস্ত জমীদারী জরিপ করিতে

প্রবৃত্ত হইলেন, এবং তৎকার্য্য সম্পাদিত হইলে ভূমির উর্ব্বরতার তারতম্যানুসারে যথোচিত কর নির্দ্ধারিত করিলেন। যে সমস্ত ভূমি নিষ্করাবস্থায় ছিল, তৎসমুদায়ের তদন্ত করিয়া, যাহা রাজদত্ত বলিয়া অবধারিত হইল, তাহার মুক্তিপত্র (ছাড়) দিলেন, এবং যে ভূমি রাজদত্ত নয় বলিয়া সাব্যস্ত হইল, তাহার কিয়দংশ দখলিকারকে দিয়া অবশিষ্টাংশ রাজসরকারে গ্রহণ করিলেন। এইরূপ বন্দবস্ত করাতে, জমীদারীর আয় পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক বৃদ্ধি হইল। তাঁহার স্বাক্ষরিত ছাড়পত্র (১) অদ্যাপি ভূমির নিষ্করত্ব প্রতিপাদক বলিয়া সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হইয়া থাকে। পরিমাণ-সংক্রান্ত কার্য্য সমাপ্ত হইলে, রাজা এক দিন তাঁহাকে যথোচিত প্রশংসাবাদ করিয়া কহিলেন, "দেওয়ান! জরিপের কর্ম্মটি অতি সুন্দররূপ নির্ব্বাহিত হইয়াছে।" তিনি উত্তর করিলেন, "মহা-রাজ! একার্য্য সুন্দররূপ সম্পন্ন হয় নাই, এবং হইবারও সম্ভা-বনা নাই। যদি রসীর এক প্রান্ত ঠাকুর স্বয়ং ও অপর প্রান্ত ঠাকুরপুত্রদের মধ্যে কেহ ধরিতেন, আর সেবক চিটা লিখিত, তাহা হইলে জরিপ সূক্ষ্ম হইতে পারিত।"

রঘুনন্দন কেবল আয়ের বৃদ্ধি করিয়া নিশ্চিন্ত হন নাই, ব্যয়েরও অনেক লাঘব করিয়াছিলেন। এ নিমিত্ত, তিনি সমস্ত রাজ-পরিবারের ও সকল রাজকর্ম্মচারীর অপ্রিয় হইয়া পড়িলেন। সকলেই ঈর্ষাদগ্ধচিত্ত হইয়া তাঁহার নিধন-সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন। রাজসমীপে নানা কৌশলে তাঁহার বিরুদ্ধে কথা উত্থা-পিত হইতে লাগিল; কিন্তু তাঁহার প্রতি বিচক্ষণ রাজার যে অটল বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ছিল, তাহা কোন ষড়যন্ত্র দ্বারা বিচলিত হইল না। কিয়ৎকাল পরে, অন্যত্রে কোন এক ব্যক্তি তাঁহার

(১) ইহাকে রঘুনন্দনী ছাড় বলিয়া থাকে।

ভয়ঙ্কর শত্রু হইয়া উঠিল; তিনি অবশেষে তাহারই হস্তে নিহত হইলেন।

একদা, মুরশিদাবাদে নবাবের সভায় বর্দ্ধমান ও রাজসাহী প্রভৃতি নানা প্রদেশীয় রাজাদিগের দেওয়ান, উকীল, এবং অন্য অন্য অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আসীন আছেন, এমত সময়ে, রঘুনন্দন ঐ স্থানে উপনীত হইলেন। সভা মধ্যে শূন্য স্থান অতি সঙ্কীর্ণ ছিল। এ কারণ, তন্মধ্যে প্রবেশ কালে তাঁহার পরিচ্ছদের নিম্নদেশ বর্দ্ধমানাধিপতির দেওয়ান মাণিকচাঁদের অঙ্গে লাগিল। ইহাতে মাণিকচাঁদ সাতিশয় কোপপ্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকে হিন্দি ভাষায় কহিলেন, "দেখ্‌তে নেহিঁ পাজি।" রঘুনন্দন বলিলেন, "হাঁ নওকর সবহি পাজি হ্যায়, কোই ছোটা কোই বড়া।" এই কৌতুকাবহ ও সমুচিত উত্তর শ্রবণে সভাস্থ যাবতীয় ব্যক্তি উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। এইরূপ উপহসিত হওয়াতে তদবধি তাঁহার সহিত মাণিকচাঁদের বিষম বৈরানুবন্ধন ঘটিল। কিয়ৎকাল পরে মাণিকচাঁদ নবাবের দেওয়ানী পদ প্রাপ্ত হইলেন, এবং ঐ পদে নিযুক্ত হইবামাত্র বৈরনির্যাতনের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তৎকালে এরূপ উচ্চপদস্থ ও ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তি রঘুনন্দন সদৃশ লোকের অনিষ্ট সাধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলে, কোন না কোন ছল ধরিয়া অনায়াসে সকলযত্ন ও পূর্ণমনোরথ হইতে পারিতেন। বর্দ্ধমানের রাজার কয়েক লক্ষ টাকা রাজস্ব হুগলি হইতে মুরশিদাবাদে প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ টাকা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জমীদারীর অন্তর্ভূত পলাশী গ্রামে পৌঁহুছিলে রাত্রিযোগে বহুসঙ্খ্যক দস্যু আসিয়া প্রহরিগণের মধ্যে কাহাকে হত কাহাকে আহত ও পরাভূত করিয়া সমস্ত ধন হরণ করে। কৃষ্ণচন্দ্রের কর্ম্মচারিগণ অপরিমেয় চেষ্টা

পাইয়াও হৃতধনের বা অপহারিগণের কোন অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারিলেন না। কৃষ্ণচন্দ্রের ষড়যন্ত্রে অথবা তাঁহার শাসন দোষে এই ব্যাপার ঘটিয়াছে বলিয়া, রায় মাণিকচাঁদ তাঁহার প্রধান কর্ম্মাধ্যক্ষ রঘুনন্দনকে অপরাধগ্রস্ত করিলেন, এবং প্রথমে তাঁহাকে সমধিক অবমাননা করিয়া, পরিশেষে কামানের গোলা দ্বারা উড়াইয়া দিলেন। রাজবাটীতে অতি দুঃখাবহ এই এক প্রবাদ আছে যে, রঘুনন্দন ইতিপূর্ব্বে নিতান্ত প্রয়োজন বশতঃ রাজকুমারদের সঙ্গে যে আপাত কঠিন আচরণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ঐ বিষয় স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহার এই দুর্দ্দশায় দুঃখিত চিত্ত না হইয়া বরং পুলকিত হইয়াছিলেন। একারণ, যখন মুরশিদাবাদে রঘুনন্দনকে গর্দ্দভারোহিত করিয়া নবাবের লোকেরা নগর ভ্রমণ করায়, তখন তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের বাসস্থানের সমীপস্থ বর্ত্মে সমাগত হইলে, রাজপুত্র শিবচন্দ্র তাঁহার প্রতি নয়নপাত করিয়া ঈষৎ হাস্য করেন। তদ্দর্শনে রঘুনন্দন অতীব ব্যথিত হৃদয় হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, যে "এই অবমাননাতে আমার যাদৃশ যন্ত্রণা বোধ হইতেছে, তাহার সহস্র গুণ তোমাদের ব্যবহারে হইল। অবোধ রাজনন্দন, আমার এই অবমাননাতে কাহার অবমাননা হইতেছে, ইহা যে তুমি বুঝিলে না এই বড় পরিতাপের বিষয়। আমি এ গর্দ্দভে আরোহণ করি নাই, তোমার পিতাই করিয়াছেন জানিবে"।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ কৃষ্ণচন্দ্রের স্থানে নজরানা বলিয়া দ্বাদশ লক্ষ টাকা চাহেন, এবং তাহা দিতে না পারাতে তাঁহাকে কারারুদ্ধ রাখেন। তাঁহার দেওয়ান রঘুনন্দনের বিশেষ যত্নে ও বুদ্ধিকৌশলে যে অর্থ সংগৃহীত হয় রাজা নবাবকে এই অর্থ দিয়া কি প্রকার বন্দবস্ত করিয়া কারা-

মুক্ত হইয়া আসেন, কত টাকা দিবার বন্দবস্ত করেন, তাঁহার কত টাকা দিতে পারিয়াছিলেন, অথবা সমস্ত টাকা দিতে হইয়াছিল, কি কত টাকা মাফ পাইয়াছিলেন, এ সকল বিষয় জানিতে পারা যায় নাই। কিন্তু, তাঁহার পিতৃ পিতামহের সময়ের দেয় রাজস্ব ২০ লক্ষ টাকার মধ্যে যে দশ লক্ষ টাকা বাকী ছিল, তাহার বিষয়ে রাজবাটীতে এই রূপ এক প্রবাদ প্রচলিত আছে যে আলিবর্দ্দি, প্রথমে, আপনার অধীন আর আর ভূম্যধিকারিদিগের উপর যেমন অসদয় ছিলেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের উপরও সেইরূপ ছিলেন। কিন্তু কিয়ৎকালানন্তর, কৃষ্ণচন্দ্রের নানাবিধ সদ্গুণে মোহিত হইয়া তাঁহার সঙ্গে যথেষ্ট সদয় ব্যবহার করেন। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে সর্ব্বদাই নিকট রাখিতেন, এবং তাঁহার সহিত ধর্ম্ম ও বিষয় সম্বন্ধীয় নানা বিষয়ে সর্ব্বদা আলাপ করিতেন। তিনি প্রায় প্রতি রজনীর প্রথম ভাগে নবাবের সমীপে থাকিতেন, এবং মধ্যে মধ্যে উর্দ্দু ভাষায় মহাভারত প্রভৃতি পুরাণের অনুবাদ করিয়া শুনাইতেন। নবাব ইহাতে সাতিশয় আমোদিত হইতেন। তিনি ক্রমশঃ আলিবর্দ্দির এত অধিক প্রিয় পাত্র হইয়াছিলেন যে কিঞ্চিৎকাল অনুপস্থিত থাকিলে, নবাব তাঁহার অন্বেষণ করিতেন। নবাব তাঁহাকে যতই কৃপা করুন না কেন, একাল পর্য্যন্ত আপন পূর্ব্ব পুরুষের অধিকারকালের বাকী রাজস্বের নিমিত্ত নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই। এই টাকা মাফ পাইবার জন্য, রাজা নবাবের নিকট সকাতরে পুনঃ পুনঃ আবেদন করিয়াছিলেন, কিন্তু কোন রূপেই সফল যত্ন হইতে পারেন নাই। একদা নবাব জলপথে কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র এই সুযোগে আপনার মনোরথ পূর্ণ করিবার মানসে তাঁহার সঙ্গী হইলেন। নবাবের পোতাবলি পলাশী পরগণার সন্নিহিত হইলে, তিনি ঐ

পরগণার শস্যশূন্য সুবিস্তৃত ক্ষেত্রের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "ধর্ম্মাবতার! সেবকের জমীদারীর অবস্থার প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করিতে আজ্ঞা হয়। এই পরগণার যেরূপ অবস্থা দেখিতেছেন, আমার সমুদায় পরগণারই প্রায় এইরূপ অবস্থা। কোন পরগণা জলশূন্য, কোন পরগণা বনাকীর্ণ, কোন পরগণা অনুর্ব্বরা। ইহাতে রাজস্বের পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করা নিতান্ত দুঃসাধ্য।" অনন্তর ক্রমশঃ তরণী সকল যেমন অগ্রসর হইতে লাগিল, তিনিও তেমনি ভাগীরথী-পূর্ব্ব-তটস্থ গ্রাম সমূহের অবস্থা দেখাইতে লাগিলেন। কয়েক দিন পরে, নৌকাবলি নবদ্বীপ সন্নিকটে উপনীত হইল। এই গ্রাম তৎকালে বংশশ্রেণীতে এমত পরিবেষ্টিত ছিল যে, ইহার মধ্যে লোকের বসতি আছে কি না, নদীগর্ত্ত হইতে তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইত না। গ্রামের মধ্যে তৃণাচ্ছাদিত গৃহ ব্যতীত একটিও অট্টালিকা ছিল না। কৃষ্ণচন্দ্র গ্রামের দিকে লক্ষ্য করিয়া নবাব সমীপে সবিনয়ে নিবেদন করিলেন, "ধর্ম্মাবতার! আমার জমীদারীর মধ্যে এই গ্রাম সর্ব্বাগ্রগণ্য; আমি যেরূপ ভাগ্যবান্, এই গ্রামই তাহার পরিচয় প্রদান করিতেছে।" নবাব গ্রামের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন, কিন্তু কোন বাঙ্নিষ্পত্তি করিলেন না। তথা হইতে নবাবের তরী কলিকাতায় উত্তীর্ণ হইল। ঐ নগর সে সময়ে, একখানি সামান্য গ্রাম ছিল, কেবল ইহার উত্তরাংশে গঙ্গার ধারে কতকগুলি লোকের বসতি ছিল। পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশ এককালে বাদাবনে আচ্ছন্ন ছিল। তৎকালে মুরশিদাবাদ ও কলিকাতার মধ্যে ভাগীরথীর পূর্ব্বতটস্থ কোন গ্রাম বা নগরের নিকট এতাদৃশ বন ছিল না। একারণ

সুচতুর কৃষ্ণচন্দ্র, তাঁহার জমীদারীর দুরবস্থা নবাবের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত, ঐ প্রদেশ দেখাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আলিবর্দ্দি, রাজার প্রগাঢ় নির্ব্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, জমীদারীর অবস্থা দর্শনার্থে নির্গত হইলেন, এবং জনস্থান অতিক্রম করিয়া যতদূর গমন করিলেন, কেবলই অরণ্যময় দর্শন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, রাজার শিক্ষানু-সারে নবাবের সঙ্গিগণ এখানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তুর ভয় আছে, পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন। এই কথা নবা-বের কর্ণগোচর হইবামাত্র তিনি প্রতিগমনে উদ্যত হইলেন। রাজা সজলনয়নে ও কাতরবচনে নিবেদন করিলেন, "যদি সৌভাগ্যক্রমে, ধর্ম্মাবতার কৃপাপূর্ব্বক বিশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া, এতদূর আসিয়াছেন, তবে আর কিছু দূর গমন করুন, তাহা হইলে সেবকের অভীষ্ট সিদ্ধির আর কোন সন্দেহ থাকে না।" নবাব উত্তর করিলেন, "কৃষ্ণচন্দ্র আর অধিক দূর গমনের প্রয়োজন নাই, অদ্য তোমাকে পৈতৃক দায় হইতে মুক্ত করা গেল।" রাজা নবাবকে অগণ্য ধন্যবাদ ও বারং-বার আশীর্ব্বাদ করিয়া কৃতার্থম্মন্য চিত্তে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করিলেন। এই দায়ে তাঁহার পিতামহ, পিতা ও তিনি নিজেও পুনঃ পুনঃ কারারুদ্ধ হন এবং অশেষ ক্লেশভোগ করেন। এ প্রদেশে এই দায় রাজাদের বিশলাখি দায় বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

দ্বাদশ অধ্যায়।

যৎকালে তাঁহার জমীদারী মধ্যে মহারাষ্ট্রীয়গণের উপ-দ্রব সংঘটিত হয়, তৎকালে কৃষ্ণচন্দ্র অপেক্ষাকৃত কোন নিরাপদ

স্থানে বাস করিবার মানস করেন। অনেক বিবেচনার পর কৃষ্ণনগরের ছয় ক্রোশ অন্তরে ইচ্ছামতী নদীর নিকটস্থ একটি স্থান মনোনীত করিলেন। ঐ স্থান অরণ্যময় ও জলবেষ্টিত ছিল। নস্রৎ খাঁ নামক এক জন ফকির তথায় বাস করিত বলিয়া, লোকে ঐ স্থানের নাম নস্রৎ খাঁর বেড় রাখিয়াছিল। রাজা ঐ স্থান বনশূন্য করিয়া তাহাতে নগর পত্তন করিলেন। চতুর্দ্দিকে যে জলাশয় ছিল, তাহার পূর্ব্ব দিক্ হইতে দীর্ঘে সহস্র হস্ত পরিমিত এক খাল কাটাইয়া ইচ্ছামতী নদীর সঙ্গে, এবং পশ্চিম দিক্ হইতে প্রায় তিন ক্রোশ আর এক খাত কাটাইয়া হাঁসখালির উত্তরে অঞ্জনা নদীর মোহানার সহিত মিলাইয়া দিলেন। এই উভয় নদীর সহিত মিলিত হওয়াতে ঐ জলাশয় প্রবাহবিশিষ্ট হইল. কঙ্কণ সদৃশ গোলাকার ছিল বলিয়া রাজা তাহার নাম কঙ্কণা রাখিলেন। নগরের নাম শিবনিবাস দিলেন।

নগরমধ্যে কলত্র, পুত্র, ভাগিনেয় প্রভৃতি সমস্ত রাজপরিবারের বাসোপযোগী পৃথক্ পৃথক্ সুরম্য হর্ম্ম্য, এবং পূজার বাটী দেবানখানা, নওবৎখানা, সিংহদ্বার ইত্যাদি নানাবিধ অট্টালিকা নির্ম্মিত হইল। নগর প্রবেশের একমাত্র দ্বার পূর্ব্ব দিকে থাকিল। দ্বারদেশে এবং নগরের চতুর্দ্দিকে শত্রুর প্রবেশরোধার্থ নানাপ্রকার কল কৌশল করিয়া রাখা হইল। কিছু কাল পরে, রাজা মন্দিরত্রয় প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে রাজরাজেশ্বর, রাজ্ঞীশ্বর, ও রামচন্দ্র নামে তিন দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। রাজরাজেশ্বরের মন্দিরের ন্যায় উচ্চ মন্দির এ প্রদেশে আর কোন স্থানে দেখিতে পাওয়া যায় না। রাজার যাবতীয় কুটুম্ব, পারিষদ ও অমাত্যাদি কৃষ্ণনগরের বাস

পরিত্যাগ করিয়া ঐ স্থানে গিয়া বসতি করিলেন। ঐ স্থান যেমন রমণীয়, নগরও তেমনি হইল। এ কারণ মহারাষ্ট্রীয়-দিগের উপদ্রব নিবৃত্ত হইলেও রাজা আর কৃষ্ণনগরে আসিয়া বাস করিলেন না। ঐ নগরেই প্রায় সমস্ত জীবন যাপন করিলেন। আক্ষেপের বিষয় এই যে, পূর্ব্ব পুরুষ কৃত অতি সুদৃশ্য নওবৎ-খানা ও চকের রক্ষার বিষয়ে অমনোযোগী রহিলেন, এবং স্ব-নির্ম্মিত অতি সুন্দর পূজার দালানের আর সংস্কারাদি কিছু করিলেন না। পূজার সম্মুখস্থ নাট্যশালা অসম্পূর্ণাবস্থায় থাকিল। কৃষ্ণনগরের চকের পূর্ব্বদ্বার হইতে শিবনিবাসের সিংহদ্বার পর্য্যন্ত যে বর্ত্ম প্রস্তুত হইয়াছিল, তাহার প্রতি এক এক ক্রোশানন্তর এক এক তুলসি-মন্দির স্থাপিত হয়। ঐ পথ ক্রমশঃ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে, কেবল দুই একটি ভগ্ন তুলসি-মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে।

শিবনিবাসের দক্ষিণ দিকে কৃষ্ণপুর নামে এক গ্রাম পত্তন করিয়া তথায় বহু গোপজাতির বসতি করান। তাহারা রাজ-সরকারের নানাবিধ কার্য্য করিত। এক্ষণে তাহারা কৃষ্ণপুরে গড়ো বলিয়া খ্যাত। নগরের এক ক্রোশ পূর্ব্ব উত্তরে ইচ্ছা-মতী নদীতীরে এক গঞ্জ স্থাপন করেন এবং তাহার নাম কৃষ্ণগঞ্জ রাখেন। ঐ গঞ্জের নিকটস্থ গ্রামও কৃষ্ণগঞ্জ বলিয়া খ্যাত। ইদানীং ঐ গ্রামের নিকট ইষ্টরণ বেঙ্গল রেল-ওয়ের কৃষ্ণগঞ্জ নামে এষ্টেশন হইয়াছে। কিয়ৎকাল পরে, রাজা হরধাম ও আনন্দধাম নামে আর দুইটি গ্রাম পত্তন করেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে অঞ্জনা নদী যাত্রাপুরের নিকট দ্বিধারা হয় ও পরে উভয় ধারা মামজোয়ান গ্রামের নিকট সমবেত হইয়া দক্ষিণে যায়। ঐ নদী শেষে হরধামের উত্তর

দিয়া গিয়া চাকদহের নিকট গঙ্গার সহিত মিলিত হয়। হরধাম হইতে শিবপুরের সমীপস্থ ভাগীরথী অধিক দূরবর্ত্তী ছিল না; এ কারণ কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাস্নানের সুগমের নিমিত্ত, হরধাম হইতে শিব-পুর পর্য্যন্ত এক খাল কাটাইয়া দেন, তাহাতেই শিবপুরের সন্নি-হিত ত্রিমোহিনীর সৃষ্টি হয়। শিবনিবাস হইতে শিবপুর পর্য্যন্ত যে নদী আছে, তাহার চূর্ণী নাম রাজা কৃষ্ণচন্দ্র দেন, কি এই নদীর যে অংশ পূর্ব্বে ছিল তাহার এই নাম থাকে, তাহা নিশ্চয় জানিতে পারা যায় নাই। শিবপুরের অর্দ্ধ ক্রোশ পূর্ব্বে এই নদীর উভয় তটে দুই বাটী নির্ম্মিত করান এবং তাহার একটির নাম হরধাম অপরটির নাম আনন্দধাম রাখেন। এই দুই বাটীর নামানুসারে গ্রামের নামও হরধাম ও আনন্দধাম হয়। আনন্দধামের বাটী অতি সামান্য; কিন্তু হরধামের বাটী যেমন বৃহৎ তেমনি শোভনীয় ছিল। রাজা মধ্যে মধ্যে গঙ্গা স্নানোপ-লক্ষে ঐ বাটীতে বাস করিতেন। ইদানীং যদিও ঐ বাটীর প্রায় সমস্ত অংশই ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তথাপি দর্শনমাত্রেই ঐ বাটী কোন সময়ে, অতি প্রধান লোকের বাসস্থান ছিল ইহা দর্শকের মনে উদয় হয়।

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ পরলোক গমন করিলে পর, তাঁহার দৌহিত্র সিরাজদ্দৌলা মাতামহের সিংহাসনারূঢ় হইলেন। ইহাঁর অত্যাচারে কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি ভূম্যধিকারী, কি বণিক্, কি কুটুম্ব, কি কর্ম্মচারী সকলেই জ্বালাতন হইলেন, এবং আপনাদের ধন, মান, জীবন, সর্ব্বদা সঙ্কটাপন্ন বোধ করিতে

লাগিলেন। এ প্রদেশস্থ যাবতীয় ভূম্যধিকারিগণ নবাবের দেওয়ানের নিকট আপনাদের দুঃখের কথা সবিশেষ সমস্ত জানাইলেন। দেওয়ান ঐ সকল বৃত্তান্ত নবাবকে জ্ঞাত করিয়া যথোচিত সৎপরামর্শ দিলেন। কিন্তু নবাব মন্ত্রীর সুমন্ত্রণার প্রতি কর্ণপাত করিলেন না। ক্রমশঃ তাঁহার বিষম দৌরাত্ম্য সকলের অসহ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে রাজা মহেন্দ্র, রাজা রামনারায়ণ, রাজা রাজবল্লভ, রাজা কৃষ্ণদাস, মিরজাফর প্রভৃতি প্রধান প্রধান কয়েক ব্যক্তি, দুর্দান্ত নবাবের উৎপীড়নের প্রতিবিধান করিবার নিমিত্ত, জগৎশেঠের ভবনে সমাগত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। সভাতে নানাপ্রকার প্রস্তাব ও অনেক তর্ক বিতর্ক হইল, কিন্তু কি কর্ত্তব্য কিছুই স্থির হইয়া উঠিল না। পরিশেষে অতি বিচক্ষণ ও পরিণামদর্শী রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া এ বিষয়ের কর্ত্তব্য অবধারণ করা যাইবে, সমস্ত ব্যক্তি একবাক্যে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। মুরশিদাবাদে আসিবার জন্য রাজাকে পত্র লেখা হইল। রাজা সহসা স্বয়ং না যাইয়া আপনার সুবিজ্ঞ দেওয়ান কালীপ্রসাদ সিংহকে পাঠাইলেন, এবং দেওয়ান তথা হইতে প্রত্যাগমন করিলে বিস্তারিত অবগত হইয়া, নিজে মুরশিদাবাদ গমন করিলেন। তিনি তথায় উপনীত হইলে, জগৎশেঠের বাটীতে পুনরায় একটি সভা হইল। প্রথম সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন এ সভাতেও তাঁহারা সমাগত হইলেন। সভ্যগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি, "বর্ত্তমান নবাবকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তিকে তাঁহার স্থলাভিষিক্ত করিবার প্রার্থনায় সম্রাটের সমীপে আবেদন করা যাউক" এই কথা উত্থাপন করিলেন। তাঁহার প্রস্তাবে অপর এক জন কহিলেন "সরফরাজ খাঁ নবাবের

সময়াবধি যেরূপ দেখিয়া আসা যাইতেছে, তাহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, যবন কর্ত্তৃত্বাধীন হিন্দুজাতির নিরাপদে কালাতিপাত করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব, যাহাতে আর যবনের অধীন হইয়া থাকিতে না হয়, ইহারই মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য।" এই প্রস্তাবে কেহ বা অনুমোদন, কেহ বা প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রায় কোনপক্ষেই কথা কহিলেন না। ফলতঃ—পূর্ব্ব সভার ন্যায় এ সভাতেও কিছুই হইল না। সভা ভঙ্গ হইলে, জগৎশেঠ ও রাজা মহেন্দ্র ঈষৎ বিরক্তি প্রকাশ করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে কহিলেন, "উপস্থিত গুরুতর বিষয়ের ইতিকর্ত্তব্যতা অবধারণার্থ আপনাকে এত আগ্রহ সহকারে আনাইলাম, কিন্তু সভাতে আপনি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন, আপন অভিপ্রায় কিছু মাত্র ব্যক্ত করিলেন না, ইহার কারণ কি?" তিনি বলিলেন, "যে সভায় মিরজাফর এক জন প্রধান সভ্য, তাহাতে যবনাধিপত্য নিরাকৃত করিবার প্রস্তাব হইল, দেখিয়া আমি মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলাম। আমার যে অভিপ্রায় তাহা আপনাদের নিকট এক্ষণে ব্যক্ত করিতেছি, শ্রবণ করুন। যবনাধিপত্যে হিন্দুদিগের নিরাপদে ও স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিবার সম্ভাবনা নাই, একথা যথার্থ বটে, কিন্তু হিন্দুজাতির রাজত্ব সংস্থাপনের কি কোন সম্ভাবনা আছে? মিরজাফরের সহায়তা ব্যতীত আমরা উপস্থিত বিপদ হইতে কোন ক্রমে মুক্ত হইতে পারি না, ইহা বিলক্ষণ রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, এবং তাঁহার নবাবী পদ প্রাপ্তির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা না থাকিলে তিনি যে সহায়তা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন না ইহাও স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে। এরূপ স্থলে আমার অভিমত এই যে, যাহাতে জাফরের অভীষ্ট সিদ্ধ ও আমাদের বিপদ শান্তি হয়, এই রূপ কোন পথ অবলম্বন করা বিধেয়। এই উভয় সঙ্কল্প

সাধনের এক মাত্র উপায় দেখা যাইতেছে। আমার জমীদারী মধ্যে কলিকাতায় যে সকল ইঙ্গরেজের বাস আছে, তাঁহাদের সহিত মধ্যে মধ্যে আমার সাক্ষাতাদি ঘটে। আমি তাঁহাদের রীতি নীতি উত্তম রূপে অবগত আছি, তাঁহারা যেমন পরাক্রান্ত ও সাহসী, তেমনি আবার বুদ্ধিমান্ ও বিশ্বস্ত। নবাবের দৌরাত্ম্যে আমরা যেমন বিপদগ্রস্ত, তাঁহারাও তেমনি ব্যতিব্যস্ত হইয়াছেন। সুতরাং চেষ্টা ও যত্ন করিলে তাঁহাদের সাহায্য পাইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে। তাঁহারা সহায়তা করিলে মিরজাফর পূর্ণ-মনোরথ হইবেন, এবং আমাদেরও ইষ্ট সিদ্ধি হইবেক। আর আমরা যেমন মিরজাফরের কর্ত্তৃত্বের অধীন থাকিব, তিনিও তেমনি ইঙ্গরেজদের শাসনের অধীন থাকিবেন। ইহা হইলে তাঁহার এবং আমাদের উভয় পক্ষেরই অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক। অতএব, যদি আপনাদিগের অভিমত হয়, তবে আমি তাঁহাদের নিকট এ বিষয়ের প্রস্তাব করি।" এই সকল কথা শুনিয়া রাজা মহেন্দ্র কহিলেন, "তাঁহাদের স্বভাব ও চরিত্রের বিষয় আমি কিছু ভাল জানি না, সুতরাং তাঁহাদের উপর এতদূর বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য কি না, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছি না।" রাজা মহেন্দ্রের বাক্যাবসানে জগৎশেঠ কহিলেন ,"আমি কখন কখন এই জাতির সহিত বিষয় ব্যাপার করিয়া থাকি, তাহাতে তাহাদের কোন অসদাচরণ দেখি নাই, বরং তাহাদের সদ্ব্যবহার দর্শনে প্রীত হইয়াছি। বিশেষত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের চরিত্রের যেরূপ বর্ণন করিলেন, আমিও লোকপরম্পরায় এইরূপ শুনিয়াছি।" তদনন্তর কৃষ্ণচন্দ্র এ বিষয়ে অনেক যুক্তি ও কারণ দর্শাইলে রাজা মহেন্দ্র ও জগৎশেঠ সম্মত হইলেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ইঙ্গরেজদিগের সহায়তা সাধনের ভার লইয়া শিবনিবাসে প্রত্যাগত হইলেন।

বঙ্গদেশ যে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত, নবাব আলিবর্দ্দি, সিরাজদ্দৌলা ও মীরজাফরের সময়ে তাহার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা এস্থলে কিঞ্চিৎ ব্যক্ত না হইলে সিরাজদ্দৌলার অত্যাচার হইতে দেশের নিষ্কৃতি সাধনার্থ বৈদেশিক লোকের আনুকূল্যের এত প্রয়োজন হইল কেন তাহা সুস্পষ্ট রূপে অনুভূত হওয়া দুর্ঘট, এই জন্য তাহার অতি সংক্ষিপ্ত বিবরণ পশ্চাৎ বর্ণিত হইতেছে।

সম্রাট মহম্মদ সাহার রাজত্ব কালে, এই সাম্রাজ্যের প্রায় অর্দ্ধাংশ মহারাষ্ট্রীয়দিগের অধিকৃত হইয়াছিল। আর্য্যাবর্ত্তের কতিপয় দেশ মাত্র তাঁহার সম্বল ছিল; কিন্তু ঐ সকল দেশও সম্পূর্ণরূপে বশীভূত ছিল না। তাহার উপর আবার অতীব দুর্দান্ত ও পরাক্রমশালী পারস্যাধিপতি নাদের সাহা আসিয়া তাঁহাকে সংগ্রামে পরাভূত করিয়া তদীয় যথাসর্ব্বস্ব হরণ করেন, এবং ১৭৩৮ খৃঃ অব্দাবধি ১৭৪০ অব্দ পর্য্যন্ত, তাঁহার রাজ্য পীড়ন ও লুণ্ঠন করিতে থাকেন। নাদের স্বদেশে প্রস্থান করিলে, প্রদেশ শাসন কর্ত্তাদিগের মধ্যে অনেকেই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে লাগিলেন। ১৭৪৮ খৃঃ অব্দে, সম্রাট পরলোক যাত্রা করিলে, তদীয় পুত্র আহম্মদ সাহা পিতৃ-সিংহাসনারূঢ় হইলেন। অবশিষ্ট যে কিছু রাজ্য ছিল, তাহাও ইহাঁর সময়ে হস্তবহির্ভূত হইল। অবশেষে তাঁহার সর্ব্বাধিকারী, ১৭৫৪ খৃঃ অব্দে, তাঁহাকে অন্ধ করিয়া, রাজকুলোদ্ভূত অন্য এক ব্যক্তিকে আলমগির নামে বিখ্যাত করিয়া তাঁহার সিংহাসনে আরোহিত করাইলেন। অনতিবিলম্বেই পারস্য দেশীয় আর এক জন রাজা আসিয়া মথুরা প্রদেশ পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করিলেন। এই সুযোগে যাঁহার যে দেশ আয়ত্বাধীন হইল, তিনি সেই দেশ অধিকার করিয়া লইলেন। এই সময়ে, বঙ্গদেশের নবাব আলিবর্দ্দি খাঁ সম্রাটের বশ্যতা শৃঙ্খল ছিন্ন করিয়া স্বাতন্ত্র্য

অবলম্বন করিলেন, এবং তিনি লোকান্তরবাসী হইলে, তাঁহার উত্ত-রাধিকারিগণও তদীয় দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইলেন। সাম্রাজ্য এক-কালে উৎসন্ন হইয়া গেল।

তদনন্তর, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, পূর্ব্বোল্লিখিত মন্ত্রণানুসারে কিছু দিন পরে কালীঘাট দর্শনচ্ছলে কলিকাতায় আগত হইলেন, এবং তদানীন্তন ইঙ্গরেজদিগের অধ্যক্ষ ক্লাইব সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, সেরাজদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে তৎ-পদে অভিষিক্ত করিবার কল্পনা, ও তদ্বিষয়ে তাঁহারা সহায়তা করিলে তাঁহাদের প্রতিপত্তি ও ইষ্টলাভের বিলক্ষণ সম্ভাবনা এই বিষয় সবিস্তর বর্ণন করিলেন। ইতিপূর্ব্বে নবাব ইঙ্গরেজদিগকে এ দেশ হইতে এককালে বহিষ্কৃত করিয়া দিবার মানসে, প্রথমে, তাঁহাদের উপর বিবিধ প্রকার দৌরাত্ম্য করিতে প্রবৃত্ত ও পরিশেষে, ১৭৫৬ খৃঃ অব্দে, কলিকাতা লুণ্ঠন ও তথাকার দুর্গ আক্রমণ করেন। তৎকালে কলিকাতায় ইঙ্গরেজদের অতি অল্প সৈন্য ছিল, সুতরাং তাঁহারা রণবিমুখ হইয়া পলায়ন করিবার চেষ্টা পাইলেন; কিন্তু সম্পূর্ণরূপে কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না। তাঁহারা ঐ সময়ে, এরূপ ভীত ও ব্যতিব্যস্ত হইয়াছিলেন যে সকলে উঠিতে না উঠিতে নাবিকেরা নৌকা খুলিয়া দিল। যাঁহারা পলাইতে পারিলেন না, তাঁহারা ২০এ জুন শত্রুহস্তে পতিত হইলেন। রজনীতে দুর্গান্তর্গত অন্ধ-কূপ নামে একটি ক্ষুদ্র গৃহে তাঁহাদিগকে রাখা হইল। ঐ গৃহ মধ্যে বায়ু সঞ্চারের ভাল পথ না থাকায় তাঁহাদের যাতনার সীমা রহিলনা। পরদিন প্রাতে দৃষ্ট হইল, ১৪৬ জনের মধ্যে কেবল ২৩টি লোকমাত্র জীবিত আছেন। মাদরাজবাসী ইঙ্গরেজেরা এই নিদারুণ ঘটনার সম্বাদ পাইয়া

ক্লাইব নামক সুবিজ্ঞ ও সাহসী পুরুষকে ২৪০০ সৈন্য সহিত বাঙ্গালায় পাঠাইলেন। ক্লাইব ডিসেম্বর মাসে মায়াপুরে পঁহুছিলেন এবং ১৭৫৭ খৃঃ অব্দের ২ রা জানুয়ারি নবাব সৈন্যকে পরাভব পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কলিকাতা অধিকার করিলেন, ও নবাবের সহিত সন্ধিবন্ধনের যত্ন পাইতে লাগিলেন; কিন্তু দুর্বুদ্ধি ও দুর্বৃত্ত নবাবের রাজ্যে তাঁহাদের নিরাপদে থাকিবার কোন সম্ভাবনা নাই, ইহা বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন। তিনি যতই বিচক্ষণ ও দূরদর্শী হউন না কেন, এদেশ যে, যবন বা হিন্দু জাতির হস্ত বহির্ভূত হইয়া তাঁহার স্বজাতির হস্তগত হইবে, এরূপ আশার ছায়াও কখন তাঁহার হৃদয়ে পতিত হয় নাই। তিনি এইমাত্র ভাবিয়াছিলেন যে, নবাবের অত্যাচারে লোকের যেরূপ কষ্ট হইয়াছে, তাহাতে অনতিবিলম্বে তদীয় রাজ্যাবসান হইবে, এবং কোন এক সুবিজ্ঞ ও সুহৃদয় ব্যক্তি তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন। যাহা হউক, কৃষ্ণচন্দ্রের প্রস্তাব শ্রবণ মাত্র তাঁহার মনোমধ্যে যুগপৎ আনন্দ ও বিস্ময় উপস্থিত হইল। তাঁহার সভাসদেরা, এক সামান্য বণিক্ সম্প্রদায়ের কোন রাজ্যেশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করিবার যত্ন পাওয়া, আর বামনের চন্দ্র ধরিবার চেষ্টা করা, এ দুই অসাধ্যসাধন মনে করিয়া, এ বিষয়ে বিশেষ অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ক্লাইব যেমন অসীমসাহসী তেমনই অসাধারণ দূরদর্শী ছিলেন। তিনি, তাঁহাদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করিয়া, এবিষয়ের যথাযথ মন্ত্রণা করিতে মুরশিদাবাদের রেসিডেণ্ট-কে লিখিলেন। কি কর্ত্তব্য স্থির করিতে, এপ্রেল ও মে দুই মাস অতিবাহিত হইল। ক্লাইব সাহেব, ১৭৫৭ অব্দের ১৭ জুন, সসৈন্য কাঁটোয়াতে উপনীত হইলেন। ২২ এ জুন, ভাগীরথী পার হইয়া রজনীতে পলাশীর উপবনে পঁহুছিলেন। প্রভাত

হইবামাত্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল। মীরজাফর স্বীয় সৈন্য সমভিব্যাহারে রণস্থলে উপস্থিত ছিলেন; কিন্তু সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন না। নবাব এ যুদ্ধে জয়ী হইবেন সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন; এজন্য, নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে শিবির মধ্যে চাটুকারদিগের সহিত আমোদে কালহরণ করিতে লাগিলেন। মীরমদন নামক তাঁহার এক জন সেনানী সাংঘাতিক রূপে আহত হইয়া তাঁহার সমীপে নীত হইলেন, এবং অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করিলেন। তদ্দর্শনে নবাব আপন ভৃত্যবর্গকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া সন্দেহ করিতে লাগিলেন। অতীব ব্যাকুলিত চিত্তে তৎক্ষণাৎ মীরজাফরকে ডাকাইয়া, এবং তাঁহার চরণে স্বীয় উষ্ণীষ স্থাপন পূর্ব্বক, অতি কাতর বচনে কহিলেন "তুমি, আমার মাতামহকে স্মরণ পূর্ব্বক, আমার অপ-রাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে রক্ষা কর।" মীরজাফর কপট মিত্রতা প্রদর্শন করিয়া উত্তর করিলেন, অদ্য অধিক বেলা হইয়াছে, সংগ্রামে বিরত হইবার আদেশ করুন, কল্য ঈশ্বরপ্রসাদে যথোচিতরূপে যুদ্ধ করা যাইবেক। ঐ সময়ে, মোহনলাল নামে নবাবের আর এক জন সেনাপতি ইঙ্গরেজদের সহিত ঘোরতর সংগ্রাম করিতেছিলেন, নির্ব্বোধ নবাব, জাফরের বিশ্বাসঘাতী পরামর্শে প্রতারিত হইয়া, তাঁহাকে যুদ্ধে নিবৃত্ত হইতে অনুজ্ঞা পাঠাইলেন। সেনাপতি নিতান্ত অনিচ্ছাপূর্ব্বক সমরক্ষেত্র হইতে প্রতিগমন করিলেন। তাঁহাকে যুদ্ধে বিরত হইতে দেখিয়া সমস্ত সৈন্য রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল। সুতরাং ক্লাইবের অনায়াসে জয়লাভ হইল; নবাব দ্রুত বেগে মুর্শিদাবাদে চলিয়া গেলেন। পর দিবস, তাঁহার অমাত্য বান্ধব ভৃত্য প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া গেল। তিনি রজনীযোগে নগর হইতে পলায়ন করিলেন, এ দিকে, সংগ্রামাবসানে, মীরজাফর ক্লাইবের সহিত মুর্শিদাবাদে

যাত্রা করিলেন, এবং নগরে উপনীত হইয়া দুর্ভাগ্য সেরাজ-দ্দৌলার শূন্য সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন।

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

বঙ্গদেশের ইতিহাস লেখক বিখ্যাত জন মার্শম্যান সাহেব তদীয় বাঙ্গালার ইতিহাস মধ্যে লিখিয়াছেন "এ দেশে সেরাজ-দ্দৌলার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য, হিন্দুজমীদারগণের ইঙ্গরেজদিগকে আহ্বান করিয়া আনিবার যে এক কথা আছে তাহা সম্পূর্ণ অমূলক। বর্দ্ধমান, নদীয়া, রাজসাহী প্রভৃতি কোন প্রদেশের জমীদার নিশ্চয়ই এই রাজবিপ্লবের কোন সংস্রবে ছিলেন না, তাঁহারা করসংগ্রাহক মাত্র ছিলেন; সুতরাং, এ বিষয়ে তাঁহাদের হস্তার্পণ করিবার কোন অধিকার ছিল না। সম্রাটের কোষাধ্যক্ষ পরাক্রান্ত শেঠবংশীয়েরা, সৈন্য-দিগের ধনাধ্যক্ষ ও সেনাপতি মীরজাফর, এবং উমিচাঁদ ও খোজাবাজীদ নামক দুই জন ঐশ্বর্য্যশালী বণিক্, এই কয়েক ব্যক্তিই সিরাজদ্দৌলাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মীরজাফরকে তৎ-পদে নিবেশিত করণার্থ ক্লাইব সাহেবকে অনুরোধ জানান *।" এস্থলে আমাদিগের বক্তব্য এই যে, এ দেশস্থ ভূম্যধিকারি-গণেরা নবাবকে রাজ্যচ্যুত করিবার নিমিত্ত, ইঙ্গরেজদিগের সহায়তা লাভের যত্ন পান এই যে এক সংস্কার হিন্দুদিগের মনে বদ্ধমূল হইয়া আছে তাহা অপ্রকৃত নহে; বর্দ্ধমান ও রাজসাহী প্রভৃতির রাজারা এই মন্ত্রণার মধ্যে থাকুন বা না থাকুন, নবদ্বীপের রাজা যে উহার মধ্যে ছিলেন না, এ কথা

* Marshman's History of Bengal, p. 162.

আমরা স্বীকার করিতে পারি না। বিশেষতঃ উক্ত ইতিহাস লেখক ঐ চক্রান্তের মধ্যে ভূম্যধিকারীদের থাকিতে না পারার বিষয়ে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন; তাহা আমাদিগের বিবেচনায় সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। আমরা রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সমকালীন লোকের এবং ঐ রাজবংশোদ্ভূত রাজাদিগের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র এই রাজবিপ্লবের প্রবর্ত্তক, মন্ত্রী ও প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। তিনি এই বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ ও উদ্যোগী ছিলেন বলিয়া, এ প্রদেশস্থ প্রাচীন লোকেরা তাঁহাকে নেমকহারাম কহিত; অর্থাৎ যে জাতির অনুগ্রহে তাঁহার বংশের এরূপ আধিপত্য ও গৌরব বৃদ্ধি হয়, সে জাতির অধঃপাত সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহাদের অভিপ্রায়ে নিতান্ত কৃতঘ্নতার কার্য্য হইয়াছিল। এমন কি, যখন ইংরেজদের রাজত্বকালে রাজস্ব সংগ্রহের নিয়মানুসারে, তাঁহার পরপুরুষের জমীদারী নিলাম হইতে আরম্ভ হইল, তখন এতদিনে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের কৃতঘ্নতার ফল ফলিল, এই কথা এপ্রদেশস্থ যাবতীয় লোকের মুখে শুনা গিয়াছিল। বিশেষতঃ যখন ইঙ্গরেজদিগের সহিত নবাব মীরকাসিমের বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা হয়, তখন নবাব কৃষ্ণচন্দ্রকে ইঙ্গরেজদের পক্ষের লোক জানিয়া, তাঁহাকে ও তদীয় পুত্রকে মুঙ্গেরের দুর্গে কারারুদ্ধ করেন, ও পরে তাঁহাদের প্রাণসংহার করিতে আদেশ দেন। ইহার বৃত্তান্ত যথাস্থানে বর্ণিত হইবে।

ইতিহাসের একটী প্রধান মূল জনশ্রুতি। যদি এ স্থানে ঐ জনশ্রুতি এককালে অগ্রাহ্য করিয়া যুক্তিমাত্র অবলম্বনপূর্ব্বক সত্যাসত্য স্থির করা যায়, তাহা হইলেও হিন্দুজাতির উপরোক্ত সংস্কার ভ্রান্তিমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না। নবাব কেবল

জগৎশেঠ, উমিচাঁদ ও খোজাবাজীদ এই কয়েকজন শ্রেষ্ঠীর উপর অত্যাচার করেন এমন নহে; তিনি ভূম্যধিকারিগণের উপরেও যৎপরোনাস্তি দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন। রাজবাটীতে প্রবাদ আছে যে, এমন কি, কৃষ্ণচন্দ্র, এক সময়ে নবাবের অত্যাচার আর সহ্য করিতে না পারিয়া জমীদারী পর্য্যন্ত এস্তফা করিয়াছিলেন। তৎকালে, এ প্রদেশস্থ ভূম্যধিকারীদের মধ্যে এই রাজার সদৃশ বিচক্ষণ ও উদ্যোগী দ্বিতীয় ব্যক্তি কেহ ছিলনা, একথা বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। তাঁহার জমীদারী মুরশিদাবাদ হইতে গঙ্গাসাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। অতএব, ঈদৃশ সমৃদ্ধিশালী ও বুদ্ধিসম্পন্ন ভূম্যধিকারী হইয়া, নবাবের দুর্বিসহ দৌরাত্ম্য নিবারণের চেষ্টা না পাইয়া, নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়াছিলেন, ইহা কোনক্রমে সম্ভাবিত বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহার জমীদারীর প্রায় মধ্যস্থলে ইঙ্গরেজেরা বাস করিতেন। সুতরাং, তাঁহাদের চরিত্রাদি তাঁহার যেরূপ জানিবার সম্ভাবনা ছিল, তদপেক্ষা জগৎশেঠ বা উমিচাঁদ প্রভৃতি বণিকৃদের অধিক জানিবার সম্ভাবনা থাকা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। অতএব ইঙ্গরেজদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে কদাচ কর্ম্ম সিদ্ধ হইবে না, ইহা নবদ্বীপের রাজা কর্ত্তৃক উত্থাপিত হওয়াই নিতান্ত সম্ভাবিত। আর শুদ্ধ করসংগ্রাহক হইলেও রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সদৃশ অবস্থাপন্ন ও অতীব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তির এরূপ মন্ত্রণার মধ্যে থাকা যে অসম্ভব ইহা কোনক্রমেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না।

উক্ত সাহেব তাঁহার প্রণীত বাঙ্গলার ইতিহাস মধ্যে আর এক স্থানে লিখিয়াছেন "নবদ্বীপ, রাজসাহী ও দিনাজপুরের রাজাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা কেবল করসংগ্রাহক ছিলেন, পরে, নবাব মুরশিদকুলি খাঁ, ১৭২৫ খৃঃ অব্দে, বঙ্গদেশ ১৩ চাকলায়

বিভক্ত করিয়া তন্মধ্যে ভাগীরথীর পূর্ব্ব প্রদেশস্থ ৬ চাকলার কর সংগ্রহ কার্য্যে ভূম্যধিকারিগণকে নিযুক্ত করেন, এইরূপে নবদ্বীপ, রাজসাহী ইত্যাদির রাজাদিগের সৃষ্টি হয়। নবাব, রামজীবন নামক এক ব্রাহ্মণকে রাজসাহী, রামনাথ নামে এক ক্ষুদ্র ভূম্যধিকারীকে দিনাজপুর এবং রঘুরাম নামে এক বিপ্রকে নবদ্বীপ প্রদেশ প্রদান করেন *।" আর এই ইতিহাস লেখক স্বপ্রণীত ভারতবর্ষের পুরাবৃত্তের মধ্যে কোন স্থানে লেখেন, "সম্রাট ফরখ্ সায়রের নিকট, ১৭১৫খৃঃ অব্দে, ইঙ্গরেজেরা কলিকাতার সন্নিহিত ৩৮ খানি গ্রাম ক্রয় করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হন, কিন্তু, নবাব মুর্শিদকুলি খাঁ ইঙ্গরেজদিগকে এক ফুট পরিমাণ ভূমিও প্রদান করিতে জমীদারদিগকে নিষেধ করেন" †। মার্শম্যান সাহেবের লিখনানুসারে এই সকল রাজাদিগের পূর্ব্বপুরুষেরা ভূম্যধিকারী না থাকিবার বিষয় সপ্রমাণ হইলেও তাঁহারা যে ভূম্যধিকারী হইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের যে জমীদারী বিক্রয় করিবার পর্য্যন্ত অধিকার ছিল এ কথা তাঁহার প্রণীত উভয় ইতিহাস দ্বারাই বিলক্ষণ সাব্যস্ত হইতেছে। তথাপি তিনি নবাব সিরাজদ্দৌলার সময়ে, এই রঘুরামের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ও অন্যান্য রাজাকে কেবল করসংগ্রাহক বলিয়া বর্ণন করেন কেন, তাহা অনুভূত হয় না।

এই রাজবংশোদ্ভব রাজা ভবানন্দ অবধি কৃষ্ণচন্দ্র পর্য্যন্ত সপ্তম পুরুষকে দিল্লির সম্রাটেরা জমীদারীর যে সকল ফরমাণ দিয়াছেন, তাহাতে এই রাজারা জমীদার বা চৌধুরী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। (১) যদি তাঁহারা শুদ্ধ করসংগ্রাহক

* The History of Bengal, by J. Marshman, p. 98.

† The History of India by J. Marsman vol. I, p. 222.

(১) এই সকল ফরমাণ অদ্যাপি রাজবাটীতে বর্ত্তমান আছে।

হইতেন, তবে তাঁহারা তহসিল্দার বা চৌধুরী বলিয়া কখনই সম্বোধিত হইতেন না, এবং প্রত্যেক পরগণার জমা পুরুষানুক্রমে একরূপ থাকিত না। রাজারা আপন আপন জমীদারী স্বীয় সন্তান-দিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়াছেন, অপরের জমীদারী ক্রয় করিয়া সম্রাটের নিকট তাহার মঞ্জুরী ফরমাণ লইয়াছেন, বহু ব্যয় স্বীকার পূর্ব্বক জমীদারীর মধ্যে নানা স্থানে বৃহৎ বৃহৎ দীর্ঘিকা ও পুষ্করিণী খনন ও সুবিস্তৃত উদ্যানাদি প্রস্তুত করিয়াছেন, আর অনেক নিষ্কর ভূমিও দান করিয়াছেন। শুদ্ধ তহসিল্দার হইলে, এ সকল কার্য্য কখনই করিতে পারিতেন না। ঈদৃশ দানবিক্রয়ের স্বত্বাধিকারিগণকে কেবল করসংগ্রাহক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যে কত দূর সঙ্গত, ইহা পাঠকবর্গ অনায়াসেই স্থির করিতে পারেন।

এই রাজ বিপ্লব সংঘটন বিষয়ে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের যে বিশেষ যত্ন ও সংস্রব ছিল, তাহার অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। পলাশির যুদ্ধের পর, ক্লাইব সাহেব যে পাঁচটি কামান তাঁহাকে দিয়াছিলেন, সে কয়েকটি অদ্যাপি রাজবাটীতে বর্ত্তমান আছে। ১৮৬০ খৃঃ অব্দের ৩১ আইনানুসারে, যখন, গবর্ণমেণ্ট কামান ও অন্য অন্য অস্ত্রের কর লইবার আদেশ প্রচার করেন, তখন বঙ্গদেশের লেপ্‌টেনেণ্ট গবর্ণর, "নবদ্বীপের মহারাজা সতীশ চন্দ্র রায় বাহাদুরের পূর্ব্ব পুরুষকে পলাশির যুদ্ধাবসানে যে পাঁচটি কামান প্রদত্ত হয়, তাহার কর গ্রহণোত্তর তাঁহাকে প্রত্যর্পন করিতে হইবেক" এই মর্ম্মে, ১৮৬১ অব্দে, নদীয়া বিভাগের কমিশনর সাহেবকে পত্র লেখেন। আর পূর্ব্বে কৃষ্ণচন্দ্রের কেবল মহারাজাবাহাদুর উপাধি ছিল, ক্লাইব সাহেব সম্রাটের নিকট হইতে তাঁহাকে মহারাজেন্দ্র বাহাদুর এই অত্যুচ্চ সম্মানসূচক উপাধির ফরমাণ আনাইয়া দেন। এই ফরমাণ

অদ্যাপি রাজবাটীতে আছে। রাজা কোন বিশেষ উপকার না করিলে ক্লাইব সাহেব কখনই তাঁহার প্রতি ঈদৃশ অনুরাগ প্রদর্শন করিতেন না।

পঞ্চদশ অধ্যায়।

কতিপয় বর্ষানন্তর, কৃষ্ণচন্দ্র এক বিষম সঙ্কটে পতিত হন; কেবল স্বীয় অসাধারণ বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে তাহা হইতে উদ্ধার পান। অভিনব নবাব মীরজাফর, বার্দ্ধক্য বশতঃ রাজ-কার্য্য পর্য্যালোচনায় অশক্ত হইয়া, আপন পুত্র মীরনের উপর রাজ্যের সমস্ত ভারার্পণ করেন। মীরণ অতি অবিজ্ঞ ও দুরাত্মা ছিল। অল্পকাল মধ্যেই তাহার দৌরাত্ম্যে রাজ্যের সমস্ত লোক, যার পর নাই, অসন্তুষ্ট ও জ্বালাতন হইয়া উঠিল। ১৭৬০ খৃঃ অব্দে, বজ্রাঘাতে তাহার আয়ুঃশেষ হয়। নবাব পুত্র-শোকে এক কালে অভিভূত হইলে, তাঁহার জামাতা মীর কাসিম তদীয় সিংহাসনে অধিরোহণ করেন।

এই নবাব বিলক্ষণ বিচক্ষণ ও রাজকার্য্যদক্ষ ছিলেন। তিনি, অনতি-দীর্ঘকাল-মধ্যেই, রাজ্যের অনেক সুশৃঙ্খলা করিলেন, কিন্তু কোম্পানির কর্ম্মচারীদিগের আত্মম্ভরিতায় অতিশয় ব্যতিব্যস্ত হইলেন। তাঁহাদের অন্যায়াচরণ ক্রমশঃ তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিল। তিনি তাঁহাদের আধিপত্য শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হইবার জন্য যত্ন পাইতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে উভয় পক্ষের মধ্যে ঘোরতর বিবাদ ঘটিবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। তিনি, ইঙ্গরেজদিগের আবাস স্থল হইতে দূরবর্ত্তী থাকিবার মানসে, মুর্‌শিদাবাদ পরিত্যাগ করিয়া মুঙ্গেরে রাজধানী করিলেন, এবং সৈন্য সুশিক্ষিত ও কামানাদি বিবিধ অস্ত্র প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। এ দেশস্থ প্রধান ব্যক্তিদিগের

মধ্যে তিনি যাহাদিগকে ইঙ্গরেজের পক্ষ বলিয়া জানিতেন, তাহাদিগকে নানা কৌশলে হস্তগত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। একদা নবাব রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে হুগলিতে আসিতে আদেশ করেন; তদনুসারে রাজা আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শিবচন্দ্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া তথায় সমাগত হন। নবাব তাঁহার সহিত অনেকক্ষণ কথোপকথন করিয়া তাঁহাকে বিদায় দেন। তাঁহারা পিতাপুত্রে শিবপুরের মোহানার সন্নিহিত হইলে, নবাবের এক জন দূত আসিয়া কহিল "মহারাজ নবাব আপনাদিগকে পুনরায়, কি জন্য, ডাকিয়াছেন।" রাজা, এই কথা শ্রবণমাত্র অত্যন্ত ব্যাকুলচিত্ত হইয়া, শিবচন্দ্রকে কহিলেন "এ ডাক ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে না। অমাত্যবর্গ কেহ সঙ্গে নাই, কি করিব, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। কিন্তু পুনর্ব্বার গমন করিলে, যেন কোন বিপদ ঘটিবে, এরূপ মনে লইতেছে।" শিবচন্দ্র বলিলেন "যখন গেলেও অনিষ্ট, না গেলেও অনিষ্ট পাতের সম্ভাবনা আছে, সে স্থলে যাওয়াই ভাল বোধ হইতেছে।" অনন্তর, রাজা স্বয়ং কর্ত্তব্য অবধারণে অসমর্থ হইয়া পুত্রের পরামর্শানুসারেই চলিলেন, এবং অতীব উৎকণ্ঠিত মনে হুগলিতে উপনীত হইলেন। তিনি যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল। তাঁহারা তথায় উপনীত হইবা মাত্র বন্দীভূত এবং বহু-ক্ষেপণী-যুক্ত, অতিদ্রুত-গামী নৌকা যোগে মুঙ্গেরে প্রেরিত হইলেন। তাঁহারা তথায় উত্তীর্ণ হইবামাত্র দুর্গ মধ্যে কারারুদ্ধ হইলেন। এই বিষম বিপদে মুক্তিলাভের জন্য, বহুবিধ যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু কোন মতেই সফলযত্ন হইতে পারেন নাই। অবশেষে সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া কারাবাসে কালযাপন করিতে লাগিলেন। (১)

(১) ইহাঁরা যে রূপে কারারুদ্ধ হন ও যে রূপে রক্ষা পান তাহা

১৭৬৩ খৃঃ অব্দের ১৯এ জুলাই কাটোয়ার সন্নিহিত কোন স্থানে নবাবসৈন্যের সঙ্গে ইঙ্গরেজ সৈন্যের এক যুদ্ধ হইল। যদিও তৎকালে নবাবের সেনারা পূর্ব্বাপেক্ষা যুদ্ধে নিপুণ হইয়াছিল, তথাপি পরাজিত হইল। ২রা আগষ্ট, গড়িয়া নামক স্থানে পুনর্ব্বার এক সংগ্রাম হয়, সে স্থানেও ইঙ্গরেজেরাই জয় লাভ করেন। নবাব এতাবৎ কাল মুঙ্গেরে অবস্থান করিতেছিলেন, স্বীয় সৈন্যের বারংবার পরাজয় সংবাদ পাইয়া স্বয়ং রাজমহলে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু অক্টোবর মাসে নিজেও পরাজিত হইয়া মুঙ্গেরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, ইঙ্গরেজদের সৈন্য তাঁহার পশ্চাতে ধাবমান হইল। যে কারণে সেরাজদ্দৌলা নিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই কারণেই মীরকাসিমের সর্ব্বনাশ ঘটিল। নবাব গর্গিন নামক এক জন রণকুশল আর্মানীকে স্বীয় সৈনাপত্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ সেনাপতির ভ্রাতা কলিকাতায় থাকিতেন, ইঙ্গরেজদের কর্ত্তৃপক্ষ বান্‌সিটার্ট সাহেব তাঁহার সহিত সখ্য করিয়া, গর্গিনকে সপক্ষ করেন, এবং তাঁহারই বিশ্বাসঘাতকতায় নবাবের পরাজয় ঘটে। *

নবাব মুঙ্গের হইতে পাটনায় পলায়ন করিবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তিনি, সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতায় একান্ত বিরক্ত ও ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞানশূন্য হইয়া, বন্দীগণকে বধ করিতে আদেশ দেন। অনেক মাননীয় ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি নানা প্রকারে নিহত হইয়াছিলেন। যে সময়ে মুঙ্গের হইতে নবাবের প্রস্থান করিতেই হইবেক, কৃষ্ণচন্দ্র, সেই সময়টি অবগত

পূর্ব্বে প্রাচীন লোক মুখে ও পরে মহারাজা শ্রীশচন্দ্রের নিকট সবিশেষ সমস্ত শুনা হইয়াছে।

* History of Bengal by J. Marshman p. 19

হইয়া, যাহাতে আপনাদের প্রাণদণ্ডের বিলম্ব ঘটে, তাহারই উপায় দেখিতে লাগিলেন। (১)

যে সময়ে হতভাগ্য বন্দীদিগের প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রকাশ হইবে, তাহার অব্যবহিত পূর্ব্বে পিতাপুত্রে অন্যদিন অপেক্ষা বিশেষ সমারোহ সহকারে পূজায় বসিলেন। তাঁহাদের উভয়েরই গঠন অতি সুন্দর ছিল। বহুদিবসাবধি বন্দী হইয়া থাকায়, তাঁহাদের শ্মশ্রু, কেশ ও নখ সমধিক বাড়িয়াছিল। তাঁহারা সর্ব্বাঙ্গে গঙ্গামৃত্তিকা লেপন এবং গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয় পার্শ্বে পুষ্পপাত্র, ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি নানাবিধ উপচার বিন্যস্ত ছিল। এইরূপে বাহ্য আড়ম্বর প্রকাশ পূর্ব্বক আন্তরিক ভক্তি সহকারে ইষ্টদেবতার পূজা করিতেছেন, এমন সময়ে, প্রহরীরা নবাবের নিষ্ঠুর আজ্ঞা পালনার্থ তাঁহাদিগকে লইতে আসিল। কিন্তু তাঁহাদিগকে দর্শনমাত্র তাহাদের এইরূপ বোধ হইল, যেন দুই দেবর্ষি কারাগারে অবতীর্ণ হইয়া ঈশ্বরের অর্চনা করিতেছেন। তাহারা স্বীয় প্রভুর আদেশ প্রকাশ করিল। রাজা সজলনয়নে ও কাতরবচনে কহিলেন, "বাপু সকল, ক্ষণেক অপেক্ষা কর,

---

(১) জন মার্শম্যান সাহেবের বাঙ্গালার ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে নবাব উদয়নালায় আসিবার কালে এই হত্যাকাণ্ড সমাপন করেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের পরবর্ত্তী পুরুষদিগের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, যে নবাব পাটনায় পলায়ন করিবার সময়ে কৃষ্ণচন্দ্র ও শিবচন্দ্রকে বধ করিতে আদেশ দেন; এস্থলে এমনও অনুমান হইতে পারে যে কতক বন্দিগণকে উদয়নালায় আসিবার সময় ও অবশিষ্ট বন্দীদিগকে পাটনায় গমন কালে হত্যা করিবার আজ্ঞা হয়, অতএব রাজপরিবারদিগের মুখে যে রূপ অবগত হওয়া গিয়াছে তাহাই প্রামাণিক বলিয়া লিখিত হইল।

আমরা জন্মের মত পরমেশ্বরের পূজা করিয়া লই। পূজা সমাপ্ত হইলেই তোমাদের সঙ্গে যাইতেছি।” রক্ষকগণ তাঁহাদের আগমন প্রতীক্ষায় বাহিরে রহিল, তাঁহারা পূজা করিতে লাগিলেন। বিলম্ব দেখিয়া তাহারা ক্রমশঃ বিরক্ত হইতে ও পূজা সমাপ্তির জন্য বারংবার তাড়না করিতে লাগিল, কিন্তু তাঁহাদিগকে পূজার আসন হইতে বলপূর্ব্বক উঠাইতে কাহারও সাহস বা প্রবৃত্তি হইল না। তাহারা যতবার তাড়না করে, ততবারই রাজা নিরতিশয় কাতর স্বরে “এই শেষ হইল, এই শেষ হইল” বলিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত করিলেন। এদিকে এইরূপে বিলম্ব হইতেছিল ও দিকে নবাবের প্রস্থান কাল উপস্থিত হওয়াতে দুর্গ মধ্যে বিষম একটা কোলাহল উঠিল, এবং রক্ষীরা সমধিক ব্যস্তসমস্ত হইয়া প্রস্থান করিল। এইরূপে পিতাপুত্র আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইলেন। এই দিবসে, তাঁহারা যে বেশে যে ভাবে পূজা করিতে বসিয়াছিলেন, তাহার অবিকল প্রতিকৃতি রাজবাটীতে বর্ত্তমান আছে। (১)

রাজার দুই রাজ্ঞী ছিলেন। পিতা বর্ত্তমানে প্রথমা মহিষীর সহিত পরিণয় হয়, কিয়ৎকালানন্তর রূপ লাবণ্যে মোহিত হইয়া কনিষ্ঠা রাজ্ঞীকে বিবাহ করেন। জ্যেষ্ঠা রাণীর গর্ভে শিবচন্দ্র, ভৈরবচন্দ্র, হরচন্দ্র, মহেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্র জন্মেন, এবং কনিষ্ঠা রাজ্ঞীর গর্ভে শম্ভূচন্দ্রের জন্ম হয়। রাজনন্দনদিগের মধ্যে,

---

(১) যে কৌশলে রাজা ও রাজপুত্র আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পান তাহা অনেকের আপাততঃ অলীক বোধ হইতে পারে, কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের যেরূপ অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা এবং নবাবী সময়ের যেমত কার্য্য প্রণালী ছিল তাহাতে এরূপ সঙ্ঘটন হওয়া কিছু মাত্র বিচিত্র নহে। ইহাও অসম্ভব নয় যে এই কৌশলের সঙ্গে সঙ্গে বিলক্ষণ প্রলোভনও প্রদর্শিত হইয়াছিল।

শিবচন্দ্র যেমন শান্তস্বভাব ও পিতৃভক্ত, শম্ভুচন্দ্র তেমনই উদ্ধত ও পিতার অবাধ্য ছিলেন। যৎকালে রাজা ও শিবচন্দ্র মুঙ্গেরে কারারুদ্ধ থাকেন, সে সময়ে শম্ভুচন্দ্র পৈতৃক জমীদারী ও ধনাগার অধিকার করেন; এবং যখন মুঙ্গেরের কারাগারস্থ অপরাপর বন্দীদিগের হত্যা সংবাদ প্রচারিত হয়, তখন পিতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার মৃত্যু ঘোষণা করিয়া দিয়া, বিশেষ সমারোহ পূর্ব্বক পিতৃসিংহাসনে অধিরূঢ় হন। তাঁহাদের মুঙ্গেরে নীত হওয়া অবধি তিনি মনে মনে এই স্থির করিয়াছিলেন যে, তাঁহারা যে করালকবলে পতিত হইয়াছেন, তাহা হইতে আর কখনই তাঁহাদের নিষ্কৃতি সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যখন তাঁহাদের মুঙ্গের হইতে মুর্‌শিদাবাদে আসার সংবাদ প্রচারিত হইল, তখন তিনি, অতীব লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া, স্বীয় দোষ খণ্ডনার্থ নানাবিধ আরোপিত বাক্য বিন্যাস পূর্ব্বক যৎপরোনাস্তি অনুনয়ের সহিত জনক সন্নিধানে পত্র লিখিলেন। রাজা মুনশীর দ্বারা তাহার যথোচিত উত্তর লেখাইয়া স্বাক্ষরের নিম্নদেশে স্বহস্তে এই কয়েক পঁক্তি লিখিলেন যে

> হস্তি শুণ্ডে লক্‌ড়ি দিলে ছাড়ান মস্কিল।
> কুশার ভুমিতে বীজ কাড়ান মস্কিল॥
> মনঃশিলা ভাঙ্গিলে জোড় লাগান মস্কিল।
> জাহাঁদিদা খামিদেরে ভুলান মস্কিল॥

মীর কাসিমের মুঙ্গের হইতে পলায়ন করিবার অনতিকাল পরেই, মীর জাফর, ইঙ্গরেজদিগের সাহায্যে, পুনরায় বঙ্গদেশের অধিপতি হইলেন। কিন্তু অধিক কাল আধিপত্য ভোগ করিতে পারিলেন না। তিনি, ১৭৬৫ খৃঃ অব্দে, পরলোক গমন করি-

লেন। ইঙ্গরেজেরা তাঁহার পুত্র, নজমদ্দৌলার নিকট সমধিক অর্থ গ্রহণ পূর্ব্বক, তাঁহাকে পিতৃসিংহাসনে বসাইলেন, এবং তাঁহার সহিত এক নূতন বন্দবস্ত করিয়া দেশ রক্ষার ভার আপনাদের হস্তে লইলেন। কিছু কাল পরে, আর এক অভিনব নিয়ম নিবদ্ধ করিয়া, রাজ্যশাসনের সমস্ত ভার আপনারা গ্রহণ করিলেন, এবং তাঁহার সাংসারিক ব্যয় নির্ব্বাহের নিমিত্ত, ৫০ লক্ষ টাকা বার্ষিক বৃত্তি নিরূপণ করিয়া দিলেন।

দিল্লীর সম্রাট্ আলমগির সর্ব্বাধিকারী কর্ত্তৃক হত হওয়াতে, তাঁহার পুত্র সাহাআলম পিতৃস্থলাভিষিক্ত হন। তিনি, মীর জাফর ও মীর কাসিমের সময়ে, বাঙ্গালা অধিকার করিবার জন্য কয়েক বার আইসেন; কিন্তু ইঙ্গরেজেরা, নবাবের সপক্ষ হইয়া, তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া দূরীভূত করিয়া দেন। শেষবারে সাহা আলম ইঙ্গরেজদিগের নিকট "তোমরা যখন প্রার্থী হইবে, তখনই তোমাদিগকে বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী দিব" এই অঙ্গীকার করেন। তদনুসারে রাজ্যচ্যুত ও ক্ষমতাশূন্য সম্রাট্, ১৭৬৫ খৃঃঅব্দের আগষ্ট মাসের দ্বাদশ দিবসে, কোম্পানি বাহাদুরকে উক্ত তিন রাজ্যের দেওয়ানী প্রদান করিলেন, ক্লাইব সাহেবও ঐ তিন রাজ্যের রাজস্ব হইতে তাঁহাকে মাসিক দুই লক্ষ টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

ষোড়শ অধ্যায়।

এই দেওয়ানী সনন্দ পাইবার পর, কি রূপে জমীদারীর রাজস্ব বৃদ্ধি হইবেক, কেবল সেই বিষয়েই রাজপুরুষদিগের মন নিবিষ্ট হইল। প্রথমতঃ, তাঁহারা এই সিদ্ধান্ত করিলেন যে,

যবনাধিকারের প্রথমাবস্থায় এই সকল ভূম্যধিকারীর পূর্ব্বাধিকারিগণ কেবল রাজস্ব সংগ্রাহক ছিলেন ; জমীদারীতে তাঁহাদের কিছুমাত্র স্বত্ব ছিল না। শুদ্ধ কর সংগ্রহ কার্য্যে তাঁহাদের বিশেষ দক্ষতা থাকায় এই কর্ম্ম পাইতেন। পরে, জমীদারীর সমস্ত কাগজ পত্র তাঁহাদের পরিবারের হস্তে থাকিত ; এবং তাঁহাদের সন্তানদের জমীদারীর অবস্থা বিশেষরূপে অবগত হইবার সুযোগ হইত। অতএব, তাঁহাদের দ্বারা এই কার্য্য সুন্দর রূপে নির্ব্বাহ হইবে বলিয়া; পিতার মরণের পর পুত্র, পুত্রের মরণের পর পৌত্র, এইরূপে পুরুষানুক্রমে ক্রমান্বয়ে এই কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন ; এবং কাল সহকারে জমীদার হইয়া উঠিতেন *। এক্ষণে যে কেহ অধিক রাজস্ব দিতে সম্মত হইবে, তাহারই সহিত আমরা জমীদারীর বন্দোবস্ত করিব, সর্ব্বত্র এই রূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন। কিন্তু দেশের প্রকৃত অবস্থা অজ্ঞাত থাকায়, ১৭৬৮ খৃঃঅব্দ পর্য্যন্ত, এবিষয়ে কিছুমাত্র কৃতকার্য্য হইতে পারিলেন না ; সুতরাং, এই চারি বৎসর, রাজ্যের সমস্ত কার্য্যের ভার পূর্ব্বমত এ দেশীয় কর্ম্মচারিগণের হস্তেই রহিল। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে, বাঙ্গালার প্রধান প্রধান বিভাগে এক এক জন "সুপর্ বাইজর্" নিযুক্ত হইলেন। ইতি মধ্যে অকস্মাৎ কোম্পানির বাসনা সিদ্ধির এক বিষম ব্যাঘাৎ জন্মিল। যাহার বৃত্তান্ত বর্ণন কালে, অদ্যাপি শ্রোতাদিগের হৃদয় কম্পিত হয়, এরূপ অনপেক্ষিত এক ব্যাপার উপস্থিত হইল। ঐ ভয়ানক ব্যাপার, ১১৭৬ অব্দে সংঘটিত হয় বলিয়া, ছেয়াত্তরের মন্বন্তরা নামে এ প্রদেশে চির প্রসিদ্ধ আছে। ইদানীং ঐরূপ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইলে, তন্নিবন্ধন অনিষ্ট নিবারণার্থ রাজপুরুষেরা যে রূপ যত্ন

* Marshman's History of India vol. I, p. 468.

করিয়া থাকেন, যদি তদানীন্তন রাজপুরুষেরা তাহার শতাংশের একাংশও যত্ন করিতেন, তাহা হইলে, কখনই লক্ষ লক্ষ মনুষ্য, অন্নাভাব জনিত দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া অকালে কাল কবলে পতিত হইত না, এবং দেশেরও এতাদৃশ দুর্দ্দশা ঘটিত না।

ঐ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—১৭৬৮ খৃঃ অব্দে, এ দেশে অল্প পরিমাণে শস্য জন্মে। ১৭৬৯ খৃঃ অব্দে প্রথমে, আশু ধান্যের গাছ উত্তম হয়, কিন্তু শেষে বৃষ্টির অভাবে শুষ্ক হইয়া যায়। হৈমন্তিক ধান্য ও রবি খন্দ এক কালে জন্মে না। নদ নদী সকল শুষ্ক প্রায় হয়, এবং বিল খাল পুষ্করিণী প্রভৃতি জলাশয় একবারে জল শূন্য হইয়া পড়ে। ১৭৭০ খৃঃ অব্দের জানুয়ারি মাস হইতে লোকের কষ্ট আরম্ভ হয়। ফেব্রুয়ারি হইতে অক্টোবর পর্য্যন্ত নয় মাসে, বাঙ্গালার তৃতীয়াংশ অধিবাসীরা অন্নাভাবে প্রাণ ত্যাগ করে, কৃষকদিগের সংখ্যা প্রায় অর্দ্ধেক হইয়া যায়; নয় মাসের মধ্যে প্রায় এক কোটি লোকের মৃত্যু হয়। পূর্ব্বে যে তণ্ডুল টাকায় তিন মন পাওয়া যাইত, ঐ সময়ে টাকায় তিন সের হইয়াছিল। কৃষকেরা, উদরান্নের নিমিত্ত, আপনাদের লাঙ্গল, বিদা, মই প্রভৃতি যাবতীয় কৃষি যন্ত্র, গো মহীষাদি যাবতীয় জন্তু এবং ধান্যাদির বীজ বিক্রয় করে। কেহ কেহ জঠর জ্বালায় দগ্ধ হইয়া নর মাংস পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়াছিল, এরূপও শুনা গিয়াছে। চারি পাঁচ সের তণ্ডুলের বিনিময়ে বালক বিক্রীত হইয়াছে। দেশস্থ সঙ্গতিপন্ন লোকেরা যথাসাধ্য দুঃখীদিগের আনুকূল্য করিয়াছিলেন, কিন্তু ঈদৃশ দুঃসময়ে রাজার যাহা কর্ত্তব্য রাজপুরুষেরা প্রায় তাহার কিছুই করেন নাই। যখন অন্নাভাবে চতুর্দ্দিকে হাহাকার রব উঠিয়াছিল তখন ইঙ্গরেজ বণিকদিগের শস্যাগারে অপর্য্যাপ্ত তণ্ডুল ছিল। কোন অঞ্চল হইতে কলি-

কাতায় তণ্ডুল আসিলে, ঐ বণিকেরা, তাহাও ক্রয় করিয়া লইতেন। যেরূপে হউক মফস্বলের প্রজাদিগের বীজধান্য পর্য্যন্ত কোম্পানির ভৃত্যেরা ক্রয় করিয়াছিল।* দুর্ভিক্ষ নিবারণার্থে নানাবিধ উপায় অবলম্বনের প্রসঙ্গ হয়, কিন্তু কার্য্যে কিছুই ঘটে নাই। কতক রাজস্ব মাফ করিবার কথা হইয়াছিল, কিন্তু, পরিণামে তাহার কিছুই করা হয় নাই। বিশ কোটি লোকের আহারের সংস্থানের নিমিত্ত, কোম্পানি নব্বই ও নবাব সাত চল্লিশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন। কিন্তু, হতভাগ্য অধিবাসীরা ঐ সমস্ত টাকা পাইয়াছিল কিনা সন্দেহ।†

দেশের তৃতীয়াংশ প্রজা নিধন প্রাপ্ত হইল, এবং তৃতীয়াংশ ভূমি পতিত থাকিল, তথাপি রাজ পুরুষদিগের রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার স্পৃহা, এক দিনের জন্যও, ন্যূন হইল না। রাইয়তকে শতকরা ৫৲ টাকা খাজনাও মাফ করা হইল না, বরং পর বৎসরে (১৭৭০, ৭১ অব্দে) শতকরা ১০ টাকার হিসাবে বৃদ্ধি করা হইল। দুর্ভিক্ষের পূর্ব্বে, ১৭৬৮। ৬৯ খৃঃঅব্দে, যে পরিমাণ রাজস্ব আদায় হয়, ১৭৭১ অব্দে, তদপেক্ষা অধিক রাজস্ব রাজকোষে আইসে। যথা ১৭৬৮। ৬৯ অব্দে ১৫২৫৪৮৫৬॥/৪ আদায় হয়, কিন্তু তিন বৎসর গত না হইতেই, ১৭৭১। ৭২ অব্দে, ১৫৭৩৩৬৬০৸৵৯॥ টাকা রাজস্ব ধনাগারে বিন্যস্ত হয়।‡

১৭৭২ খৃঃঅব্দে, কোম্পানি বাহাদুর বঙ্গদেশের সমস্ত জমীদারী ইজারা বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্তহন, এবং ঐ কার্য্য সম্পাদনের নিমিত্ত কমিটী অব সরকেট, নামে এক কমিটী নিযুক্ত করেন।¶

* Hunter's "Annals of Rural Bengal pp. 34, 412, 26,36, 410.
† Do. Do. pp. 420, 23, 37, 38.
‡ Do. Do. pp. 39, 381.
¶ Do. Do. pp 287. 390.

যদিও জমীদারের সহিত ইজারা বন্দোবস্ত করিলে প্রজার পক্ষে মঙ্গল ও রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধা হইবেক, বিশেষতঃ রাজস্ব বাকী পড়িলে জমীদারগণ আপন আপন জমীদারীর মায়া বশতঃ অন্য ইজারদারের ন্যায় পলায়ন করিতে পারিবেন না, এই সকল বিষয় কোম্পানি বাহাদুর অবধারিত জানিয়াছিলেন, তথাচ তাঁহাদের মনোমত রাজস্ব প্রদানে জমীদারগণ অসম্মত হইলে, জমীদারী যে সে ব্যক্তিকে ইজারা দিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

উপরোক্ত কমিটীর সাহেবেরা, সর্ব্বাগ্রে, কৃষ্ণনগরে আসিয়া, নদীয়া জমীদারীর রাজস্ব বন্দোবস্ত করিতে বসেন। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র আপন জমীদারীর যে রাজস্ব দিবার প্রস্তাব করেন, তাহা শুনিয়া কমিটীর সাহেবেরা সাতিশয় রাগান্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং তাঁহার জমীদারী ডাক নিলামে বন্দোবস্ত করিতে উদ্যত হইলেন। * অর্থাৎ যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক রাজস্ব দিতে স্বীকৃত হইবে, তাহার সহিত বন্দোবস্ত করা যাইবে। রাজা নিরুপায় হইয়া অগত্যা কমিটীর প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন, এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শিবচন্দ্রের নামে, ১৭৭৩ অব্দ হইতে ১৭৭৬ অব্দ পর্য্যন্ত, চারিবৎসর মেয়াদে জমীদারী বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে তাঁহার বাৎসরিক যে দুই লক্ষ টাকা মোশাহেরা নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তাহা এই ইজারার জামিনি স্বরূপ রাখা হইল। ইজারা পত্রে এই নিয়ম লিখিত হয়, যে ইজারার খাজানা যে পরিমাণ বাকি পড়িবেক, সেই পরিমাণ টাকা তাঁহার মোশাহেরা হইতে কর্ত্তন করিয়া লওয়া যাইবেক। কমিটী নদীয়া জমীদারী এইরূপে বন্দোবস্ত করিয়া, কাশিমবাজারে প্রস্থান করেন, এবং তথায় অবস্থিতি পূর্ব্বক রাজসাহী প্রভৃতি আর

* Hunter's Annals of Rural Bengal pp. 387, 385.

আর প্রদেশের জমীদারী বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হন। ঐ সকল প্রদেশের জমীদারেরা কমিটীর মনোমত রাজস্ব প্রদানে সম্মত হইয়া আপন আপন জমীদারী বন্দোবস্ত করিয়া লন *। এই ইজারার মেয়াদ গত হইলে, ১৭৭৭ খৃঃ অব্দ হইতে, বৎসর বৎসর নূতন ইজারা বন্দোবস্ত হইতে লাগিল।

সপ্তদশ অধ্যায়।

১৭৮০ খৃঃ অব্দে, (বাঃ ১১৮৭ অব্দ) রাজা, তৎকালীন গবর্ণর জেনেরেল ওয়ারণ হেষ্টিংস সাহেবের নিকট আবেদন পূর্ব্বক তাঁহার এক জন সভাসদ ও এক জন মুনশিকে রাজবাটী লইয়া আসিলেন, এবং তাঁহাদের সমক্ষে বঙ্গভাষায় এক দান পত্র ও পারস্য ভাষায়, এক তফবিজ নামা লেখাইয়া, তাহাতে ঐ সভাসদ সাহেবের ও মুনশির স্বাক্ষর ও মোহর করিয়া লইলেন। বঙ্গ ভাষায় লিখিত ঐ দান পত্রের অবিকল প্রতিলিপি নিম্নে লেখা যাইতেছে।

বাজপেয়ী শ্রীমন্মহারাজা
রাজশ্রী কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুর

প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র রায়
পরম কল্যাণাস্পদেষু।

আমার বয়ঃক্রম যে হইয়াছে তাহাতে এখন সদর মফস্বল

---

* Hunter's "Annals of Rural Bengal pp. 287, 390.

মলুকি কোন বিষয় মামলত যে আমি করি তাহার সময় নহে। পারলৌকিক যে যে ব্যাপার তাহাই আমার কর্ত্তব্য একারণ আপনি স্বচ্ছরূপে মস্তকল মেজাজে এই স্থির করিলাম পুরুষ ক্রমে আপনারদিগের রাজ্য কখন হিস্‌সা হয় নাহি অতএব উখড়া ওগয়রহ আমার সমস্ত জমীদারী ও ঝালরদার পালগী ও নওবৎ প্রভৃতি হুজুরের এনায়তি মরাতব ও ফরমান সাবেক ও দরি যে আছে দরবস্ত আপন খুশি ও রাজি রগবতে তোমাকে সমস্ত লিখিয়া দিলাম. শ্রীশ্রী৺ দেবসেবা প্রভৃতি ও জমীদারী লওয়া জমা খরচ আখরাজাত ও নফা নোকসান সমস্ত তোমারই; তোমার ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রদিগের সহিত এলাকা নাহি প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুক্ত শম্ভুচন্দ্র দেবের পোষ্য অধিক এ কারণ আমার মোশাহেরা সরকারে যে পাওনা আছে তাহার মধ্যে সালিয়ানা পনের হাজার তাঁহার ও প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুৎ মহেশদেবের দশ হাজার ও প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুৎ ঈশানচন্দ্র দেবের দশ হাজার ও ভৈরবচন্দ্র দেবের পুষ্যপুত্র প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুৎ মাধবচন্দ্র দেবের আড়াই হাজার ও হরচন্দ্র দেবের পুষ্যপুত্র প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুক্ত যজ্ঞচন্দ্র দেবের আড়াই হাজার একুনে এই চল্লিশ হাজার টাকা এহাদিগের খরচের নিমিত্ত মোকরর করিয়া দিলাম। এই নিয়ম যে করিলাম ইহার উল্লঙ্ঘন তাঁহারা এবং তুমি কেহ কখন করিবে না, যদি কেহ কখন এ নিয়মের অন্যমত আচরণে উদ্যত হও, তবে লোকত ধর্ম্মত এবং হাকিমানের নিকট সে নামঞ্জুর ইতি সন ১১৮৭ শাল এগার শত সাতাশী শাল তারিখ ৯ জ্যৈষ্ঠস্য।

এইরূপে দান পত্র লিখিয়া দিয়া, ১৭৮১খৃঃ অব্দে, রাজা

শিবচন্দ্রের নামে জমীদারীর রাজসনন্দ প্রাপ্তির উদ্যোগ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ওয়ারণ হেষ্টিংস সাহেবের কর্ত্তৃত্ব কালে, এই সকল ব্যাপার নির্ব্বাহ বিষয়ে তাঁহার প্রধান কর্ম্মসচিব বিখ্যাত গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রভূত ক্ষমতা ছিল। একারণ তাঁহার প্রসন্নতা লাভের জন্য, রাজা বহুতর যত্ন করেন। এরূপও প্রবাদ আছে যে গঙ্গাগোবিন্দের সন্তোষার্থ তদীয় মাতৃশ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ রক্ষার নিমিত্ত, কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার শিবচন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন। ঐ শ্রাদ্ধে, যার পর নাই, সমারোহ হইয়াছিল। শিবচন্দ্র সভাস্থ হইয়া সাতিশয় ঔৎসুক্য-সহকারে কহিলেন "ঠিক যেন দক্ষ যজ্ঞ হইয়াছে।" গঙ্গাগোবিন্দ উত্তর করিলেন "তাহারও অধিক, কারণ সে যজ্ঞে শিবের আগমন হয় নাই।" কৃষ্ণচন্দ্র গঙ্গাগোবিন্দকে সন্তুষ্ট করিতে যত্নের ত্রুটি করেন নাই, কিন্তু তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধির এক বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। রাজবাটীতে প্রথিত আছে, পিতার অবাধ্য কুমার শম্ভুচন্দ্র এইরূপ মনে করিয়াছিলেন যে, পৈতৃক জমীদারীর এক অর্দ্ধাংশ বৈমাত্র ভ্রাতারা পাইবেন, অপরার্দ্ধাংশ তিনি পাইবেন। এই সঙ্কল্প সাধনার্থ রাজ-পুরুষদিগের সহায়তা লাভের নিমিত্ত নানাপ্রকার চেষ্টা করেন। তৎকালে অর্থব্যয় স্বীকার করিতে পারিলে, প্রায় কোন বিষয়-কার্য্যই সাধন করা অসাধ্য হইত না। একারণ, কৃষ্ণচন্দ্র এই দানপত্র লিখিয়া দিবার পূর্ব্বে, পুত্রদিগের মধ্যে ভারি বিবাদ বিসংবাদ ঘটনা নিরাকরণের অভিপ্রায়ে, জমীদারীর দশাংশ শিবচন্দ্রকে, ও ষষ্ঠাংশ শম্ভুচন্দ্রকে দেওয়া স্থির করেন; এবং শম্ভুচন্দ্রও তাহাতে সম্মত হন। এইরূপ বিভাগ বশতঃ অন্য রাজকুমারেরা জমীদারীতে এক কালে নিঃস্বত্ব

হইলেন দেখিয়া, ঐ বিষয়টি নিবারণার্থ মন্ত্রণা করিতে লাগি-লেন। অনন্তর, তাঁহাদের মধ্যে, এক সুচতুর রাজকুমার এক দিবস প্রাতঃকালে শম্ভুচন্দ্রকে ছয় আনির জমীদার বলিয়া সম্বোধন করিলেন। ঈদৃশ সম্বোধনের তাৎপর্য্য কি জিজ্ঞাসিত হইলে, উত্তর করিলেন "যিনি দশ আনা রকম জমীদারী পাইলেন, তিনিই রাজপদ পাইলেন; সুতরাং আপনাকে ছয় আনীর জমীদার বই আর কি বলিয়া সম্ভাষণ করিব।" এই চাতুর্য্যগর্ব্ব বচন শ্রবণে, অহঙ্কৃত শম্ভুচন্দ্রের হৃদয় ক্ষেত্রে ঈর্ষ্যা ও ক্রোধানল এক কালে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিলেন "যেরূপে হয় অর্দ্ধেক রাজ্য লইব। ইহাতে হয় মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন হইবেক।" রাজা তাঁহার প্রতিজ্ঞার কথা শুনিয়া যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও অপ্রীত হইলেন, এবং অনেক চিন্তা করিয়া ঐ দানপত্রের উদ্ভাবন করিলেন।

দানপত্র লেখা হইলে পর, শম্ভুচন্দ্র, যদি জমীদারীর সনন্দ শিবচন্দ্রের নামে হয়, তবে আপনার আশা ভরসার এককালে মূলচ্ছেদ হইয়া যায়, এইরূপ চিন্তা করিয়া গঙ্গাগোবিন্দ সিং-হের শরণাগত হইলেন, ; এবং তাঁহাকে যথেষ্ট অর্থলোভ প্রদর্শন দ্বারা আপন নামে সনন্দ পাইবার একান্ত চেষ্টা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। গঙ্গাগোবিন্দ, রাজার অভীষ্ট পূরণ করেন, কি আপন ইষ্ট সাধন করেন, ইহার সহসা কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া কালহরণ করিতে লাগিলেন। রাজবাটীতে প্রবাদ আছে এই সময়ে রাজা গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে যে এক পত্র লেখেন, তাহাতে স্বহস্তে এই কয়েকটি কথা লিখিয়াছিলেন যে, "পুত্র অবাধ্য, দরবার অসাধ্য, যা করেন গঙ্গাগোবিন্দ"। অনন্তর রাজার দেওয়ান কালীপ্রসাদ সিংহ, গঙ্গাগোবিন্দের

কপট ব্যবহারে অতিশয় বিরক্ত হইয়া রাজাকে এক পত্র লিখেন। এই পত্রে গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অনেক নিন্দার কথা আছে, এই সন্ধান পাইয়া, শম্ভুচন্দ্র, পথিমধ্যে পত্রবাহকের নিকট হইতে পত্র হরণ পূর্ব্বক, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে দেখান। পত্র দেখিবামাত্র সিংহের ক্রোধানল প্রদীপ্ত হইয়া উঠে, এবং তিনি রাজার বিপক্ষতাচরণে কৃতসঙ্কল্প হন। পরদিন, হেষ্টিংস সাহেব ধর্ম্মাসনে আসীন হইবামাত্র, এই রাজার সনন্দের বিষয় উত্থাপন করেন, এবং শিবচন্দ্র বিষয় কার্য্যে নিতান্ত অপটু, শম্ভুচন্দ্র কার্য্যদক্ষ ও বিচক্ষণ, রাজা কেবল পক্ষপাতিতার বশবর্ত্তী হইয়া, প্রথমোক্ত কুমারকে সমস্ত জমীদারী দিবার প্রার্থনা করিতেছেন, এইরূপ অনেক আরোপিত বাক্য বিন্যাস পূর্ব্বক রাজার প্রার্থনা বিফল করিবার বিশেষ যত্ন পান। মন্ত্রি-পরতন্ত্র বিচারপতি, এই কপট বচনে প্রতারিত হইয়া, শম্ভুচন্দ্রের নামে সনন্দ দিবার আদেশ দিলেন।

দেওয়ান কালীপ্রসাদ এই বিষয়ের বিন্দু বিসর্গ কিছুই অবগত ছিলেন না। যেমন প্রত্যহ গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের নিকট যাইতেন, সে দিবসও তেমনি গেলেন। গঙ্গাগোবিন্দ সক্রোধে সেই পত্রের প্রসঙ্গ করত, তাঁহাকে নানা প্রকার কটুকাটব্য বলিয়া গর্ব্বিতভাবে গবর্ণর জেনেরেলের আজ্ঞা ব্যক্ত করিলেন। দেওয়ান নিরতিশয় অবমানিত ও বিষাদিত হইয়া, প্রভুসমীপে আগমন পূর্ব্বক, সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করিলেন। রাজা শুনিয়া যারপরনাই, ক্ষুণ্ন হইলেন, এবং মন্ত্রিবর্গের সহিত ইহার প্রতি-বিধানের পরামর্শ করিতে লাগিলেন। অনেক বিবেচনার পর, তৎকালে কলিকাতা ও হুগলির বাজারে যত বহুমূল্য মুক্তা পাওয়া সম্ভব, তাহা সংগ্রহ করিয়া একছড়া মালা প্রস্তুত করাইলেন। পর-

দিন প্রভাতে হেষ্টিংস সাহেব বায়ু সেবনার্থ নির্গত হইলে, কালী-প্রসাদ মণিকারের বেশে হেষ্টিংস সাহেবের ভবনে উপনীত হইলেন, এবং সাহেবের সহধর্ম্মিণীকে ঐ মুক্তাহার দেখাইলেন। হেষ্টিংসপত্নী এই অপূর্ব্ব মালা সন্দর্শনে মোহিত হইয়া, উহার মূল্য কি জিজ্ঞাসা করিলেন। ছদ্মবেশী মণিকার বলিলেন "মূল্য জানিবার জন্য এত ব্যগ্র হইতেছেন কেন? কিরূপ শোভা হয় একবার গলায় পরিয়া দেখুন।" এই কথা শুনিয়া তিনি ব্যস্ত সমস্ত হইয়া ঐ মালা গলায় পরিলেন, এবং অনিমিষ লোচনে উহার শোভা দেখিতে লাগিলেন। মণিকার সুযোগ পাইয়া "কি সুন্দর দেখাইতেছে, যেন সোণায় সোহাগা হইয়াছে। যেমন সুন্দর আকৃতি, মালা ছড়াটি তাহার উপযুক্ত হইয়াছে।" এইরূপ স্ত্রীজাতির মনোরঞ্জন কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন। তদনন্তর, হেষ্টিংসমহিলা পুনরায় মূল্যের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, কালীপ্রসাদ বিনীতভাবে কহিলেন "ইহার অনেক মূল্য, তবে আপনাকে চল্লিশ হাজার টাকায় এ মালা গাছটি বিক্রয় করিতে পারি।" মেম সাহেব, দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক, মালাগাছটি প্রত্যর্পণ করিতে উদ্যত হইয়া কহিলেন যে "আমার স্বামী এত অধিক টাকা দিবেন না।" মুক্তার মালায় ঐ কামিনীর মন হরণ করিয়াছে, তাঁহার কথায় ও ভাব ভঙ্গীতে এইটি বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়া, কালীপ্রসাদ কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "মালা কণ্ঠ দেশ হইতে মোচন করিবেন না, আপনাকে আমি এ হার উপহার দিতে আসিয়াছি" ইহা বলিয়া আপনার পরিচয় প্রদান, এবং বক্তব্য বিষয়ের আদ্যোপান্ত সমস্ত বর্ণন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ও কাতর বচনে আবেদন করিলেন "আপনার স্বামী, তদীয় মন্ত্রী গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের আরোপিত বাক্যে

প্রতারিত হইয়া, এই অন্যায় করিয়াছেন। এক্ষণে আপনার অনুগ্রহ ব্যতীত মহারাজার উপায়ান্তর নাই।” হেষ্টিংসমহিলা, ইহা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন, এবং হেষ্টিংস সাহেব গৃহাগত হইলে, তাঁহাকে, গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের প্রতারণার আমূল বৃত্তান্ত অবগত করিয়া, রাজার প্রার্থনা সিদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। সাহেব, অনেক তর্কবিতর্কের পর, পত্নীর নির্ব্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া, রাজার প্রার্থনা সিদ্ধ করিতে সম্মত হইলেন। অনন্তর, অনতিবিলম্বে সনন্দ লিখিত হইয়া সাহেবের স্বাক্ষরিত হইল।

জমীদারীর সনন্দ হওয়ার অব্যবহিত পরে, রাজেন্দ্র বাহাদুর, নবাব ও গবর্ণর জেনেরেলের দ্বারা, শিবচন্দ্রকে মহারাজাধিরাজ উপাধি দেওয়াইলেন। তদনন্তর, বহু সমারোহ পূর্ব্বক তাঁহাকে রাজ্যাভিষিক্ত করিলেন। রাজ্যাভিষেক দিবসে যে সভা হয়, তাহাতে প্রায় এপ্রদেশের যাবতীয় রাজন্যবর্গ অথবা তাঁহাদের প্রতিনিধি এবং অধ্যাপক, ব্রাহ্মণপণ্ডিত, কুলীন, কুলজ্ঞ, ভাট প্রভৃতি সমাগত হইয়াছিলেন। শাস্ত্রবিহিত দৈবকার্য্য সমাপনান্তে, রাজা সভাস্থ হইয়া কুমারের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে অধিরোহিত করাইলেন। সহোদরগণের মধ্যে, এক জন তদীয় মস্তকে রাজছত্র ধারণ করিলেন, আর দুই জন চামর ব্যজন করিতে লাগিলেন। তৎপরে, রাজা স্বয়ং শিবচন্দ্রের সম্মুখীন হইয়া রাজ-সম্ভাষণ করিলেন, তদনন্তর, সম্পর্ক বিশেষে কেহ আশীর্ব্বাদ কেহ বা অভিবাদন করিতে লাগিলেন।

শাস্ত্রে নির্দ্দেশ আছে, রাজারা সস্ত্রীক রাজ্যাভিষিক্ত হইবেন। পূর্ব্বে রাজ্যাভিষেক সময়ে, রাজমহিষী সভা মধ্যে সর্ব্ব সমক্ষে সিংহাসনোপরি স্বামীর পার্শ্বে বসিতেন। পরে, ভারতবর্ষ যবনা-

ধিকৃত হইলে, জেতৃদিগের দৃষ্টান্ত অথবা তাঁহাদের ভয়ে, মহিলাগ-ণের লোকসমাজে আগমন এক কালে রহিত হইয়া যায়, কিন্তু শাস্ত্রোক্ত নিয়ম রক্ষার্থ, রাজ্যাভিষেক সময়ে, রাজা রাজসভায় ও রাজ্ঞী অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী গৃহে উপবেশন করিতেন, এক-খানি সুদীর্ঘ বস্ত্রের এক প্রান্ত রাজার অঙ্গে এবং অপর প্রান্ত মহিষীর অঙ্গে সংলগ্ন থাকিত। শিবচন্দ্রও এই প্রকারে সস্ত্রীক রাজ্যাভিষিক্ত হইয়াছিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়।

রাজেন্দ্র বাহাদুর, শেষাবস্থায় নবদ্বীপের নিকট থাকিবার মানসে ১৭৭৪ খৃঃ অব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে, কৃষ্ণনগরের দুই ক্রোশ পশ্চিমে ও নবদ্বীপের এক ক্রোশ পূর্ব্বে অলকানন্দ নদীতীরে, এক স্থানে নানা সুরম্য প্রাসাদ প্রস্তুত করেন, এবং ঐ স্থানের নাম গঙ্গাবাস রাখেন। তথায় এক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে হরিহর নামে এক দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন। জ্যেষ্ঠ কুমারকে রাজপদে নিবেশিত করণানন্তর, ঐ বাটীতে আসিয়া অবস্থিত হইলেন। ছোট রাণী, ও তদীয় পুত্র কুমার শম্ভুচন্দ্র, হরধামের বাটীতে যাইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। কুমার শিবচন্দ্র, অন্যান্য রাজকুমারেরা এবং আর আর রাজপরিবারবর্গ শিবনিবাসেই থাকিলেন। গঙ্গাবাসে যে সকল প্রাসাদ ছিল, সে সমস্তই ভগ্ন ও ভূমিসাৎ হইয়া গিয়াছে; থাকিবার মধ্যে কেবল হরিহরের মন্দির অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। কাল-সহকারে অলকানন্দের গর্ব্ভ মৃত্তিকাপূর্ণ হইয়াছে, ঐ নদী পূর্ব্ব-

কালে খড়িয়া নদী হইতে নিঃসৃত হইয়া ভাগীরথীর সহিত মিলিয়াছিল। ইদানীং কেবল বর্ষাকালে ভাগীরথীর সহিত উহার দক্ষিণাংশের মিলন হইয়া থাকে।

একদা কলিকাতার শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণচন্দ্রের বিলক্ষণ অসদ্ভাব ঘটে। যাঁহারা ঐ অকৌশলের বৃত্তান্ত অজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা অবগত হইলে আমোদিত হইবেন। নবদ্বীপ-নিবাসী, বৈষ্ণব-ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক, সুবিখ্যাত চৈতন্যের ঘোষ ঠাকুর নামে কায়স্থ জাতীয় এক জন শিষ্য ছিলেন। ঐ ব্যক্তি কাঁটোয়ার তিন ক্রোশ দক্ষিণ অগ্রদ্বীপ গ্রামে গোপীনাথের বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চৈতন্যের সঙ্গে থাকিতেন এবং প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে তাঁহার সেবা করিতেন। এক দিন চৈতন্য আহারান্তে মুখশুদ্ধির নিমিত্ত, তাঁহার নিকট হরিতকী চাহিলে, তিনি ভিক্ষা করিয়া একটি লইয়া আইসেন, এবং তাহার অর্দ্ধেক তাঁহাকে দেন। পর দিবস ভোজনান্তে চাহিবামাত্র অপরার্দ্ধ প্রদান করেন। চৈতন্য জিজ্ঞাসিলেন "চাহিবা মাত্র তুমি কোথা হইতে কি রূপে হরিতকী আনিয়া দিলে।" ঘোষ ঠাকুর বলিলেন "যাহার একার্দ্ধ কল্য আপনাকে দিয়াছিলাম, এ তাহারি অপরার্দ্ধ।" এই কথা শুনিয়া চৈতন্য কহিলেন "অদ্যাপি তোমার বিলক্ষণ সঞ্চয়ের ইচ্ছা আছে দেখিতেছি। অতএব, আমার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গৃহে প্রতিগমন কর।" এই নিদারুণ বাক্য শ্রবণে ঘোষ ঠাকুর সজলনয়নে কাতরস্বরে কহিলেন "আমি আপনাকে পুত্র অপেক্ষাও অধিক ভালবাসি; আপনার বিরহে কিরূপে জীবন ধারণ করিব।" চৈতন্য বলিলেন "আমার প্রতি তোমার যেরূপ বাৎসল্য ভাব আছে, শ্রীকৃষ্ণের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেইরূপ বাৎসল্য ভাব প্রকাশ করিও।" ঘোষ ঠাকুর,

অগত্যা, চৈতন্যের সঙ্গ ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। তদনন্তর, তিনি স্বীয় প্রভুর উপদেশানুরূপ এক কৃষ্ণবিগ্রহ নির্ম্মাণ করাইয়া অগ্রদ্বীপে প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তাঁহার নাম গোপীনাথ রাখেন। ঘোষ ঠাকুর গোপীনাথকে যে অপত্যনির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন, গোপীনাথও তাঁহাকে সেইরূপ পিতৃতুল্য জ্ঞান করিয়া শ্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন। অদ্যাপি গোপীনাথ, প্রতিবৎসর বারুণীর পূর্ব্ব চৈত্র মাসে কৃষ্ণপক্ষীয় একাদশী তিথিতে, তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়া থাকেন।

ঐ সময়, অগ্রদ্বীপে সমারোহ সহকারে একটি মেলা হইয়া থাকে, ঐ দিবস তথায় বহুলোকের সমাগম হয়; ঐ সমস্ত লোকে গোপীনাথের পিতৃকৃত্যের আনুকূল্যার্থে অর্থ প্রদান করে। গোপীনাথ পূর্ব্বে, এই পর্ব্ব উপলক্ষে, রাশি রাশি অর্থ পাইতেন, ইদানীং লোকের আর তাদৃশ ভক্তি নাই বলিয়া লাভের অনেক খর্ব্বতা ঘটিয়াছে, কিন্তু তথাপি চারি পাঁচ শত টাকা দ্বারপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অদ্যাপি কলিকাতা মুরশিদাবাদ প্রভৃতি নানা স্থানের দোকানী পশারী বহুবিধ দ্রব্যজাত লইয়া আইসে। মেলা ৫। ৭ দিবস থাকে। অগ্রদ্বীপের অনতিদূরবর্ত্তী কাশীপুর বিষ্ণুতলা গ্রামে ঘোষ ঠাকুরের বাটী ছিল; তাঁহার জ্ঞাতির বংশ অদ্যাপি তথায় আছে। গোপীনাথ ঠাকুরের অধিষ্ঠান বশতঃ অগ্রদ্বীপ হিন্দুদিগের এক প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

প্রথমে, পাটুলির জমীদারেরা অগ্রদ্বীপের ভূস্বামী ছিলেন। পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে গোপীনাথের পিতৃশ্রাদ্ধোপলক্ষে ঐ গ্রামে প্রতিবর্ষে চৈত্র মাসে এক মেলা হইয়া থাকে, এবং নানা দেশীয় লোক তথায় সমাগত হইয়া কয়েক দিন অব-

স্থিতি করে। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পিতা রাজা রঘুনাথের সময়ে, একবার ঐ মেলাতে পাঁচ ছয় জন যাত্রী হত হয়। মুরশিদাবাদের নবাব, এই সংবাদ পাইয়া, অতিশয় কোপ প্রকাশ পূর্ব্বক যাবতীয় জমীদারের উকিলদের জিজ্ঞাসা করেন "ঐ গ্রাম কাহার জমীদারী।" পাটুলির জমীদারের উকিল, নবাবের ক্রোধ ভাব দর্শনে, নিরতিশয় ভীত হইলেন, এবং ঐ গ্রাম তাঁহার প্রভুর, এ বিষয় প্রকাশ পাইলে, পাছে বিষম বিপৎপাত উপস্থিত হয়, এই আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বাগ্রেই কহিলেন "ঐ গ্রাম আমার প্রভুর অধিকারস্থ নহে।" ঐ গ্রামের নিকট বর্দ্ধমান ও নবদ্বীপের রাজাদিগের জমীদারী থাকায়, নবাব তাঁহাদের উকিলগণকে একে একে জিজ্ঞাসা করিলেন "ঐ গ্রাম তোমার প্রভুর কি না?" প্রথমোক্ত রাজার উকিল ঐ গ্রাম তাঁহার প্রভুর জমীদারীর অন্তর্গত নহে, এ কথা স্পষ্টাক্ষরে কহিলেন। শেষোক্ত রাজার উকিল বিলক্ষণ বুদ্ধিমান্ ও সুচতুর ছিলেন। তিনি দেখিলেন, গ্রামের প্রকৃত স্বামীর কর্ম্মচারী প্রভুর স্বত্ব স্বীকারে পরাঙ্মুখ হইলেন, এবং আর কেহই ঐ গ্রামের স্বত্বাধিকার স্বীকারে সাহস করিলেন না, তখন এরূপ অনপেক্ষিত ও অতর্কিতপূর্ব্ব সুযোগ পরিহার করা কোন ক্রমেই বিধেয় নয়, এই ভাবিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, "ধর্ম্মাবতার ঐ গ্রাম আমার প্রভুর অধিকারস্থ, এবং ঐ গ্রামের হত্যাকাণ্ডও সত্য। কিন্তু ঐ মেলাতে এরূপ অসাধারণ জনতা হইয়া থাকে যে, পাঁচ ছয় জন কেন দশ পনের ব্যক্তি গতাসু হইলেও অসম্ভব কাণ্ড বলিয়া বোধ হয় না। লোকের প্রাণ রক্ষার্থে যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম স্বীকার করা হয়, এবং দিবারাত্রি অতিশয় সতর্ক থাকা

যায়, এই নিমিত্তই এত অল্প লোকের প্রাণহানি হয়। ঐ মেলাতে যেরূপ অসাধারণ জনতা হইয়া থাকে, তাহা সভাস্থ কাহারও প্রায় অবিদিত নাই।” উকিলের বাক্যাবসানে, সভাসদ-গণের মধ্যে অনেকেই কহিলেন, “ধর্ম্মাবতার, যাহা শুনিলেন তাহার কিছুই অমূলক নহে।” নবাব “আচ্ছা আমি এবারের অপরাধ মার্জ্জনা করিলাম; কিন্তু বারান্তরে এরূপ ঘটিলে সমুচিত দণ্ড বিধান করিব” এই বলিয়া নিরস্ত হইলেন।

এই অসম্ভাবিত ও অনপেক্ষিত লাভে রঘুরামের সুখের সীমা রহিল না। গ্রাম লাভে যত আহ্লাদ হউক না হউক, গোপীনাথ লাভে তাহার শত গুণ হইল। তিনি অনতিবিলম্বে অগ্রদ্বীপ অধিকার করিলেন, ও মহা সমারোহপূর্ব্বক ঠাকুরের পূজা দিলেন। কিয়ৎকাল পরে ঠাকুরের সেবার্থে কুষ্টিয়া প্রভৃতি কতিপয় গ্রাম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, এবং কুষ্টিয়া গ্রামের নাম গোপীনাথবাস রাখিলেন। এই কালাবধি গোপীনাথ নবদ্বীপের রাজার ঠাকুর বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন।

কৃষ্ণচন্দ্রের বৃদ্ধাবস্থায় রাজা নবকৃষ্ণ ঐ ঠাকুর হরণপূর্ব্বক নৌকা যোগে আপন নিবাস স্থান কলিকাতায় লইয়া যান। নবকৃষ্ণ তৎকালে প্রভূত-প্রভাবশালী ছিলেন, সুতরাং কৃষ্ণচন্দ্র, এই অত্যাচারের অপর কোন প্রতিবিধানে প্রবৃত্ত না হইয়া গবর্ণর জেনেরেলের সমীপে অভিযোগ করিলেন। নবকৃষ্ণ, গোপীনাথ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ নয়, এক উদাসীনের স্থাপিত, উহাতে রাজার কোন স্বত্ব নাই, ইত্যাদি নানা কারণ দর্শাইয়া কৃষ্ণচন্দ্রকে নিরাশ করিবার যত্ন করিলেন। গবর্ণর জেনেরেল, বিনা পক্ষপাতে উভয় পক্ষের প্রদর্শিত সমস্ত কারণ প্রণিধান করিয়া নবকৃষ্ণকে ঐ বিগ্রহ প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ

দিলেন। নবকৃষ্ণ বিচারে পরাজিত হইয়া এক অপূর্ব্ব কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি সুনিপুণ কোন ভাস্করের দ্বারা এরূপ একটি অভিনব মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইলেন যে, ঐ বিগ্রহের সহিত অকৃত্রিম গোপীনাথের আকারগত কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য রহিল না। রাজা এই চাতুরির সংবাদ শ্রবণে যৎপরোনাস্তি ক্ষুব্ধ ও বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন, এবং অতীব ব্যথিত হৃদয়ে ভাবিতে লাগিলেন যে, আমার এত যত্ন ও এত পরিশ্রম বিফল হইল, বুঝিলাম গোপীনাথ আমার উপর নিতান্ত অপ্রসন্ন হইয়াছেন। রাজাকে এই রূপ বিষণ্ণ দেখিয়া, ঠাকুরের পরিচারক সমীপস্থ হইয়া কহিল, মহারাজ আপনি কিছুমাত্র ক্ষোভ ও চিন্তা করিবেন না। আমার চিরসেবিত ঠাকুর আমি অবশ্যই চিনিয়া লইতে পারিব, এই বলিয়া কতিপয় রাজকর্ম্মচারীকে সমভিব্যাহারে লইয়া, নবকৃষ্ণের আলয়াভিমুখে যাত্রা করিল। উপনীত হইয়া দেখিল একাসনে অভিন্ন দুই বিগ্রহ সমাসীন আছেন। পরিচারক প্রথমে বিগ্রহদ্বয়ের আকারের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য অনুভব করিতে না পারিয়া অতিশয় কুণ্ঠিত-চিত্ত হইল। পরে, বিশেষ মনোনিবেশ পূর্ব্বক নিরীক্ষণ করিয়া আপনার ঠাকুর চিনিতে পারিল। ইতিপূর্ব্বে, কাহার ভাগ্যে কি ঘটে জানিতে নাপারায় উভয় পক্ষই যৎপরোনাস্তি উৎকণ্ঠিত ছিলেন, এক্ষণে এক পক্ষ অতীব ক্ষুব্ধ ও লজ্জিত হইয়া, অশ্রু-পূর্ণ-লোচনে অনুতাপ ও বিলাপ করিতে লাগিলেন, পক্ষান্তর আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া হরি হরি ধ্বনি করত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। রাজা নবকৃষ্ণ যে সকল বহুমূল্যে অভরণ ঠাকুরকে দিয়াছিলেন তাহা অদ্যাপি ঠাকুরের অঙ্গে আছে।

ঊনবিংশ অধ্যায়।

কৃষ্ণচন্দ্র ১১৮৯ অব্দের ২২ আষাঢ় (খৃঃ ১৭৮২ অব্দে) ৭৩ বৎসর বয়সে মানব লীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার শরীর সুগঠিত ও গৌরবর্ণ ছিল। তিনি যেরূপ বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ ও কার্য্যদক্ষ, তেমনিই দয়াশীল, ন্যায়বান্ এবং স্বধর্ম্মানুরত ছিলেন। যদিও তাঁহার কোন শাস্ত্রে বিশেষ অধিকার ও পারদর্শিতা ছিল না, কিন্তু সর্ব্বশাস্ত্রেই দৃষ্টি ছিল। শস্ত্র-বিদ্যা ও অশ্ব-চালনায়ও তিনি বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন। যবনদিগের রাজত্ব কালে কি ইঙ্গরেজদের সময়ে, যৌবনাবস্থায় কি বৃদ্ধ দশায়, সকল সময়ে ও সকল অবস্থাতে বহু সঙ্কট-সঙ্কুল ব্যাপারে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার উন্নত মন কখনই এককালে অবনত হয় নাই। চিন্তা ও উৎকণ্ঠা সত্ত্বেও তিনি সর্ব্বদা শাস্ত্রালোচনায় ও আমোদ প্রমোদে কালযাপন করিতেন। তাঁহার গুণিগণ-সমাগম-স্পৃহা যেমন বলবতী ছিল, তিনি তেমনিই তাহা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে এ প্রদেশে বিবিধ বিদ্যা-বিশারদ বহু ব্যক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে নবদ্বীপে ন্যায়শাস্ত্র-ব্যবসায়ী হরি-রাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্ব্ব-ভৌম, প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন; ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবসায়ী গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, রামানন্দ বাচস্পতি, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন; ষড়্-দর্শনবেত্তা শিবরাম বাচস্পতি, রমাবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রুদ্র-রাম তর্কবাগীশ, শরণ তর্কালঙ্কার, মধুসূদন ন্যায়ালঙ্কার, কান্ত বিদ্যালঙ্কার, শঙ্কর তর্কবাগীশ; গুপ্তিপাড়াগ্রামে প্রসিদ্ধ কবি বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, ত্রিবেণীতে জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, শান্তি-

পুরে রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি পণ্ডিতগণ বিরাজমান ছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে কেহ কেহ নিয়ত রাজসন্নিধানে থাকিতেন, অপর পণ্ডিতগণ রাজার আহ্বান মতে উপস্থিত হইতেন। রাজা তাঁহাদিগকে বহু যত্ন ও সমাদর সহকারে রাখিয়া, তাঁহাদের সহিত শাস্ত্র আলাপ করিতেন। তাঁহার সভা নানাজাতি সুগন্ধ-সুন্দর-কুসুম-সুশোভিত উদ্যানের ন্যায়, বিবিধ-গুণ-সম্পন্ন বুধগণে শোভমানা ছিল। নানাদিগ্দেশীয় পণ্ডিতগণ সভায় সমাগত হইয়া নানা শাস্ত্রের আলাপ ও বিচার করিয়া সাতিশয় সন্তোষ লাভ করিতেন। বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার প্রায় নিরন্তর রাজসদনে থাকিতেন; তিনি মধ্যে মধ্যে রাজার প্রসঙ্গানুসারে বিবিধ ভাবের অতীব সুললিত ও শ্রবণ-মধুর কবিতাচয় রচনা করিয়া সকলের মনোরঞ্জন করিতেন। তাঁহার দ্রুতকবিত্ব শক্তিও অতি চমৎকার ছিল। একদা কৃষ্ণচন্দ্র কতিপয় সভাসদ সমভিব্যাহারে নৌকারোহণে কলিকাতায় যাইতেছিলেন। ত্রিবেণী অতিক্রম করিয়া, রাজা পারিষদগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ স্থানে ভাগীরথীর মন্দগতি কেন?" অপর পণ্ডিতগণ এক এক ভাবের কবিতা রচনা করিয়া এই প্রশ্নের উত্তর করিলেন, কিন্তু সে সকল কবিতায় রাজার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হইল না। বাণেশ্বর এই কবিতা রচনা করিলেন যথা;—

সাগরসন্ততিসন্তরণেচ্ছয়া প্রচলিতাতিজবেন হিমালয়াৎ।
ইহ হি মন্দমুপৈতি সরস্বতী-যমুনায়া বিরহাদিব জাহ্নবী॥

অর্থাৎ সাগর সন্ততি উদ্ধারার্থ হিমালয়-নির্গতা বেগবতী গঙ্গা যেন সরস্বতী ও যমুনা সখীদ্বয়ের বিরহ হেতু এই স্থানে মন্দগতি

হইয়াছেন। একদা রাজা বাণেশ্বরকে কহিলেন "কিমদ্ভুতম্" বিদ্যালঙ্কার তৎক্ষণাৎ এই কবিতা দ্বারা প্রশ্নের উত্তর করিলেন যে

শিবস্য নিন্দয়া তু যাত্যজদ্ বপুঃ স্বকীয়কম্।

তদঙ্ঘ্রি পঙ্কজদ্বয়ং শবে শিবে কিমদ্ভুতম্ ॥

অর্থাৎ যিনি শিবের নিন্দাবাদশ্রবণে স্বীয় শরীর পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তাঁহার পাদপদ্মদ্বয় শিবের উপরে স্থাপিত হইয়াছে, ইহা অপেক্ষা আর অদ্ভুত কি? বাণেশ্বরের এইরূপ অনেক কবিতা আছে, কিন্তু গ্রন্থ বাহুল্য ভয়ে এই দুইটি মাত্র লিখিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

বঙ্গভাষার কবিকুলচূড়ামণি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর রাজসভার এক অপূর্ব্ব রত্ন ছিলেন। তিনি ১৬৩৪ শকে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা নরেন্দ্রনারায়ণ বর্দ্ধমান প্রদেশের ভুরসুট পরগণার অন্তর্ভূত পেঁড়ো গ্রামে বাস করিতেন এবং সম্ভ্রান্ত ভূম্যধিকারী ও সঙ্গতিশালী ছিলেন। বর্দ্ধমানের রাজা কীর্ত্তিচন্দ্র বাহাদুরের সহিত বিবাদ ঘটাতে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হন। ভারত কিয়ৎকাল মাতুলালয়ে অবস্থিতিপূর্ব্বক সংস্কৃত ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করেন। তৎপরে, ১৪ বৎসর বয়সে হুগলির সন্নিহিত দেবানন্দপুরগ্রামে পারস্য ভাষা শিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন। পঞ্চদশ বর্ষ বয়ঃক্রমে দুই খানি সত্য নারায়ণের পুঁথি রচনা করেন। ইহার পূর্ব্বে তিনি আর কোন কবিতা রচনা করিয়াছিলেন কি না জানা যায় না। যাহা হউক তিনি কিছু দিন পরে গৃহে প্রত্যাগত হইয়া কিয়ৎকাল বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত রহেন। সে দিকে কিছু সুবিধা না দেখিয়া কটক প্রদেশে গমন করেন, তথায় শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনায়

প্রবৃত্ত হন। কিছু কাল পরে উপার্জ্জনার্থে ফরাসডেঙ্গায় আগমন করেন। এই স্থানে ঘটনাক্রমে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। গুণগ্রাহী রাজা তাঁহার গুণের পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আইসেন, এবং অতি যত্নপূর্ব্বক রাখেন। অনতিদীর্ঘকাল মধ্যে তাঁহার অসাধারণ কবিত্বশক্তি দেখিয়া তাঁহাকে অন্নদামঙ্গল গ্রন্থ রচনা করিতে বলেন, এবং তাঁহাকে রায় গুণাকর উপাধি দেন। কিয়ৎকালানন্তর তাঁহার প্রার্থনানুসারে তাঁহাকে মূলাজোড়গ্রাম ইজারা, ও তথায় বাসস্থানের জন্য কিয়ৎ পরিমাণ ভূমি দান করিয়াছিলেন। এই সময়ে বর্দ্ধমানাধিপতি তিলকচাঁদের জননী মহারাষ্ট্রীয়গণ কর্ত্তৃক নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া আপন পুত্র সমভিব্যাহারে মূলাজোড়ের সন্নিহিত কাউগাছি গ্রামে আসিয়া বাস করেন এবং নবদ্বীপাধিপতির নিকট আপন কর্ম্মচারী রামদেব নাগের নামে প্রথমোক্ত গ্রামের তালুকদারী পাট্টা লন। ঐ নাগ গ্রামবাসীদিগের উপর অতিশয় উৎপাত করাতে, ভারতচন্দ্র অষ্টশ্লোকাত্মক নাগাষ্টক প্রবন্ধ রচনা করিয়া রাজসমীপে প্রেরণ করেন। রাজা শ্লোক পাঠে সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া নাগের বিষদন্ত ভাঙ্গিয়া দেন। ভারত চন্দ্র ১৬৮২ শকে (১৭৬০) লোকান্তর গমন করেন। তিনি যেমন সুরসিক তেমনিই শুদ্ধাচারী ছিলেন।

ভারতচন্দ্র যে সময়ে অন্নদামঙ্গল রচনা করেন, তৎকালে বঙ্গভাষার যেরূপ হীনাবস্থা ছিল, তাহাতে তিনি যে কি রূপে অমন বিশুদ্ধ ও সুমিষ্ট ভাষা বিন্যাস করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা ভাবিতে গেলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। তাঁহার রচনা অতি সুললিত, মধুর এবং প্রাঞ্জল। তাঁহার কবিতা পাঠ বা

শ্রবণ করিলে যেমন অনায়াসে অর্থ বোধ হয় তেমনিই হৃদয় কন্দর আনন্দরসে প্লাবিত হইতে থাকে। গোলাব পুষ্প সন্নিহিত হইবা মাত্র যেমন সহসা দর্শন ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় পরিতৃপ্ত হয়, তেমনিই ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল পাঠে ও শ্রবণে হৃদয়ে ও শ্রুতিযুগলে তৃপ্তিসুখের সঞ্চার হয় (১)।

এই রাজার সময়ে নবদ্বীপ অধিকার মধ্যে হালিসহর পরগণার অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে বৈদ্যজাতীয় রামপ্রসাদ সেন নামক এক জন বাঙ্গালা কবি প্রাদুর্ভূত হন। তৎকালে ঐ স্থানে সংস্কৃত ভাষার বিলক্ষণ অনুশীলন ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র ঐ কবির গুণ ও চরিত্র অবগত হইয়া যথেষ্ট অনুরাগ প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে রাজসভায় রাখিতে যত্ন পান; কিন্তু রামপ্রসাদের কিছু মাত্র বিষয়ানুরাগ না থাকায় বিফলযত্ন হন। রাজা মধ্যে মধ্যে তাঁহার অনেক আনুকূল্য করিতেন এবং তাঁহাকে কবিরঞ্জন উপাধি দিয়াছিলেন। রামপ্রসাদ কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন, এবং বিদ্যাসুন্দর নামে তিন খানি কাব্য রচনা করেন। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই বিদ্যাসুন্দর অবলম্বন করিয়া ভারতচন্দ্র তদীয় বিদ্যাসুন্দর রচনা করিতে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু রাজবাটীতে এরূপ প্রবাদের কোন প্রসঙ্গ নাই। ভক্তিরস-পূর্ণ যে সকল সুমধুর সংগীত রামপ্রসাদী গান বলিয়া এ প্রদেশে প্রচলিত আছে, তাহা এই রামপ্রসাদের রচিত। ইনি একজন সিদ্ধপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন।

১। অন্নদামঙ্গলের কোন কোন স্থানে রাধানাথের নামে ভণিতা আছে। ঐ ভণিতা দৃষ্টে অনেকেই অনুমান করেন যে রাধানাথ ভারতেরিই নামান্তর হইবে; কিন্তু বাস্তবিক তাহা নয়। রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের রাশিনাম রাধানাথ।

রাজসভায় মুক্তারাম মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভাঁড়, এবং হাস্যার্ণব নামে তিন ব্যক্তি অসাধারণ রসিক ও পরিহাসক ছিলেন। তাঁহাদের রহস্য বাক্যে ও সরস উত্তরে, সকলেই নিরতিশয় আমোদিত হইতেন। তাঁহাদের যে দুই একটি কথা অদ্যাপি এ প্রদেশে প্রচলিত আছে, তাহা শুনিলে সকলেরিই আমোদ হয়। মুক্তারামের বাসস্থান বীরনগর। তাঁহার সহিত রাজার কোন বিশেষ সম্পর্ক ছিল না; কেবল সুরসিক বলিয়া, রাজা তাঁহাকে বৈবাহিক সম্বোধন পূর্ব্বক তাঁহার সহিত পরিহাস করিতেন। যথা, বীরনগরে কোন দুষ্ট লোকে কৌশলে অন্য এক ব্যক্তির স্ত্রী বিক্রয় করাতে, রাজা তাঁহাকে জিজ্ঞাসেন। "মুখুয্যে তোমাদের ওখানে নাকি বউ বিক্রীত হয়।" তিনি উত্তর করেন "হাঁ মহারাজ, গত মাত্রেই।" মুক্তারাম এক দিবস মহারাজকে মাগুড় মৎস্য উপহার দেন। আহারানন্তর, রাজা তাঁহাকে কহেন, "মুখুয্যে, তুমি যাহা পাঠাইয়াছিলে, তাহার অন্ত নাই।" তিনি বলিলেন "মহারাজ, যাহার অন্ত নাই, তাহার আদিও নাই।" রাজা, এক দিন প্রত্যূষে, তাঁহাকে দেখিয়া কহেন, "মুখুর্য্যে, গত রাত্রে স্বপ্নে দেখিয়াছি, যেন তুমি বিষ্ঠার হ্রদে ও আমি পায়সের হ্রদে পড়িয়াছি।" তিনি উত্তর করেন, "ধর্ম্মাবতার, আমিও ঐরূপ স্বপ্ন দেখিয়াছি। কেবল বিশেষ এই, যেন হ্রদদ্বয় হইতে উত্থান করিয়া, আমরা পরস্পরের গাত্র লেহন করিতেছি।"

গোপাল ভাঁড় নরসুন্দর জাতীয় এবং শান্তিপুর নিবাশী। তাহার বংশ বিলুপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে তাহার ভিটায় অন্য এক জন ক্ষুরিজাতীয় বাস করিতেছে। এই গোপালের রহস্যকারিতা শক্তি প্রদর্শনার্থ দুইটি বিষয় মাত্র বর্ণিত হইল। যথা, তাহার একটি পুত্র অতিরূপবান ছিল। সে ঐ তনয়কে,

এক দিবস, রাজসমীপে লইয়া গেলে, রাজা কহিলেন, যে বা, এ যে রাজপুত্র দেখিতেছি। ঐ রসজ্ঞ, তৎক্ষণাৎ, পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া, মুখচুম্বন পূর্ব্বক কহিল "ধন্য তুই। তোর কল্যাণে আজ আমি রাজপুত্রের বাপ হইলাম।" একদা, মুরশিদাবাদে রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ও অন্য অন্য অনেক রাজা যখন নবাবের সভা হইতে বহির্গত হন, সেই সময় বেগমেরা গবাক্ষদ্বারদিয়া তাঁহাদিগকে দেখিতেছিলেন। গোপাল রাজার সঙ্গে ছিল, সে ঐ গবাক্ষ দিকে বারম্বার কটাক্ষ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে, এই বিষয় নবাবের গোচর হইলে, তিনি, অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া, তখনই রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট লোক পাঠাইলেন। রাজা বৃত্তান্ত শুনিবামাত্রে এ নিঃসন্দেহ গোপালের কাণ্ড বুঝিতে পারিয়া অতিশয় চিন্তিত হইলেন। গোপাল জিজ্ঞাসিত হইবামাত্র নির্ভয়চিত্তে কহিল, "ধর্ম্মাবতার, এত বড় মহৎকর্ম্ম আর কাহার দ্বারা হইবার সম্ভাবনা? ঠাকুর কিছু মাত্র চিন্তিত হইবেন না" এই বলিয়া নবাব দূতের সঙ্গে যাত্রা করিল। ইতি মধ্যে, নবদ্বীপের রাজার লোক নবাব-মহিলাগণকে কটাক্ষ করিয়াছে, এবং সেই অপরাধে তাহার প্রাণদণ্ড করণার্থ তাহাকে দূতগণ লইয়া যাইতেছে, নগরের সর্ব্বত্র এই রূপ জনরব হইয়া উঠিল। সুতরাং যখন গোপালকে নবাবভবনে লইয়া যায়, তখন তৎপশ্চাতে বহুতর লোক ধাবমান হইল। অনন্তর গোপাল, নবাবনিকটে নীত হইলে, সভাস্থগণের মধ্যে যাঁহারা তাহাকে জানিতেন, এই বার ভাঁড় ভাঙ্গিল, এই মত ভাবিতে লাগিলেন। নবাব লোহিত লোচনে তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিবামাত্র, সে প্রথমতঃ তাঁহাকে কয়েকবার কটাক্ষ করিল, ও তৎপরে সকলেরই প্রতি ঐ রূপ করিতে লাগিল। নবাব, তাহার

চক্ষুভঙ্গিমা স্বাভাবিক ভাবিয়া, অতিশয় লজ্জিত হইলেন, এবং ঈষৎ হাস্য করত তাহাকে বিদায় দিলেন।

হাস্যার্ণব বিল্লপুষ্করিণী নিবাসী ও বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ। তাঁহার অসাধারণ রহস্যকারিতা শক্তি প্রযুক্ত রাজা তাঁহাকে এই নামে বিখ্যাত করেন। তাঁহার নকল করিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি যে ভাষা কিছুমাত্র জানিতেন না, সে ভাষায় কেহ কোন কবিতা পাঠ অথবা কথোপকথন করিলে, তিনি সেই ভাষায় এমন চমৎকার অনুরূপ করিয়া কবিতা আওড়াইতেন বা উত্তর প্রত্যুত্তর করিতেন যে, অপরিচিত ব্যক্তির যদিও তাহার অর্থগ্রহ হইত না তথাপি তিনি যে নকল করিতেছেন সহসা ইহা কোন প্রকারেই তাঁহার বোধগম্য হইত না। তিনি এরূপ আশ্চর্য্য কৃত্রিম সংস্কৃত বা অন্য কোন ভাষায় অপরিচিত পণ্ডিতগণের সহিত বিচার করিতেন যে, তৎশ্রবণে শ্রোতৃদিগের আমোদের অবধি থাকিত না।

বঙ্গদেশ মধ্যে সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে যে, রাজা বিক্রমাদিত্যের পর, ভারতবর্ষে স্বাধীন বা অধীন কোন রাজার সভা, রাজা কৃষ্ণ-চন্দ্রের সভার সদৃশ দৃষ্টিগোচর হয় নাই।

কৃষ্ণচন্দ্র আত্মীয় স্বজন এবং গুণিজনদিগকে অকাতরে অর্থ প্রদান ও ভূমিদান করিয়াছেন। তাঁহার নাম অদ্যাপি বঙ্গরাজ্যের সর্ব্বত্র সম্মান ও আদরের সহিত পরিগৃহীত হইয়া থাকে। তিনি অগ্নিহোত্র ও বাজপেয় নামে দুই যজ্ঞ করেন। প্রবাদ আছে যে, এই দুই যাগ সম্পাদনার্থ বিংশতিলক্ষ টাকা ব্যয়িত হয়। স্বাধীন রাজা ব্যতীত কোন জমীদার রাজা এই সকল যজ্ঞ করিয়াছেন, এরূপ শ্রুতিগোচর হয় নাই।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, যত দূর বুদ্ধিমান্, বিচক্ষণ ও সাহসী হউন,

স্বদেশের কোন কলুষিত ব্যবহার পরিশুদ্ধ করণে কখন হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহার সময়ে এ প্রদেশে যেরূপ সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতগণ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, এবং তিনি যেমন শাস্ত্রজ্ঞ ও সুবিজ্ঞ বলিয়া বিখ্যাত ছিলেন, আর তৎকালীন হিন্দুসমাজের উপর তাঁহার যে প্রকার প্রভুত্ব ছিল, তাহাতে বোধ হয়, তিনি যত্নশীল হইলে, শাস্ত্রবিরুদ্ধ ব্যবহারমূলক অনেক বিগর্হিত রীতি নিরসন, ও হিতজনক রীতি সংস্থাপনে কৃতকার্য্য হইতে পারিতেন। তিনি তাহা না করিয়া বরং যাহাতে ঐ পূর্ব্ব কুরীতি বলবতী থাকে, তৎপ্রতিই সর্ব্বদা যত্ন করিয়াছেন, এবং অন্য কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি স্বদেশের কোন দূষিত ও অহিত ব্যবহার নিরাকরণে যত্নবান্ হইলে, তাঁহার চেষ্টা বিফল করিয়া দিয়াছেন। একাদশী তিথিতে দুঃখিনী বিধবাদিগের পক্ষে উপবাসের অনুকম্প বিধান, তাহাদের অশেষ ক্লেশকর বৈধব্যযন্ত্রণা বিমোচন, অথবা সহমরণ এবং বহুবিবাহ ও বাল্যপরিণয় প্রথা অপনয়ন প্রভৃতি অত্যাবশ্যক বিষয়ে প্রবৃত্ত না হইয়া, কেবল এই তিথিতে, এই মাসে, এই বারে, এই এই দ্রব্য ভক্ষণে নিষেধ ইত্যাদি যৎসামান্য বিষয়েই ব্যাপৃত থাকিতেন। বিক্রমপুর ও নবদ্বীপ প্রদেশের ভদ্র সমাজে অদ্যাপি এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, বিক্রমপুরবাসী প্রসিদ্ধ রাজা রাজবল্লভ, স্বীয় তরুণবয়স্কা তনয়ার বৈধব্য যন্ত্রণা দর্শনে, যৎপরোনাস্তি ব্যথিত হৃদয় হইয়া, বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিবার বিশেষ প্রয়াস পাইয়াছিলেন। বিধবাবিবাহ শাস্ত্র বিরুদ্ধ নহে, ইহার ব্যবস্থা পূর্ব্ব পশ্চিম প্রভৃতি নানা অঞ্চলের পণ্ডিতগণের নিকট সংগ্রহ করিয়া, নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতদিগের ব্যবস্থার জন্য, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সন্নিধানে কতিপয় পণ্ডিত প্রেরণ করেন। রাজবল্লভ, তৎকালে, ঢাকার নবাব ও

প্রভূত-ক্ষমতাশালী রাজপুরুষ ছিলেন। সুতরাং তিনি মনে করিয়াছিলেন "যখন অন্য অন্য অঞ্চলের পণ্ডিতদিগের নিকট অনুকূল ব্যবস্থা পাইয়াছি, তখন রাজা কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করিলে, অনায়াসেই নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতগণেরও নিকট ঐ রূপ ব্যবস্থা পাইব।" তাঁহার প্রেরিত পণ্ডিতেরা রাজবাটীতে উপনীত হইলে, কৃষ্ণচন্দ্র অতীব আদরের সহিত তাঁহাদের অভ্যর্থনা করিলেন, এবং তাঁহাদের প্রভুর অভীষ্ট সাধনে যথাসাধ্য যত্ন করিতে অঙ্গীকৃত হইলেন। তদনন্তর সভাস্থ ও নবদ্বীপস্থ প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে গোপনে রাজবল্লভের প্রেরিত ব্যবস্থা দেখাইলেন। তাঁহারা, ইহা পাঠ করণানন্তর, "এ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ শাস্ত্রসম্মত" কহিলেন। ইহা শ্রবণ মাত্র কৃষ্ণচন্দ্র নিরতিশয় ঈর্ষাদগ্ধচিত্ত হইয়া বলিলেন "এ ব্যবস্থা শাস্ত্র বিরুদ্ধ না হইলেও ব্যবহার বিরুদ্ধ বলিয়া, রাজবল্লভকে নিরাশ করিতে হইবেক। এক জন বৈদ্য জাতীয় যে এই চির অপ্রচলিত ব্যবহার প্রচলিত করিয়া যাইবেন, ইহা কোন মতেই সহনীয় নহে। কিন্তু, এক্ষণে রাজবল্লভের যেরূপ প্রভাব, তাহাতে আমি তাঁহাকে, কোন মতেই, বিরক্ত করিতে পারি না। অতএব তাঁহার সন্তোষার্থ আমি আপনাদিগকে এই ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিবার নিমিত্ত, যৎপরোনাস্তি অনুরোধ করিব, এবং আপনারা অসম্মত হইলে, আপনাদিগের প্রতি তাড়নাও করিব। আপনারা এই কহিবেন যে, মহারাজা বা কাহারও অনুরোধে আমরা, এরূপ ব্যবস্থা দিয়া, পাপগ্রস্ত হইতে পারিব না (১)।"

---

(১) মহারাজা শ্রীশচন্দ্রের মুখে শুনিয়াছি, কৃষ্ণচন্দ্র রাজবল্লভের প্রেরিত ব্যবস্থা পাঠ করিয়া বহু আক্ষেপ করিয়া কহেন, "হায় আমি কেন ইতিপূর্ব্বে এবিষয় সাধনে যত্নশীল হই নাই।"

অনন্তর, পর দিবস রাজবল্লভের পণ্ডিতেরা রাজার সভাস্থ হইলে, রাজা নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতদিগকে কহিলেন, "রাজা রাজ-বল্লভ যে ব্যবস্থা প্রেরণ করিয়াছেন, তাহা অবশ্যই শাস্ত্রসম্মত হইবেক। যদি শাস্ত্রসম্মত নাও হয়, তথাপি, যখন তিনি আমাকে ইহার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, তখন আপনাদিগকে এ ব্যবস্থায় স্বাক্ষর করিতেই হইবেক।" পণ্ডিতেরা, রাজার পূর্ব্ব নির্দ্দেশা-নুসারে, নানা প্রকার আপত্তি উত্থাপন করিয়া, উক্ত ব্যবস্থাতে স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলেন। রাজবল্লভের প্রেরিত পণ্ডিতগণ, নিরাশ হইয়া, স্বদেশে প্রতিগমন করিলেন। রাজবল্লভ কৃষ্ণ-চন্দ্রের চাতুরী বুঝিতে না পারিয়া, এই মহৎ অনুষ্ঠান সাধনে ক্ষান্ত হইলেন (১)।

---

(১) এপ্রদেশে এরূপ কৌতুকাবহ প্রবাদ আছে যে, রাজবল্লভের প্রেরিত পণ্ডিতগণের জন্য রাজবাটী হইতে যে সকল আহারীয় দ্রব্য পাঠান যায়, তৎসঙ্গে একটি মহিষশাবক প্রেরিত হয়। পণ্ডিতেরা মহিষ-শাবক দর্শনে, বিস্মিত হইয়া, রাজার কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করিলেন "এ মহিষবৎস কি নিমিত্ত ?" কর্ম্মচারী উত্তর করিলেন "আপনাদের আহারের নিমিত্ত।" পণ্ডিতগণ কহিলেন "আমরা ইহার মাংস ভক্ষণ করিনা।" কর্ম্মচারী বলিলেন "কেন ? ইহা ভোজন করিতে শাস্ত্রে তো নিষেধ নাই।" পণ্ডিতেরা উত্তর করিলেন "হুঁা শাস্ত্রে নিষেধ নাই বটে কিন্তু এ দেশে এ মাংস ভোজনের ব্যবহার নাই।" কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসিলেন "যখন শাস্ত্রসিদ্ধ স্বীকার করিয়াও ব্যবহার বিরুদ্ধ বলিয়া ইহা ভোজনে পরাঙ্মুখ হইতেছেন, তখন চির অপ্রচলিত ও দেশাচারবিরুদ্ধ বিধবাবিবাহ অপনারা কিরূপে প্রতিপন্ন করিবেন ?" পণ্ডিতগণ নিরুত্তর হইয়া থাকিলেন।

বিংশ অধ্যায়।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের লোকান্তর গমনানন্তর, রাজা শিবচন্দ্র, মেয়াদী বন্দবস্তানুসারে, জমীদারীর অধিকারী থাকেন, এবং কোম্পানির দত্ত যে দুই লক্ষ টাকা মোশাহেরা নির্দ্ধারিত ছিল, তাহা হইতে তাঁহার ভ্রাতৃ ও ভ্রাতুষ্পুত্রগণ, রাজেন্দ্র বাহাদুর কৃত নিয়মানুসারে, বার্ষিক চল্লিশ সহস্র টাকা পাইতেন, এবং অবশিষ্ট তিনি লইতেন। জমীদারীর উৎপন্ন হইতে রাজস্ব পরিশোধনান্তে কি পরিমাণ লাভ থাকিত, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তাঁহার সময়ে, কোন জমীদারের সহিত চিরস্থায়ী বন্দবস্ত হয় নাই। সকলেই আপন আপন জমীদারী মেয়াদী বন্দবস্ত করিয়া আপনাদের অধিকারে রাখিতেন, কিন্তু রাজস্ব বাকী পড়িলে জমীদারী নিলাম হইয়া যাইত। রাজা ভবানন্দের সময়াবধি রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় পর্য্যন্ত এই জমীদারী পুরুষানুক্রমে নিয়তই বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছিল, রাজা শিবচন্দ্রের সময়াবধি ক্ষয় হইতে আরম্ভ হইল। রাজস্ব বাকী পড়াতে, তাঁহার কুবেজপুর পরগণা নিলাম হইয়া গেল। এই রাজা বিষয় কার্য্যে অপটু, বা আলস্য-পরবশ, অথবা অপরিমিতব্যয়ী ছিলেন না; কেবল নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে দেয় রাজস্ব প্রদানে অসমর্থ হওয়াতেই, এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল। রাজবাটীতে প্রবাদ আছে, তিনি, এই পৈতৃক সম্পত্তি রক্ষা করণে অশক্ত হওয়াতে, আপনাকে পাপগ্রস্ত মনে করিয়া, অতীব শোকাকুল হন, এবং ত্রিরাত্রি উপবাসী থাকিয়া, এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন। ১৭৮৮ খৃঃ অব্দে, উৎকট রোগাক্রান্ত হইলে, তাঁহার একমাত্র পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রকে, স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করিয়া, নিম্ন লিখিত দানপত্র লিখিয়া দিলেন। যথা,

প্রাণাধিক প্রিয়তম বাজপেয়ী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র রায়
পরম কল্যাণবরেষু।

আমার অস্বাস্থ্য হইয়াছে বৈদ্যরা কহিলেন এবং আমিও ভাবে বুঝিতেছি এ ব্যাধি হইতে মুক্ত হইব না ৺ পিতাঠাকুর মহারাজেন্দ্র বাহাদুর অনুগ্রহ করিয়া উখড়া ওগয়রহ সমস্ত জমীদারী এবং ঝালরদার পালকি ও নওবত প্রভৃতি হুজুরের এনাতি মরাতব ও সাবেক ও দরি ফরমান ও আছাছা যে আছে সমস্ত আমাকে দিয়া তোমার খুড়াদিগের ও খুড়তিত ভ্রাতাদিগের মোশাহেরার নিয়ম করিয়া দিয়াছিলেন আমি এ পর্য্যন্ত রাজ্য ভোগ করিলাম তুমি আমার এক পুত্র এ সকল বিষয় তোমার সিদ্ধই আছে তথাচ লৌকিক ব্যবহার প্রযুক্ত রাজ্য প্রভৃতি যাহা ৺ঠাকুর আমাকে দিয়াছেন আমিও আপন খুশি ও রেজা-রগবতে তোমাকে সমস্ত লিখিয়া দিলাম, শ্রীশ্রী৺ সেবা প্রভৃতি জমীদারী লওয়া জমা খরচ আখরাজাত ও নফা নোকসান সমস্ত তোমারি আর কাহার সহিত এলাকা নাহি, মোশাহেরা তো এখন কোম্পানিতে সমস্ত ক্রোক ভাবে বুঝিতেছি মোশা-হেরা সমস্ত বহাল থাকিবেক না মোশাহেরা যাহা বহাল হয় তাহা হইতে তোমার খুড়দিগের ও খুড়তিত ভ্রাতাদিগের মোশাহেরা যাহা দিতে কোম্পানির হুকুম হয় সেই মত দিবা, জমীদারীতে তোমার নাম লিখিয়া দিতে শ্রীযুত মে, রিটফরণ সাহেবকে কহিয়া আসিয়াছি হুজুরে আপন নামে আপন জমীদারী লেখাইয়া সদর মালগুজারী করিয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে ভোগ করহ ইতি সন ১১৯৫ সাল ২৯ জ্যৈষ্ঠস্য। (১)

---

(১) রাজবাটীতে এই দানপত্রের যে প্রতিলিপি আছে তাহার অবিকল নকল।

ইত্যাদি।

শ্রীদুর্গানারায়ণ শর্ম্মণঃ
সাং গদখালি।
শ্রীশ্রীকৃষ্ণ নাগ
সাং রঘুনাথপুর।
শ্রীহরিমতি পাল
সাং বৈকুণ্ঠশড়ক।

শ্রীজয়নারায়ণ শর্ম্মণঃ
সাং হরিপুর।
শ্রীহরহিত পাল
সাং শিবনিবাস।
শ্রীরামনাথ শর্ম্মণঃ
সাং গোয়াড়ি।
শ্রীশঙ্কর শর্ম্মণঃ
সাং গোয়াড়ি।

শিবচন্দ্র ১১৯৫ অব্দের আষাঢ় মাসে, (১৭৮৮ খৃঃ অব্দ) ৬০ বর্ষ বয়সে, লোকান্তর গমন করেন। তিনি প্রসিদ্ধ রূপবান্, বিখ্যাত ধার্ম্মিক, অতীব সুশীল, এবং পরম দয়াশীল ছিলেন। সংস্কৃত, আরব্য ও পারস্য ভাষায় তাঁহার বিলক্ষণ পরিদর্শিতা ছিল। তাঁহার সহোদর ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ও ভ্রাতুষ্পুত্রেরা সকলেই তাঁহাকে যৎপরোনাস্তি ভক্তি ও স্নেহ করিতেন। তিনি ও তাঁহার সহোদরগণ প্রভৃতি সকল রাজপরিবারেরা শিবনিবাসে থাকিতেন, কেবল তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র হরধামের বাটীতে অবস্থান করিতেন। শিবচন্দ্র কখন কখন কৃষ্ণনগরের বাটীতেও বাস করিতেন। রাজেন্দ্র বাহাদুরের সময়ে যে সকল পণ্ডিতগণ এতদ্দেশ বিদ্যা-জ্যোতিঃ দ্বারা উজ্জ্বল করিয়াছেন, এ রাজার সময়েও, তাঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই বর্ত্তমান ছিলেন।

একবিংশ অধ্যায়।

রাজাধিরাজ শিবচন্দ্র লোকান্তর গমন করিলে, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র রাজ্যাভিষিক্ত হইলেন। (১) পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, ১৭৭২ খৃঃ অব্দে, বাঙ্গালার সমস্ত জমীদারী, জমীদার বা অন্য লোকের সহিত চারিবৎসরের জন্য, ইজারা বন্দোবস্ত হয়। ঐ মেয়াদ অতীত হইলে, ১৭৮৫ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত, দশ বৎসর, মেয়াদী বন্দোবস্ত হইতে থাকে। এই সকল বন্দোবস্তে কোম্পানির জমীদার, ইজারদার, অথবা রাইয়ত কাহারও মঙ্গল হয় নাই। যাঁহাদের সহিত এবার বন্দোবস্ত হইল, তাঁহাদের সহিত পুনর্ব্বার বন্দোবস্ত হইবেক কি না, ইহার স্থিরতা না থাকাতে, জমীদারের জমীদারী বা রাইয়তের অবস্থার উন্নতি সাধনে যত্ন রহিল না, এবং রাইয়তেরাও আপন আপন জমীদারের বশবর্ত্তী থাকিল না। সুতরাং জমীদার ও রাইয়ত উভয়েরই পরস্পরের প্রতি যে স্নেহ ছিল, তাহা তিরোহিত হইল, এবং ইহাতে উভয়েরই, যার পর নাই, দুরবস্থা হইয়া উঠিল। জমীদার বা অপর ইজারদারগণ, রাজপুরুষদিগের আদেশ বা ইচ্ছানুযায়ী উচ্চ জমায় ইজারা লইতেন, কিন্তু রাজস্ব পরিশোধে অসমর্থ হইতেন; একারণ অনেক রাজস্ব বাকী পড়িতে লাগিল, এবং আদায়ের উপায়াভাবে, তাহা কোম্পানির রেহাই দিতে হইল। সুতরাং, কোম্পানির লাভ দূরে থাকুক, বিলক্ষণ ক্ষতি হইতে লাগিল। *

অবশেষে, অসাধারণ বিচক্ষণ ও দূরদর্শী লার্ড কর্ণওয়ালিস সাহেব, ডাইরেক্টর্ সাহেবদের ১৭৮৬ খৃঃ অব্দের ১২ ই এপ্রে-

---

(১) ১১৫৪ বাঃ অব্দে ঈশ্বরচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করেন।

* Hunter's Annals of Rural Bengal p 266.

লের আদেশানুসারে, বাঙ্গালার জমীদারী সকল জমীদারদিগের সহিত, দশ বৎসরের নিমিত্ত, বন্দোবস্ত করিলেন * এবং যদি ডিরেক্টরেরা স্বীকার করেন, তবে এই বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী হইবেক, এইরূপ ঘোষণা করিয়া দিলেন। আর, এই বন্দোবস্ত চিরস্থায়ী হইবার জন্য, উক্ত কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিলেন। † এই সাধারণ নিয়মানুসারে, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র, নদীয়া জমীদারী বাং ১১৯৭ অব্দ হইতে ১২০৬ অব্দ পর্য্যন্ত, দশ বৎসর মেয়াদে, বন্দোবস্ত করিয়া লইলেন। প্রথম বৎসরে ৮৪০৬০২ টাকা, ও পর বর্ষাবধি বৎসর বৎসর কিছু কিছু বৃদ্ধি হইয়া, ১২০১ অব্দ হইতে ১২০৬ অব্দ পর্য্যন্ত, ৮৫১৫১২ টাকা জমা দিতে হইবেক, এইরূপ ধার্য্য হইল। ১৭৯৩ খৃঃ অব্দের ২২এ মার্চে, ঐ বন্দোবস্তই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বলিয়া পরিগণিত হইল। প্রথমে, এই বন্দোবস্ত দশ বৎসরের নিমিত্ত হয়, একারণ ইহা দশ সালা বন্দোবস্ত নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

এই কাল পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে হিন্দুসমাজ মধ্যে পৈতৃক সম্পত্তির যদৃচ্ছা দান করিবার রীতি না থাকাতে, হিন্দু মাত্রেরই মনে এই দৃঢ় সংস্কার ছিল যে, কোন ব্যক্তি আপন পৈতৃক সম্পত্তি; স্বেচ্ছানুসারে দান করিলে, তাহা সিদ্ধ থাকিতে পারে না। একারণ কেহ সন্তান বা অন্য উত্তরাধিকারী সত্ত্বে, পৈতৃক সম্পত্তির কোনরূপ দানপত্র করিতেন না। অধিকারী পরলোকগামী হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ, তদীয় ত্যক্ত সম্পত্তি, শাস্ত্রের বিধানানুসারে আপনাদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইতেন। একারণ যে বৎসর, রাজা ঈশ্বরচন্দ্র জমীদারী বন্দোবস্ত

---

* John Marshman's History of India Vol. I. p. 467.

† Do. Do. Do. p. 473.

করিয়া লইলেন, সেই বৎসর, তাঁহার পিতৃব্য রাজা ঈশানচন্দ্র পৈতৃক জমীদারীর অংশ পাইবার নিমিত্ত তাঁহার নামে উপযুক্ত ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ করিলেন। ইহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই যে, অর্থী এই বলিয়া অভিযোগ করেন, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের ছয় পুত্র, তাহার মধ্যে দুই পুত্র গতাসু হওয়াতে, এক্ষণে আমি ও উমেশচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র এবং শিবচন্দ্রের পুত্র প্রত্যর্থী ঈশ্বরচন্দ্র উক্ত সম্পত্তির তুল্য অধিকারী। ঈশ্বরচন্দ্র ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে অংশ চতুষ্টয়ের একাংশের অধিকারী। অতএব, জমীদারীতে আমার যে একাংশের স্বত্ব আছে, আমি তাহার অধিকার পাই। প্রত্যর্থী রাজা ঈশ্বরচন্দ্র তাহার এই উত্তর দেন যে, প্রথমতঃ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নবাব মহবতজঙ্গের অনুমতি লইয়া, আমার পিতা রাজা শিবচন্দ্রকে যুবরাজ করেন, তৎপরে সম্রাট ও নবাব তাঁহাকে জমীদারীর ফরমাণ দেন; এবং রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, গবর্ণর জেনেরেল ও তাঁহার কৌন্সলের অনুমতি লইয়া তাঁহাকে সমস্ত জমীদারী ও বংশমর্য্যাদা প্রদান করেন; তদনন্তর, গবর্ণর জেনেরেল ও তাঁহার কৌন্সল তাঁহার নামে জমীদারীর সনন্দ দেন। তিনি, যাবজ্জীবন ঐ জমীদারী ভোগ করিয়া, পরলোক গমন কালে, আমাকে দান করিয়া দিয়াছেন। জমীদারী আমার দখলে আছে, ও আমারই সহিত তাহার বন্দোবস্ত হইয়াছে। যদি পিতামহ-কৃত দান-পত্র শাস্ত্রবহির্ভূত হইত, তবে যৎকালে, তিনি তাঁহার অন্য অন্য পুত্র ও পৌত্রদিগের নিমিত্ত মোশাহেরা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া, আমার পিতাকে সমস্ত জমীদারী দান করিয়া রাজ্যাভিষিক্ত করেন, তৎকালে, ইহাঁরা অবশ্যই আপত্তি উত্থাপন করিতেন, এবং পিতার ও আমার নিকটে মোশাহেরা গ্রহণ করিতেন না।

অর্থী ঈশানচন্দ্র ইহার এই প্রত্যুত্তর দেন যে, দানপত্রের বিষয় আমরা কিছুমাত্র অবগত ছিলাম না। যখন গবর্ণর জেনেরেলের প্রেরিত সাহেব ও মুন্শী রাজবাটীতে আইসেন, তখন আমরা ভাবিয়াছিলাম, পিতা পীড়িত থাকাতে, গবর্ণর জেনেরেল, তাঁহার শারীরিক তত্ত্বাবধান করণার্থ উক্ত রাজ-পুরুষদ্বয়কে পাঠাইয়াছিলেন। জমীদারী প্রথমতঃ খাসে, ও পরে ইজারা বন্দোবস্ত থাকাতে, পিতা ও ভ্রাতার সময়ে, এ অভিযোগ উপস্থিত করি নাই, এবং অপ্রতুল বশতঃ ইতিপূর্ব্বে প্রত্যর্থীর সময়েও এই অভিযোগ করিতে সমর্থ হই নাই। আর, নিতান্ত অনুপায় প্রযুক্ত ইহাঁর সময়ে মোশাহেরা লইয়াছি। যাহা হউক, আমার এই অভিযোগ বিধিবিহিত কালের মধ্যে উত্থাপিত হইয়াছে, এবং উপরোক্ত কোন কারণে এ মোকদ্দমার হানি হইতে পারে না।

বিচারপতি এ বিষয় সম্বন্ধে এদেশের ধর্ম্মশাস্ত্রে কি নির্দ্দেশ আছে, তাহা জ্ঞাত হইবার জন্য, উভয় পক্ষকে কতিপয় প্রধান ও প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের নাম লিখিয়া দিতে আদেশ করিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র, নবদ্বীপ নিবাসী কৃপারাম তর্কভূষণ, ত্রিবেণীবাসী জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন, কলিকাতার শোভাবাজার নিবাসী হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌম, এই তিনজন পণ্ডিতের নাম লিখিয়া দিলেন। তাঁহাদের নিকট এই প্রশ্ন প্রেরিত হইল যে, "পুরুষানুক্রমে বিভক্ত হয় নাই বলিয়া, যদি কোন ব্যক্তি, স্বীয় পৈতৃক সম্পত্তি জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দান করিয়া, কনিষ্ঠ পুত্রদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহোপযুক্ত মোশাহেরা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, এবং ঐ জ্যেষ্ঠপুত্র আপন যাবজ্জীবন, ঐ সম্পত্তি ভোগ করণানন্তর স্বীয় পুত্রকে দান করিয়া পরলোক গমন করেন ও ঐ পুত্র তাহার অধিকারী

রহেন, এবং দাতার কনিষ্ঠ পুত্রগণ, একাল পর্য্যন্ত তাঁহাদের নিকট আপন আপন নির্দ্দিষ্ট মোশাহেরা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে এক্ষণে তাঁহারা ঐ পৈতৃক জমীদারীর অংশ পাইবার দাওয়া করিলে, তাহা শাস্ত্রসিদ্ধ হইতে পারে কি না? (১)। পণ্ডিতগণ, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র-কৃত দানপত্র, শাস্ত্রসম্মত এবং ঈশানচন্দ্রের দাওয়া শাস্ত্র-বহির্ভূত এই মর্ম্মে ব্যবস্থা পাঠাইলেন, এবং তদনন্তর ধর্ম্মাধ্যক্ষদিগের আদেশানুসারে, বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়া, দায়ভাগ প্রভৃতি অষ্ট গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া লিখিয়াদিলেন। ঈশানচন্দ্র, স্বনাম স্বাক্ষরিত এক বিরুদ্ধ ব্যবস্থা দর্শাইয়া, উপরোক্ত ব্যবস্থার প্রতিবাদ করিলেন। বিচারপতি এই উভয় ব্যবস্থার পরস্পরের বিরুদ্ধার্থ দর্শনে, মুরশিদাবাদ, জাহাঁগির নগর, দিনাজপুর, বারাণসী এবং গয়ার পণ্ডিতদিগের নিকট এ বিষয়ের ব্যবস্থা চাহিয়া পাঠাইলেন, এবং তাঁহাদের প্রেরিত ব্যবস্থা সমস্ত পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক, প্রত্যর্থীর দাওয়া শাস্ত্র-বিরুদ্ধ স্থির করিয়া, মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্‌ করিলেন (২)

বঙ্গদেশের জমীদারীর অবস্থা এক্ষণে যেরূপ উন্নত হইয়াছে, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না; তৎকালে, বিস্তর ভূমি জলমগ্ন, জঙ্গলময়, এবং পতিত থাকিত। ১৮১৯ অব্দের ৮ আইনের ন্যায়, তালুকদারের স্থানে অগৌণে কর আদায় করিবার কোন আইন প্রচলিত না থাকাতে, জমীদারগণের সমস্ত জমীদারী

---

(১) পণ্ডিতগণের নিকট যে পত্র যায়, ইহা তাহার প্রতিলিপির অবিকল নকল।

(২) পণ্ডিতগণ আপন আপন ব্যবস্থার প্রমাণার্থে যে সকল সংস্কৃত বচন উদ্ধৃত করিয়া দেন, আমি বাহুল্য হয় বলিয়া, কেবল তাঁহাদের কৃত ঐ সকল বচনের ব্যাখ্যার অবিকল প্রতিলিপি পরিশিষ্টে লিখিলাম।

খাসে রাখিতে হইত। বিস্তৃত জমীদারীর জমীদারেরা আপন আপন অধিকারের সমস্ত কার্য্য স্বচক্ষে দেখিয়া করিতে পারিতেন না; নায়েব ও তহসিলদারগণ প্রজার নিকট যে খাজানা আদায় করিত, তাহার কিয়দংশ আত্মসাৎ করিত। ইহার উপর আবার কোন কোন বৎসরে, জলপ্লাবন অনাবৃষ্টি প্রভৃতি দুর্ঘটনা নিবন্ধন শস্য অজন্মা হইলে, প্রজাগণ কর প্রদানে এক কালে অশক্ত হইত। রাজস্ব বৃদ্ধি হওয়াতে জমীদারীর, পূর্ব্বাপেক্ষা লাভের লাঘব হইল, অথচ জমীদারগণের বংশ মর্য্যাদা রক্ষার্থ পূর্ব্বমত ব্যয় হইতে লাগিল। মহাজনের সঙ্খ্যা এত অল্প ছিল যে, জমীদার বা প্রজার প্রয়োজন হইলে, হঠাৎ অধিক টাকা পাওয়া যাইত না; সুতরাং, রাজস্বের অকুলান হইলে, তাহা কুলান করা দুঃসাধ্য হইত। জমীদারীর লাভ ইদানীং যে পরিমাণ হইয়াছে, সে পরিমাণ তৎকালে ছিল না, সুতরাং, কোন জমীদারী, রাজস্বের দায়ে নিলাম হইলে অথবা স্বেচ্ছানুসারে বিক্রয় করিতে হইলে, এক্ষণে তাহার যেরূপ মূল্য হয়, পূর্ব্বকালে সেরূপ হইত না; একারণ কোন মহাল নিলাম হইলে তাহার যে মূল্য হইত, তাহা হইতে সেই মহালের রাজস্ব পরিশোধিত হইয়া এত অল্প টাকা উদ্বৃত্ত থাকিত যে, তদ্দ্বারা অন্য কোন মহালের বাকী রাজস্ব পরিশোধ করিবার সম্ভাবনা হইত না। অথবা, দুই চারি মহালের খাজানা বাকী পড়িলে, তন্মধ্যে এক খানি মহাল বিক্রয় করিয়া, অপর মহাল সকল রক্ষা করিবার উপায় করা যাইত না। আমরা এই রাজাদিগের বিষয়সংক্রান্ত পূর্ব্বকালীন কাগজে দেখিয়াছি যে, বাকী খাজানার নিলামে, ইহাঁদিগের দক্ষিণাঞ্চলের জমীদারীর অনেক মহালের মূল্য এক বৎসরের

রাজস্বের পরিমাণেরও অধিক হয় নাই। আবার গবর্ণমেণ্ট জমীদারী যেমন উচ্চ জমায় বন্দোবস্ত করেন, রাজস্ব আদায়ের নিয়মও তেমনি কঠিন করিয়াছিলেন। প্রজার নিকট হইতে খাজানা না পাওয়াতেই হউক আর অন্য কোন কারণেই হউক, নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে, রাজস্ব রাজকোষে নীত না হইলেই জমীদারী নিলাম হইত। এই সকল কারণেই, বঙ্গরাজ্যের অনেক পুরাতন ভূম্যধিকারীর পৈতৃক ভূসম্পত্তির অধিকাংশ, দুই এক পুরুষের মধ্যেই হস্তান্তরিত হইয়া যায়।

পুরাতন ভূম্যধিকারিগণের জমীদারী হ্রাস হওয়ার যে সকল কারণ উপরে বর্ণিত হইল, রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের জমীদারীর ন্যূনতা হইবার আরও কয়েক কারণ উপস্থিত হইয়াছিল। জ্ঞাতিদিগের সহিত জমীদারী সংক্রান্ত যে মোকদ্দমা হয়, তাহাতে অনেক টাকা ব্যয় হইয়া যায়, এবং কয়েক বৎসর তাঁহাদের মোশা-হেরা না দেওয়াতে, তাঁহারা, রাজদ্বারে অভিযোগ করিয়া, আপন আপন প্রাপ্য মোশাহেরা, সুদ ও খরচা সমেত যে ডিক্রি পান, তাহাতে এককালে অনেক টাকা দেনা হয়। আর ঈশ্বরচন্দ্র তাঁহার শেষাবস্থায়, বিষয় ব্যাপারে যথোচিত মনোযোগ না করিয়া সর্ব্বদা আমোদ প্রমোদে কাল অতিবাহিত করিতেন। যথোপযুক্ত তত্ত্বাবধারণ অভাবে লাভের খর্ব্বতা হয়, অথচ সাংসারিক ব্যয় পূর্ব্বমতই হইতে থাকে। রাজস্ব পরিশোধের প্রতি যথোচিত মনোযোগ থাকিত না; যে টাকা সংগৃহীত হইত, তাহা অন্য দেনা পরিশোধে বা সাংসারিক নিত্য নৈমি-ত্তিক ক্রিয়াতে ব্যয় হইয়া যাইত, সুতরাং রাজস্বের দায়ে, দুই এক খানি করিয়া, পরগণা সকল নিলাম হইতে লাগিল, এবং তাঁহার জীবনের শেষাবস্থায়, এই বৃহৎ জমীদারীর অর্দ্ধেক

মাত্র রহিল। ঈশ্বরচন্দ্র তিন চারিটি পরগণা খোসকবালাতেও বিক্রয় করেন।

রাজা বিবিধ শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন পাপে উৎকট রোগাক্রান্ত হইয়া, স্থবিরাবস্থা উপস্থিত না হইতেই জীর্ণ হইয়া পড়েন, এবং কয়েক বর্ষাবধি, প্রায় হতজ্ঞান হইয়া থাকেন। পরে ১২০৯ সালে, (খৃঃ ১৮০২ অব্দে) গিরীশচন্দ্র নামে এক পুত্র রাখিয়া, পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে লোকান্তর গমন করেন। ঈশ্বরচন্দ্র যৌবনাবস্থায় অতি রূপবান্ ও বলবান্ ছিলেন। পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায় ইহাঁরও বিদ্যোন্নতির বিষয়ে যত্ন ছিল, বিশেষতঃ সঙ্গীত শাস্ত্রের সাতিশয় উৎসাহী ও অনুরাগী ছিলেন। তাঁহার উৎসাহ প্রযুক্ত কৃষ্ণনগরে ও তন্নিকটস্থ অন্য অন্য স্থানে অনেকগুলি বিখ্যাত গায়ক হইয়াছিলেন। তিনি নিজেও এক জন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ ছিলেন। এই রাজার সভাস্থ বিখ্যাত পণ্ডিতবৃন্দের মধ্যে, বিনয় বাকৃপতি নামে এক জন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বেত্তা ছিলেন। তৎকালে তাঁহার তুল্য জ্যোতির্ব্বিদ্ এ প্রদেশে আর ছিল না এবং অদ্যাপিও হয় নাই। তিনি কবিও ছিলেন। সারদামঙ্গল নামে বঙ্গ ভাষায় একখানি সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করেন (১)। ঈশ্বরচন্দ্র অতিশয় দুঃশীল, নির্দ্দয় ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিলেন। রাজবাটীর লোকেরা বলেন তাঁহার পিতা রাজাধিরাজ শিবচন্দ্র, আসন্ন কালে, যৎপরোনাস্তি আক্ষেপ করিয়া কহিয়াছিলেন, "যদি আমার আর একটি অন্ধপুত্রও থাকিত, তাহা হইলে আমি এ দুর্ব্বৃত্তকে আমার উত্তরাধিকারী

(১) কৃষ্ণনগরের কতিপয় গোপ, তৈলকার, ও আচার্য্য ব্রাহ্মণেরা ঐ সকল গীত গাইয়া বিলক্ষণ ধন উপার্জ্জন করিতেন, এবং শ্রোতাগণ তচ্ছ্রবণে সাতিশয় প্রীত হইতেন।

করিতাম না।” ঈশ্বরচন্দ্র এককালে শিবনিবাস পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণনগরের রাজবাটীতে অবস্থিত হন। এক্ষণে এ বাটীতে বিষ্ণু-মহাল, রওনসনমহাল, বার্‌দারী ইত্যাদি নামে যে কয়েকটি প্রাসাদ আছে তাহা তিনিই নির্ম্মাণ করেন।

এই রাজা, কৃষ্ণনগরের পূর্ব্ব দক্ষিণ এক ক্রোশ অন্তর, অঞ্জনা নদী তীরে, এক সুরম্য হর্ম্ম্য প্রস্তুত করান, এবং ঐ স্থানের নাম শ্রীবন রাখেন। এই স্থান অতি রমণীয়। অঞ্জনা, যদিও ইদানীং স্থিরসলিলা হইয়া, গতিবিহীনা হইয়াছে, তথাপি তদীয় পূর্ব্বকালীন মনোহারিণী শোভা এক কালে তিরোহিত হয় নাই। প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পর্য্যন্ত, ইহার উভয় কূলে গ্রাম্য বৃক্ষ সমূহ শ্রেণীবদ্ধ থাকাতে, এরূপ অপরূপ শোভা হইয়া রহিয়াছে, যেন, কোন প্রকৃতিপ্রিয় মহাপুরুষ, স্বভাবের সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিবার বাসনায়, নিবিড় কানন মধ্যে এই জলাশয় প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন। প্রাহ্নে, অপরাহ্নে, অথবা রজনী কালে, এই নদীতে নৌকারোহণ করিয়া ইতস্ততঃ নয়ন সঞ্চারণ করিবামাত্র অসুস্থ হৃদয়ের সুস্থতালাভ হয়। কতিপয় বর্ষ পূর্ব্বে আমাদিগের সুপ্রসিদ্ধ কবিবর মাইকেল মধুসূদন, এই নদীর অপূর্ব্ব শোভা সন্দর্শনে, কহিয়াছিলেন “হে অঞ্জনে, তোমাকে দর্শন করিয়া আমি অতিশয় প্রীত হইলাম, তোমাকে কখনই ভুলিব না এবং তোমার বর্ণনা করিতেও ত্রুটি করিব না।” এই রাজার পূর্ব্বপুরুষেরা, এই নদী-তটস্থ প্রাসাদের দক্ষিণদিকে যে কানন আছে তাহাতে বিবিধ সুস্বাদু ফলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া তাহার নাম মধুপোল, এবং ঐ কাননের পূর্ব্বাংশে যে উপবন আছে, তাহার নাম আনন্দকানন রাখেন। মধুপোলে অশোক, চম্পক, বক, কাঞ্চন, নাগকেশর, মুচকুন্দ, কিংশুক, শাল্মলী ইত্যাদি পুষ্পবৃক্ষ শ্রেণীতে শোভিত

ছিল, এক্ষণে কেবল কিংশুক ও শাল্মলি বৃক্ষ মাত্র আছে; তথাপি বসন্ত কালে, এই তরুরাজি, বিকসিত রক্তবর্ণ কুসুমাবলিতে অলঙ্কৃত হইয়া, অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করে। প্রায় পঞ্চবিংশ বৎসর অতীত হইল, একদা আমাদিগের সুবিখ্যাত কবি মদনমোহন কাব্যরত্নাকর, এই শোভা সন্দর্শনে লিখিয়াছিলেন, "জগদীশ্বর সর্ব্বভূতকে অদ্ভুত প্রদর্শনার্থ যেন রাশীভূত সিন্দূর রক্ষা করিয়াছেন।"

এই রাজার সময়ে, নবদ্বীপে শিবনাথ বিদ্যাবাচস্পতি, কাশীনাথ চূড়ামণি, কৃষ্ণকান্ত বিদ্যাবাগীশ, রামনাথ তর্কপঞ্চানন, রামলোচন ন্যায়ভূষণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক, এবং রামনাথ তর্কসিদ্ধান্ত, রামদাস সিদ্ধান্ত, কালীকিঙ্কর বিদ্যাবাগীশ, কৃপারাম তর্কভূষণ প্রভৃতি বিখ্যাত স্মার্ত্ত ছিলেন। ত্রিবেণী-নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন ও শান্তিপুর-বাসী সুবিখ্যাত রাধামোহন গোস্বামী ভট্টাচার্য্যও তদানীং বিদ্যমান ছিলেন।

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

রাজা গিরীশচন্দ্র যখন বিষয়াধিকারী হন, তখন তাঁহার বয়ঃক্রম ষোড়শ বর্ষ; সুতরাং তাঁহার সম্পত্তি-সমূহ কোর্ট অব ওয়ার্ডসের অধীনে যায়। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, প্রথমে, বিষয়-কার্য্য-পর্য্যালোচনায় বিশেষ মনোনিবেশ করেন, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে, কর্ম্মচারিগণের প্রতি সমস্ত কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া, ধর্ম্মানুষ্ঠানে নিবিষ্টমনা হন। প্রথমতঃ নবদ্বীপস্থ গঙ্গাতীরে তৃণাচ্ছাদিত গৃহ মধ্যে ব্রহ্মচারীর বেশে অবস্থান পূর্ব্বক অনেক মহাপুর-

শ্চরণ করেন। অল্পকাল পরে, কৃষ্ণনগরে ছোট বড় দুই মন্দির প্রস্তুত করাইয়া, বড় মন্দির মধ্যে এক কালী মূর্ত্তি ও ছোট মন্দির মধ্যে এক শিব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করেন। কালীর নাম আনন্দময়ী ও শিবের নাম আনন্দময় রাখেন। যবনরাজত্ব কালে, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষদের আপন জমীদারী হইতে নিষ্কর ভূমি দানের যে অধিকার ছিল তাহা ইংরেজ অধিকারে রহিত হওয়াতে, তিনি রাণীদিগের নিষ্কর ভূমির কিয়দংশ ঐ দেব দেবীর সেবার জন্য, নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, এবং প্রতিবৎসর ঐ দেবীর নৈমিত্তিক পূজাতে বিস্তর অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। কিয়ৎকালানন্তর, একদা অমাত্য ও সভাসদ্‌গণকে আহ্বানপূর্ব্বক কহিলেন "গত-রজনীতে আমি এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি; যেন কোন দেবতা আমাকে কহিতেছেন, 'আমি নবদ্বীপের ভাগীরথী-তীরস্থ ভূগর্ভে অবস্থান করিতেছি, আমাকে নিজ নিকেতনে লইয়া স্থাপন কর'।" স্বপ্ন বৃত্তান্ত কেহ বা বিশ্বাস করিল, কেহ বা উপহাসাস্পদ মনে করিতে লাগিল। যাহা হউক রাজা অমাত্য ও কর্ম্মচারিগণ সহিত, সুরধুনী তীরে উপনীত হইয়া, কোন এক স্থান নির্দ্দেশ করিয়া খনন করিতে আদেশ করিলেন। কর্ম্মচারীরা, ইতস্ততঃ খনন করণানন্তর, এক বালুকাময় ভূমি খণ্ড বিদারণ করিলে, দুই তিন হস্ত পরিমিত ভূতলে, এক গোপাল মূর্ত্তি সকলের নয়নগোচর হইল। রাজা বহু সমারোহ পূর্ব্বক ঐ বিগ্রহকে রাজবাটী লইয়া গেলেন, এবং অনতিবিলম্বে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহার নাম নবদ্বীপনাথ রাখিলেন। কিছু দিন পরে, নবদ্বীপে তাঁহার এক বাটী প্রস্তুত করাইয়া দিলেন, এবং তাঁহার নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াদিতে অপর্য্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করিতে লাগিলেন। রথযাত্রার সময়ে, কয়েক দিন,

নবদ্বীপস্থ সমস্ত ব্রাহ্মণকে ভোজন করান হইত, এবং কাংস্য ও পিত্তল নির্ম্মিত জলপাত্র ও ভোজনপাত্র স্তূপাকার করিয়া, তাহার কিয়দংশ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণকে বিতরণ করা হইত, ও অবশিষ্টাংশ সাধারণ লোকে লুটিয়া লইত। যখন রথ চালিত হইত, তখন তাহার উপর হইতে রজত পুষ্প বর্ষণ হইত, এবং উভয় পার্শ্বস্থ দণ্ডায়মানা কামিনীগণের উপর রৌপ্যাভরণ নিক্ষিপ্ত হইত। দোলযাত্রার সময়েও, অল্প অর্থ ব্যয় হইত না। এই কালে কয়েক দিন, নবদ্বীপের প্রায় সমস্ত রাজপথ আবীরে আচ্ছাদিত থাকিত। কোন পথে ধূলি দর্শন হইলে, রাজার বিরক্তির সীমা থাকিত না। শুনিয়াছি, এতাদৃশ অপরিমিত ধনক্ষয় দেখিয়া, একদা নবদ্বীপস্থ প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ, কাতরান্তঃকরণে ও বিনয়বচনে রাজসন্নিধানে নিবেদন করেন "মহারাজ! যদিও এই সকল অর্থ সৎকর্ম্মে ব্যয় হইতেছে, কিন্তু শাস্ত্রকারেরা, মিতব্যয়িতাও রাজাদিগের এক প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অতএব, এ বিষয়েও রাজাদিগের দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য।" রাজা বলিলেন "আপনারা একবার চক্ষু নিমীলিত করিয়া দেখুন দেখি, ধন জন কিছু দেখিতে পান কি না?" পণ্ডিতগণ, এই উত্তর শুনিয়া, আর কিছু কহিতে সাহস করিলেন না, বরং রাজার প্রীতিকর বাক্যই কহিলেন, কিন্তু মনে মনে ভাবিলেন ইনি অচিরাৎ সর্ব্বস্বান্ত হইবেন।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সময়ে, পৈতৃক জমীদারীর অর্দ্ধাংশ হস্তান্তরগত হওয়াতে, আয়ের বিস্তর ন্যূনতা হয়। গিরীশচন্দ্র, আপন আয়ের প্রতি কিঞ্চিন্মাত্র দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবল যদৃচ্ছা ব্যয় করিতে ভাল বাসিতেন। এই রাজবংশের যাঁহারা পুরাতন দেওয়ান ছিলেন, তাঁহাদের

বংশোদ্ভূত কোন ব্যক্তি তাঁহার পিতার শেষাবস্থায় বা তাঁহার প্রথমাবস্থায় দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ছিলেন না। এই উভয় কালেই নূতন দেওয়ান ছিলেন। পুরাতন দেওয়ানদিগের ন্যায়, অভিনব দেওয়ানদের প্রভুভক্তি ও প্রভুর হিতাভিলাষ প্রবল ছিল না। এই সময়ে, রামলোচন বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি দেওয়ানীপদে নিযুক্ত ছিলেন। রাজা আপন প্রীতিকর কার্য্য নিষ্পাদিত না হইলেই তাঁহার প্রতি বিরক্তি প্রকাশ ও কটূক্তি প্রয়োগ করিতেন; সুতরাং, তিনি রাজার শেষ দশা কি হইবে বিবেচনা না করিয়া যাহাতে তাঁহার আশু সন্তোষ হয় তাহাতেই যত্নবান্ হইতেন। জমীদারীর যে কর সংগৃহীত হইত, তাহার অধিকাংশ রাজার মনোরঞ্জক কার্য্যে ব্যয় হইয়া যাইত, সুতরাং রাজস্ব বাকী পড়িতে লাগিল, এবং ক্রমশঃ দুই এক খানি করিয়া, বাঃ ১২১৩ সালের মধ্যে অনেকগুলি পরগণা নিলাম হইয়া গেল। এক্ষণে যাহা রহিল তাহা রক্ষা করিতে পারিলেও, এ রাজবংশের মান সম্ভ্রম কথঞ্চিৎরূপে রক্ষা হইতে পারিত। কিন্তু কে রক্ষা করিবেক? রাজার বিষয়বুদ্ধির সম্পূর্ণ অভাব ছিল, এবং কর্ম্মচারিগণের ধর্ম্ম বা প্রভুভক্তি কিছুমাত্র ছিল না। ১২২০ বাঃ অব্দে যখন তাঁহার প্রধান পরগণা উখড়া, রাজস্ব দায়ে, নিলাম হইবার সম্ভাবনা হইল, তখন তিনি এই পরগণা নিলাম হইলে "আমার কি গতি হইবে" এই ভাবিয়া, যার পর নাই চিন্তাকুল হইলেন, এবং যাহাতে প্রয়োজনীয় টাকা সংগৃহীত হয়, কর্ম্মকারকগণের প্রতি তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতে আদেশ করিলেন। রাজবাটীতে এ বিষয় লইয়া বিলক্ষণ আন্দোলন হইতে লাগিল; আত্মীয় বন্ধু বান্ধব সকলেই সাতিশয় ব্যাকুল-

চিত্ত হইলেন; ঋণ করিবার জন্য মহাজন স্থির হইল; তথাপি পরিশেষে নির্দ্দিষ্ট কাল মধ্যে, কালেক্টরিতে খাজানা দাখিল হইল না। ১২২০ বাঃ অব্দের পৌষ মাসে যখন ঐ পরগণার নিলাম উপস্থিত হইল, তখন রাজা, তাঁহাদের প্রাচীন দেওয়ান-বংশোদ্ভূত রত্নেশ্বর রায় ও কতিপয় সুহৃদ্বরের কথা ক্রমে, দেওয়ান রামলোচন ও তৎসহযোগী অন্য অন্য কর্ম্মচারীর দুষ্টাভিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া, মহাল অন্যের নামে ডাকিয়া রাখা স্থির করিলেন।

নিলাম উপস্থিত হইলে, রত্নেশ্বর আপন নামে নিলাম ডাকিতে আরম্ভ করিলেন, আর তেলিনিপাড়াবাসী কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও কলিকাতানিবাসী মধুসূদন সাণ্ড্যাল দুই ধনাঢ্য ব্যক্তিও ডাকিতে লাগিলেন। ইতি মধ্যে, বিশ্বাসঘাতক রামলোচন ও কতিপয় কর্ম্মচারী একত্রিত হইয়া রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং "কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহারাজার পক্ষেই ডাকিতেছে, অতএব রত্নেশ্বর রায়ের দ্বারা আর ডাকাইবার প্রয়োজন নাই" নির্ব্বোধ রাজাকে ইহাই প্রতীত করাইলেন। রাজা, রত্নেশ্বরকে আর ডাকিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। রত্নেশ্বর, এই মহানর্থকর রাজাদেশ শ্রবণে, শিরে করাঘাত পূর্ব্বক, ডাকিতে নিবৃত্ত হইলেন এবং অশেষবিধ বিলাপ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন। কাশীনাথ ও মধুসূদন পঞ্চাশ লক্ষের সম্পত্তি আট লক্ষে পাইলেন, সকল লোকে হাহাকার করিতে লাগিল; কিন্তু দুর্ভাগ্য, নির্বুদ্ধি রাজার তখনও চৈতন্যোদয় হইল না। তিনি ধূর্ত্ত-চূড়ামণি রামলোচনের ইন্দ্রজালে বিমোহিত হইয়া, তাঁহার কপট বাক্যে বিশ্বাস পূর্ব্বক নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিলেন। কয়েক দিন পরে, রামলোচন কহিলেন, "ক্রেতারা পরগণার মফস্বল

কাগজ দেখিলেই তাহা মহারাজার নামে লিখিয়া দিবেন, এই অবধারিত হইয়াছে।” নির্ব্বোধ-শিরোমণি রাজা সে কথাও বিশ্বাস করিলেন; অনতি কাল মধ্যে কতক কাগজও তেলিনি-পাড়ায় প্রেরিত হইল।

অবশেষে, রাজার নয়নোন্মীলিত হইল। তিনি তখন রাজস্ব পরিশোধের টাকা সংগৃহীত না হওয়া, রত্নেশ্বরকে নিলাম ডাকিতে নিষেধ করা, মফস্বলের কাগজ পত্র কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়দিগকে দেওয়া, ইত্যাদি সমস্ত বিষয়ের নিগূঢ় তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিলেন, এবং যাহাতে নিলাম অসিদ্ধ হয়, তাহার যত্ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। অতি অল্প বাকী খাজানার নিমিত্ত এতাদৃশ বৃহৎ পরগণা সম্যক্ রূপে নিলাম হওয়া, ও ইহার প্রকৃত মূল্যের অনেক ন্যূন মূল্যে বিক্রীত হইয়া যাওয়া, ইত্যাদি কারণ দর্শাইয়া এক আবেদন পত্র রেবিনিউ বোর্ডে দিলেন, এবং স্বয়ংও, বোর্ডের সাহেবদিগের সন্নি-ধানে গমন করিয়া, এই নিলামের আদ্যোপান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত বর্ণন করণানন্তর, যাহাতে এই নিলাম অসিদ্ধ হয়, তন্নিমিত্ত বিস্তর স্তব স্তুতি করিলেন। সাহেবেরাও তাঁহার প্রার্থনা সিদ্ধি বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করিতে সম্মত হইলেন। রাজা, রাজপরিবার, আত্মীয় স্বজন, এবং যাবতীয় পুরবাসিগণ, যৎপরোনাস্তি সংশ-য়াপন্ন চিত্তে, কাল যাপন করিতে লাগিলেন। সাহেবদিগের আদেশ প্রকাশ হইতে কিছু বিলম্ব হইল, এই সুযোগে, রাম-লোচন ও তত্তুল্য কতিপয় বিশ্বাসঘাতক কর্ম্মচারী রাজাকে বুঝাইলেন, যে নিলাম খরিদারগণ, বোর্ডের সাহেবদিগকে স্বপক্ষ করিবার নিমিত্ত, অশেষবিধ যত্ন করিতেছেন; বোর্ড নিলাম মঞ্জুর করিলে আর কোন উপায় থাকিবেক না। অতএব তাঁহারা যে অন্যায় নিলাম করিয়াছেন, তাহার প্রতিবিধানার্থ এই সময়ে

তাঁহাদের নামে গবর্ণর সাহেবের সমীপে অভিযোগ করা কর্ত্তব্য। হিতাহিত জ্ঞান শূন্য রাজা পূর্ব্ব বৃত্তান্ত সমস্ত বিস্মৃত হইয়া, পুনরায় ঐ বিশ্বাসঘাতকদিগের কথায় প্রত্যয় করিলেন এবং তাঁহাদের পরামর্শানুবর্ত্তী হইলেন।

উখড়ার নিলাম নিতান্ত বিধিবিরুদ্ধ হয় নাই; তবে বোর্ডের সাহেবেরা, করুণাপরবশ হইয়া, নিলাম অসিদ্ধ করিবার মানস করিয়াছিলেন; কিন্তু রাজার এইরূপ ব্যবহারে বিরক্ত হইয়া তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিলেন। নিলাম খরিদারেরা, অনতি কাল মধ্যেই, যথানিয়মে পরগণা অধিকার করিলেন। অনন্তর, রাজা, কলিকাতায় থাকিয়া এই পরগণা পুনঃ প্রাপ্তির জন্য অনেক যত্ন করিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন মতেই তাহা সফল করিতে পারিলেন না; লাভের মধ্যে, আর এক খানি মহাল বিক্রীত হইয়া গেল। এই রাজাদিগের তৎকালীন প্রথানুসারে, জ্ঞাতি, কুটুম্ব, আত্মীয়, গুরু, পুরোহিত, প্রভৃতি বহু ব্যক্তি তাঁহার সমভিব্যাহারে থাকাতে বিপুলার্থ ব্যয় হইল, এবং ঐ অর্থ সংগ্রহার্থে কলিকাতার নিকটস্থ মদরসা নামে এক খানি পরগণা বিক্রয় করিতে হইল।

দুর্ভাগা গিরীশচন্দ্রের পৈতৃক জমীদারীর অন্তর্গত ৮৪ পরগণা ছিল, এক্ষণে, পাঁচ সাত খানি পরগণা ও কতক গুলি নিষ্কর গ্রাম মাত্র থাকিল। তাঁহার মনের সুখপ্রভা একবারে অস্তমিত হইল; আত্মহত্যা কি স্বদেশ-পরিত্যাগ করেন ইহাই ভাবিতে লাগিলেন। পরে তাঁহার সুহৃদ্বর্গ, তাঁহাকে অনেক প্রবোধ দিয়া ও বহু বিনয় করিয়া বাটী আনিলেন; তিনি, বাটী উপনীত হইয়া, ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া রহিলেন। জননীকে এ মুখ কিরূপে দেখাইব, এই চিন্তা করিয়া, নানা কৌশলে তাঁহার সহিত দীর্ঘকাল সাক্ষাৎ করিলেন না।

রাজবাটীতে এই জমীদারী নিলামসংক্রান্ত একটি আশ্চর্য্য প্রবাদ আছে। প্রথমা মহিষী অপুত্রবতী থাকাতে, রাজা, ১২১৬ বাঃ অব্দের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব বা পরে পুনরায় দার-পরিগ্রহ করেন। জ্যেষ্ঠা রাণী যেমন সুন্দরী তেমনিই সুশীলা ছিলেন। রাজা তাঁহাকে সাতিশয় ভাল বাসিতেন এবং আর আর সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। কিন্তু তিনি শ্বশ্রু ঠাকুরাণীর বিষ নয়নে পতিত হওয়াতে, কখনই সুখী হইতে পারেন নাই। স্বামী মাতৃভয়ে তাঁহাকে সমুচিত স্নেহ ও আদর প্রদর্শন করিতে পারিতেন না, এবং অন্য আত্মীয় স্বজনও তাঁহাকে মনোমত যত্ন করিতে সাহসী হইতেন না। তাঁহার ভাবী অবস্থার তুলনায়, এ দুরবস্থাও তাঁহার পক্ষে সুখের অবস্থা ছিল। তিনি অনেক দুর্ভাগা হিন্দুমহিলাগণের ন্যায়, কিছুদিন পরে, চিরদুঃখিনী হইলেন। তাঁহার বন্ধ্যাত্ব স্থির হইলে, রাজা, মাতৃ অনুরোধে, পুনরায় বিবাহ করিলেন। এই বিবাহের কিয়ৎকালানন্তর, অভাগিনী রাণী উন্মাদিনী হইলেন; কাহারও সহিত কথা কহিতেন না, জাগ্রদবস্থায় মন্ত্র জপ করিবার ভাবে, কেবল বৃদ্ধাঙ্গুলি অপর অঙ্গুলির উপর সর্ব্বদা সঞ্চালন করিতেন। এক দিবস রাজমাতা ঐ রাণীর গৃহে, সহচরিগণকে সম্বোধিয়া কহিতেছিলেন "এত দিন হইল, তবু গিরীশ কলিকাতা হইতে কেন আসিতেছে না।" অন্য কেহ উত্তর করিতে না করিতে, উন্মাদিনী রাণী কহিলেন "সে সোণার রাজ্য বিক্রয় করেছে, আর তার এসে কি হবে।" রাজমাতা, তাঁহার বাক্য শ্রবণে অতীব বিস্ময়াপন্ন হইয়া, কহিলেন "যে বউ কোন কথা কহে না, সে একথা কেন কহিল।" অন্য অন্য উপস্থিতা রমণীগণ যদ্যপিও জানিতেন যে, সোণার রাজ্য যথার্থই বিক্রীত হইয়াছে, তথাপি তাঁহাকে কহিলেন "পাগলের

কত মত ভাব হয় ও তাহারা কত প্রকার কথা কয়, অতএব আপনি ইহাঁর কথা শুনিয়া, কেন উৎকণ্ঠিত হইতেছেন?”

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তদীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে জমীদারী দিয়া আর আর পরিবারগণের ভরণপোষণের নিমিত্ত, বাৎসরিক যে চল্লিশ হাজার টাকা দিবার নিয়ম করিয়া যান, তাহার মধ্যে রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের সময়ে, শম্ভুচন্দ্রের বার হাজার ও তাঁহার জননীর তিন হাজার, মহেশচন্দ্রের ছয় হাজার এবং ঈশানচন্দ্রের ছয় হাজার ধার্য্য থাকে। ভৈরবচন্দ্র ও হরচন্দ্রের পোষ্য-পুত্রদ্বয়ের মৃত্যু হওয়ায় তাঁহাদের মোশাহেরা রহিত হইয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের দানপত্রে এইমাত্র লিখিত ছিল যে, “এই এই পুত্র ও পৌত্রদের গ্রাসাচ্ছাদনের নিমিত্ত, এত টাকা নির্দ্ধারিত করিলাম”। ইহাঁরা পুত্র পৌত্রাদিক্রমে, এই টাকা পাইবেন কি না, তাহা পরিষ্কার করিয়া লিখিত হয় নাই, একারণ ঈশানচন্দ্র লোকান্তর গমন করিলে, গিরীশচন্দ্র, তদীয় তনয়দিগের, তাঁহাদের পৈতৃক মোশাহেরা রহিত করিলেন। ঈশানচন্দ্রের পুত্রগণ, ঐ মোশাহেরা পাইবার নিমিত্ত, ধর্ম্মাধিকরণে অভিযোগ করিলেন। ধর্ম্মাধ্যক্ষগণ, যখন, দাতা পুত্রের পোষ্যপুত্রকে মোশাহেরা দিয়াছেন, তখন তিনি যে পুত্রের ঔরসজাত পুত্রকে পৈতৃক মোশাহেরাতে বঞ্চিত করিবেন, তাঁহার এরূপ অভিসন্ধি থাকা কোনরূপেই প্রতীয়মান হইতে পারে না, এই বিবেচনা করিয়া, অর্থীদিগের প্রার্থনা সিদ্ধ করিলেন, এবং এই মীমাংসানুসারে, শম্ভুচন্দ্র ও মহেশচন্দ্রের পুত্র পৌত্রগণও মোশাহেরা পাইতে লাগিলেন। পরে, যৎকালে, উখড়া পরগণা নিলাম হইলে, রাজা গিরীশচন্দ্র তাহার পণ ফাজিলের টাকা গ্রহণে উদ্যত হইলেন, তখন শম্ভুচন্দ্র, মহেশচন্দ্র ও ঈশানচন্দ্রের

পুত্রগণ, গবর্ণর সাহেবের নিকট, এই আবেদন করিলেন, "যে পরগণার উপস্বত্ব হইতে আমরা মোশাহেরা পাইয়া আসিতেছি, তাহা যখন বিক্রীত হইয়া গেল, তখন যে পরিমাণ টাকার কোম্পানির কাগজ (প্রোমেসরি নোট) খরিদ হইলে, আমাদিগের মোশাহেরার সঙ্কুলান হয়, সেই পরিমাণ টাকা ঐ পণ ফাজিলের টাকা হইতে আমাদিগকে দিতে আজ্ঞা হয়।" গিরীশচন্দ্র, বিবিধ কারণ প্রদর্শন করিয়া, তাঁহাদের প্রার্থনার প্রতিবাদ করিলেন, এবং আপনার অভিপ্রেত সাধনের নিমিত্ত, প্রভূত প্রয়াস পাইলেন। অনন্তর, গবর্ণর সাহেব, উভয় পক্ষের তর্কবিতর্ক শ্রবণানন্তর, এই আদেশ দিলেন যে, "যে পরিমাণ কোম্পানির কাগজের স্থদে অভিযোক্তাদের মোশাহেরা পূরণ হইতে পারে, সেই পরিমাণ কোম্পানির কাগজ, গিরীশচন্দ্রের নামে ক্রীত হইয়া, সদর দেওয়ানীর কোষাগারে গচ্ছিত থাকিবেক, অভিযোক্তারা ছয় মাস অন্তর আপন আপন অংশ মত টাকা উক্ত ধর্ম্মাধিকরণের রেজিষ্টর সাহেবের নিকট প্রাপ্ত হইবেন; আর যদ্যপি অভিযুক্ত ও অভিযোক্তাদিগের মধ্যে কেহ ঐ গচ্ছিত টাকা পাইবার বাঞ্ছা করেন, তবে তিনি, উপযুক্ত বিচারালয়ে আপন স্বত্ব সাব্যস্ত পূর্ব্বক ডিক্রী লাভ করিলে, তাহা পাইবেন।

গিরীশচন্দ্র প্রথমতঃ অতিশয় শুদ্ধাচারী ছিলেন। তিনি, বিষয়াধিকারী হইবার অব্যবহিত পরেই, পিতার মদ্যপানের সহযোগীগণকে রাজবাটী হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। পরে যখন, উখড়া পরগণা বিক্রীত হইলে, তিনি অত্যন্ত শোকাভিভূত ও আকুলিত চিত্ত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে, এক জন দণ্ডী গোস্বামী উপস্থিত হন, এবং কিয়দ্দিন রাজসন্নিধানে অবস্থান করণানন্তর একদা রাজাকে জিজ্ঞাসা করেন, "মহারাজ আপনাকে সর্ব্বদাই

অসুস্থ-হৃদয় দেখিতে পাই, ইহার কারণ কি?” রাজা উত্তর করিলেন, “যে কুলাঙ্গার, আপন দোষে, পৈতৃক সমস্ত সম্পত্তি বিসর্জ্জন দিয়াছে, তাহার স্বচ্ছন্দান্তঃকরণে থাকিবার সম্ভাবনা কি?” সন্ন্যাসী বলিলেন যে “আপনি, বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্ হইয়া, অনিত্য বিষয়ের নিমিত্ত এতাদৃশ শোকাভিভূত কেন হইতেছেন? আমার উপদেশানুযায়ী কার্য্য করুন, আপনার সমস্ত মনঃপীড়া দূরীভূত হইবেক।” অনন্তর, রাজা, দণ্ডীর নিদেশানুসারে পূর্ব্ব পুরুষানুগত তন্ত্রোক্ত মন্ত্র গ্রহণ করিলেন এবং যাবজ্জীবন সুরাদেবীর উপাসক হইয়া রহিলেন।

রাজা যে অভিসন্ধিতে দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ করেন, তাহা সিদ্ধ না হওয়াতে, দত্তক গ্রহণাভিলাষী হইলেন। তাঁহার গর্ভবতী মাতুল-পুত্র-পত্নীকে রাজবাটীতে আনিয়া রাখা হইল। ঐ রমণী ১২২৬ বাঃ অব্দের জ্যৈষ্ঠ মাসে এক পুত্র প্রসব করিয়া, কিয়দ্দিন পরে, লোকান্তর গমন করিলেন। কনিষ্ঠা রাজমহিষী ঐ শিশুকে লালন পালন করিতে লাগিলেন। বালক ষষ্ঠমাস বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, রাজা তাহাকে শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে দত্তক গ্রহণ করিলেন এবং নামকরণ সময়ে তাহার নাম শ্রীশচন্দ্র রাখিলেন (১)।

---

(১) তৎকালে নবদ্বীপে স্মার্ত্তের দুই দল প্রবল ছিল। এক দলের প্রধান রাজপুরোহিত লক্ষ্মীকান্ত ন্যায়ভূষণ, অপর দলের প্রধান রামমোহন বিদ্যাবাচস্পতি। ন্যায়ভূষণের মতানুসারে এই দত্তক গৃহীত হইয়াছিল, একারণ বাচস্পতি, কালাশৌচগ্রস্ত বালককে দত্তক গ্রহণ করা শাস্ত্র ও ব্যবহার বিরুদ্ধ বলিয়া, এক ব্যবস্থা প্রকাশ করেন। ইহা শুনিয়া, রাজা এ প্রদেশস্থ অনেক প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণকে আহ্বান করিলেন। এ বিষয়ের তুমুল বিচার হইল। বহুতর বিতর্কের পর, লক্ষ্মীকান্ত, এই সিদ্ধান্ত করিয়া, প্রতিবাদিগণকে পরাজিত করিলেন যে, “যখন শাস্ত্রকারেরা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অশৌচ গ্রহণ না করিলে, কেহ অশুচী হয় না, তখন অশৌচ সংজ্ঞা যাহার জ্ঞান গোচর হইতে পারে না, তাহার অশুচী হইবার সম্ভাবনা কি?

রাজা এত ধনহীন হইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার ধর্ম্ম কর্ম্মে ব্যয় করিবার ইচ্ছার ন্যূনতা হয় নাই। তিনি, ১২৩২ বাঃ অব্দে, নবদ্বীপে দুই বৃহৎ মন্দির প্রস্তুত করিয়া, এক মন্দিরের মধ্যে কালীরূপা পাষাণময়ী মূর্ত্তি ও গৃহান্তরে এক প্রকাণ্ড শিব মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দেবীর নাম ভবতারিণী ও দেবের নাম ভবতারণ রাখিলেন এবং তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত কিয়ৎ পরিমাণ নিষ্কর ভূমি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। অর্থের এত অভাবেও তিনি দেবোত্তরের উপস্বত্ব অধিকাংশ দেবসেবাতেই ব্যয় করিতেন। গিরীশচন্দ্রের বিষয়কার্য্যে ঔদাস্য থাকাতে তদীয় দত্তক পুত্র কুমার শ্রীশচন্দ্র, ত্রয়োদশ কি চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়সেই, সাংসারিক ভার গ্রহণ করেন। তিনি অতি বুদ্ধিমান ছিলেন, একারণ অল্প-কাল মধ্যেই, বিষয় কার্য্যের প্রণালী অনেক বুঝিতে পারিলেন। এই রাজবংশের যাদৃশ মান, তাদৃশ ধন নাই বলিয়া, যাহাতে সম্পত্তি বৃদ্ধি হয়, তৎ প্রতি তাঁহার অতিশয় আগ্রহ হইল। কিন্তু তদানীং, রাজসংসারের যেরূপ অপ্রতুল ও তাঁহার পিতার যেরূপ বহু-ব্যয়-স্পৃহা ছিল, তাহাতে বিষয়ের উন্নতিসাধন সুদূর-পরাহত, তাহার অবনতি নিবারণ করাই দুষ্কর হইয়াছিল। খাস মহাল সমস্ত ইজারা দেওয়া যাইত, এবং ইজারদারদিগের নিকট চারি পাঁচ বৎসরের অগ্রিম কর লওয়া হইত। যে নিয়মিত কর সংগৃহীত হইত, তাহা হইতে রাজস্ব পরিশোধনানন্তর অতি অল্প টাকা উদ্বর্ত্ত থাকিত। কোন বিশেষ প্রয়োজন হইলেই, ঐ ইজা-রার মেয়াদ বাড়াইয়া পুনরায় আগাও খাজানা লওয়া হইত। ইজারদারগণ, "আপাততঃ আমার হস্তে টাকা নাই, অন্যের নিকট কর্জ্জ করিয়া টাকা দিতে হইবে" ইত্যাদি নানা রূপ কৌশলে, আগামী কালের খাজানার অনেক সুদ কর্ত্তন করিয়া

টাকা দিত। অগ্রিম কর গ্রহণানুরোধে কোন মহাল খাসে রাখা হইত না এবং অতি অল্প জমায় ইজারা দেওয়া হইত। এই অনিষ্টকর রীতি বশতঃ বার্ষিক আয়ের বিস্তর লাঘব হইত। এই দুর্দ্দশার উপর আবার, রাজা, তৎকালে, এক নীচ-জাতীয়া দুষ্ট-প্রকৃতি রমণীর অতিশয় বশতাপন্ন হইয়াছিলেন, এবং তাহার মনোরঞ্জন করিতে নিরতিশয় ব্যগ্র ছিলেন, সুতরাং রাজার যতই ক্ষতি হউক না কেন, তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলেই, স্বার্থপর ব্যক্তির মনোরথ পূর্ণ হইত। কুমার একে বালক, তাহাতে আবার আত্মম্ভরি কর্ম্মচারী বেষ্টিত, সুতরাং বিষয়ের উন্নতি সাধনে কৃতকার্য্য হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। সংসার ক্রমশই অবসন্ন হইতে লাগিল; ইহার উপর আবার গবর্ণমেণ্ট রাজার দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তরের প্রতি হস্ত প্রসারণ করিলেন (১)।

(১) ধনাভাবে রাজসংসারের এতদূর পর্য্যন্ত দুরবস্থা হইয়াছিল, যে এক দিবস প্রাতঃকালে, রাজবাটীর প্রধান কর্ম্মচারী, সেই দিনের আবশ্যক ব্যয় কিরূপে নির্ব্বাহ করিবেন, এই চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে, রাজ-সংসারের মেথুরাণী (যে রাজবাটীতে মৎস্য আম্র কাঁটাল ইত্যাদি যোগাইয়া থাকে) সহসা তাঁহার সমীপস্থ হইয়া কহিল "আমার অনেক টাকা পাওনা হইয়াছে, আপনি, আজ কাল করিয়া, এত দিবস ভাঁড়াইতেছেন, আমার আর চলে না, আমি আজ টাকা না লইয়া উঠিব না।" কর্ম্মকারক ঐ রম-ণীর অঙ্গের আভরণের প্রতি দৃষ্টি করিবা মাত্র, "অদ্যকার চলিবার উপায় ত হইল," এই মনে ভাবিয়া, ঈষৎ কৃত্রিম রোষ প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, "তুই সর্ব্বনাশ করেছিস; তুই অন্তঃপুরে অলঙ্কার পরিয়া কেন যাস। তোর হাতের ঐ রূপার বাউটি দেখিয়া, রাণী আদেশ করিয়া পাঠাইয়াছেন, ঠিক ঐ প্রকারের সোণার বাউটি অবিলম্বে প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। দেখ-দেখি এখন আমি এত টাকা কোথায় পাই। যাহা হউক, তোর বাউটি খুলিয়া আমাকে দিয়া যা, সেকরাকে দেখাইতে হইবেক। মেথুরাণী, আমার আভ-রণ দেখিয়া রাণীর আভরণ হইবেক এই ভাবিয়া আহ্লাদে গদগদ হইয়া, তৎক্ষণাৎ বাউটি, হস্ত হইতে মোচন পূর্ব্বক, কর্ম্মচারীর হস্তে অর্পণ করিল। কর্ম্মকর্ত্তা, ঐ ভূষণ বন্দক দিয়া, প্রয়োজনীয় ব্যয় সম্পাদন করিলেন।

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

১৭৯৩ খৃঃ অব্দে, যখন গবর্ণমেণ্ট জমীদারীর দশসালা বন্দোবস্ত করেন, তখন জমীদারের সহিত এই নিয়ম বদ্ধ হয় যে, জমীদারীর মধ্যে যে সকল নিষ্কর মহাল বা ভূমি আছে, তাহার সহিত জমীদারের কোন সম্বন্ধ থাকিল না, তাহার উপর গবর্ণমেণ্টের সম্পূর্ণ স্বামিত্ব রহিল। ১২০২ বাঃ অব্দে, এই জেলার কালেক্টরী হইতে এই মর্ম্মে এক ঘোষণা পত্র (ইস্তাহার) দেওয়া হয় যে, নিষ্কর ভূমির অধিকারিগণ, আপন আপন অধিকৃত মহাল বা ভূমির দাতা, গৃহীতা ও বর্ত্তমান অধিকারীর নাম, ভূমির পরিমাণ, গ্রাম, বা ভূমি যে গ্রামে থাকে, তাহার নাম, রাজদত্ত সনন্দ ও দানের সন তারিখ ইত্যাদি বিষয়ের হকিকত অর্থাৎ বিবরণ পত্র, নির্দ্দিষ্ট কালের মধ্যে কালেক্টরীতে দাখিল করেন। এই ঘোষণায় নিষ্করভূমি-ভোগিগণ, আগ্রহের সহিত, ঐ আদেশানুযায়ী বিবরণ পত্র কালেক্টরীতে প্রদান করেন এবং কালেক্টর সাহেবের স্বাক্ষরিত এক এক তায়দাদ, অর্থাৎ নিরূপণপত্র, প্রাপ্ত হন। ১২০৯ বাঃ অব্দে, পুনরায় উপরোক্তরূপ ঘোষণা দেওয়া হইলে, যাঁহারা পূর্ব্বে হকিকত দেন নাই, তাঁহারা তাহা প্রদান করিয়া তায়দাদ লন। এই জেলাতে যত নিষ্করভূমি আছে, তাহা এইরূপে কালেক্টরির কাগজবদ্ধ হয়। ১৮৩৪ কি ৩৫ খৃঃ অব্দে, প্রকৃত ও অপ্রকৃত নিষ্কর ভূমির নিরূপণের বিচার আরম্ভ হয়। এই কার্য্য করিবার নিমিত্ত, প্লোডিন সাহেব নামে এক জন, এস্পেশল ডেপুটি কালেক্টর নিযুক্ত হইয়া

আইসেন। তিনি, রাজসরকারের সমস্ত দেবোত্তর ও অপর নিষ্কর ভূমির মোট অষ্ট সহস্র টাকা বাৎসরিক রাজস্ব স্বীকার করিতে, অথবা ঐ সকল ভূমির নিষ্কর থাকিবার যে যে কারণ ও প্রমাণ থাকে তাহা দর্শাইতে, আদেশ করিলেন। রাজা, অপ্রাজ্ঞ মন্ত্রীর মন্ত্রণায়, প্রস্তাবিত রাজস্ব প্রদানে অসম্মত হইয়া, নিষ্কর ভূমির প্রমাণ দিতে উদ্যত হইলেন। রাজারা নিজে দাতা, সুতরাং আপনাদের বিষয় আপনাদিগকে দান করিবার সম্ভাবনা ছিল না; কেবল আপনাদের প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি বিগ্রহকে, তাঁহাদের সেবার নিমিত্ত, কয়েক খানি গ্রাম ও কিয়ৎপরিমাণ ভূমি, এবং এই রাজবংশের মধ্যে কেবল রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, আপনার দুই রাজ্ঞীকে নানা গ্রামের কিছু কিছু ভূমি দান করেন। ইহাঁরা যে সকল ব্যক্তিকে ভূমি দান করেন, তাঁহারা ইহাঁদের দত্ত সনন্দ ও অন্য অন্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন। কিন্তু যাঁহারা নিজে সহস্র সহস্র ব্যক্তিকে সহস্র সহস্র বিঘা ভূমি দান করিয়াছেন, তাঁহাদের যে, আপনাদের স্থাপিত দেবতার বা রাণীদিগের যৎকিঞ্চিৎ নিষ্কর ভূমি রক্ষার্থ, এরূপ প্রমাণের প্রয়োজন আদৌ হইবেক, ইহা কখন রাজাদিগের মনে উদয় হয় নাই। সুতরাং, তাঁহাদের এই সকল নিষ্কর ভূমির সনন্দ বা অন্য কোন প্রকার বিশেষ প্রমাণ সংগৃহীত ছিল না, এবং এক্ষণে গবর্ণমেণ্টের নিদেশানুযায়ী প্রমাণ প্রদানের সামর্থ্য হইল না। যে কিছু প্রমাণ দেওয়া গেল, তাহা বিচারে দুর্ব্বল বোধ হইল, এবং ক্রমশঃ প্রায় সমস্ত মহাল, করের যোগ্য স্থির হইয়া, জরিপ জমাবন্দি আরম্ভ হইল। আর এই সমস্ত কার্য্য সমাধানান্তে বন্দোবস্ত করিয়া লইবার আদেশ হইতে

লাগিল। রাজা খাসকমিশনর সাহেবের নিকট আপীল করিবেন বলিয়া, মহাল আপন হস্তে রাখিবার প্রয়াস পাইলেন। গবর্ণমেণ্ট, খাস কমিশনরের বিচারকাল পর্য্যন্ত, তাঁহার নিষ্কর ভূমির আনুমানিক রাজস্বের পরিমাণের প্রতিভূ চাহিলেন। রাজা তাহা দিতে অসম্মত হওয়াতে, তাঁহার প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইল, এবং কোন কোন মহালে গবর্ণমেণ্টের খাস তহসিল হইতে আরম্ভ হইল ও কোন মহাল অন্যের সহিত ইজারা বন্দোবস্ত হইতে লাগিল।

দুঃসময়ে, বিপদ্ কত প্রকার আকার ধারণ করিয়া উপস্থিত হয়, তাহা কেহই জানিতে পারে না। পূর্ব্বে বর্ণিত হইয়াছে, রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের অন্য অন্য পুত্রপৌত্রদিগের সহিত এ রাজাদিগের প্রথমে জমীদারী, ও পরে মোশাহেরা সংক্রান্ত অনেক বিবাদ হয়, ও তন্নিবন্ধন উভয় পক্ষের মধ্যে সাতিশয় শত্রুতাভাব থাকে। ঈশানচন্দ্রের পুত্রদিগের সহিত শেষবার মোশাহেরা সম্বন্ধীয় যে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়, উভয় পক্ষ সুহৃদ্ভাবে তাহার নিষ্পত্তি করেন। তৎকালে, ঈশানচন্দ্রের তিন পুত্র বর্ত্তমান, তাঁহার মধ্যে জ্যেষ্ঠ নরহরিচন্দ্র অতি বুদ্ধিমান্ ও গুণবান্ ছিলেন; গিরীশচন্দ্র, তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া, অতীব প্রীত হন এবং ১২৩৯ বাঃ অব্দে, তাঁহাকে আপনার বিষয়ের সর্ব্বাধ্যক্ষ করেন। নরহরি, রাজবাটীতে অবস্থান করিয়া, বিষয়ের উন্নতিসাধনে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু তাঁহার কর্ত্তৃত্বে ইষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, বিলক্ষণ অনিষ্ট হইয়া উঠিল। তৎকালেও রাজসংসারে ন্যূনাধিক চারি লক্ষ টাকার মণি মুক্তা প্রবাল ও রজত কাঞ্চন ছিল। রাজারা, বিবিধ বিপদ ও ক্লেশ সত্ত্বেও, তাহার এক খানিও অপচয়

করেন নাই। পূর্ব্বে ঐ সমস্ত দ্রব্য তোষাখানা নামে এক বৃহৎ অট্টালিকা মধ্যে থাকিত, রাণীদিগের আভরণ বা কাঞ্চন রজত নির্ম্মিত পাত্রাদি, প্রয়োজনানুসারে, অন্তঃপুরে প্রেরণ করা যাইত, এবং প্রয়োজন সমাধানান্তে পুনরায় নির্দ্দিষ্ট স্থানে ন্যস্ত হইত। এই রাজার সময়ে, এই সুরীতি বলবতী থাকে নাই। কনিষ্ঠা রাজ্ঞীর নিকট যে সকল দ্রব্য যাইত, তৎসমুদয় প্রায়ই পুনরাগত হইত না। রাজমহিষী আমার নিকট থাকিবে বলিয়া রাখিতেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা অন্তঃপুরে থাকিত না; তৎসমুদয় চিরদিনের নিমিত্ত তাঁহার পিতৃভবনে যাইত। রাজা এ সকল সম্বাদ শুনিতে পাইতেন, এবং দুঃখিত হইতেন; কিন্তু ইহার প্রতিবিধানের কোন চেষ্টা করিতেন না। তোষাখানা ভগ্ন হইলে, রাজবাটীর প্রবেশ দ্বারের উভয় পার্শ্বে সুাখানা (অস্ত্রাগার) নামে যে দুই বৃহৎ গৃহ ছিল, তাহারই মধ্যে সমস্ত রত্নাদি কাষ্ঠের সিন্দুকের মধ্যে থাকিত। বিশ্বস্ত রক্ষকগণ রাত্রে দ্বার রুদ্ধ করিয়া, ঐ সকল সিন্দুকের উপর শয়ন করিয়া রহিত; প্রহরিগণ বহির্দ্দেশে থাকিয়া, দ্বার রক্ষা করিত। নব সর্ব্বাধ্যক্ষ নরহরিচন্দ্র, ঐ সকল দ্রব্যের তালিকা করিবেন বলিয়া, গৃহ-দ্বয়ের দ্বার রুদ্ধ করিয়া, তাহাতে বাতাবন্দি করিলেন, এবং এই বন্দোবস্ত করিবার পরে, প্রয়োজনানুরোধে, নিজ নিকেতনে গমন করিয়া, কয়েক দিন থাকিলেন। তৎকালে রাজা কলি-কাতায় ছিলেন। রাজনন্দনের বর্ষবৃদ্ধির দিন উপস্থিত হওয়াতে তিনি, দ্বার মুক্ত করিয়া, আপন ব্যবহারের অলঙ্কার বাহির করিতে আদেশ দিলেন। কর্ম্মচারিগণ, দ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়া, গৃহ মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক দেখিলেন, যে সকল সিন্দুকে মণিমুক্তা প্রবাল ও মূল্যবান্ বস্ত্রাদি ছিল, তাহা উদ্‌ঘাটিত রহিয়াছে

এবং তন্মধ্যস্থিত দ্রব্যজাত অন্তর্হিত হইয়াছে; সিন্দুকের নিকট কতকগুলি দগ্ধ তৃণ পড়িয়া রহিয়াছে। অনুমান হইল, গৃহের ছাতে যে বাতায়ন ছিল, তস্করেরা তাহাতে রজ্জু সংযোগপূর্ব্বক গৃহমধ্যে অবরোহণ করিয়া তৃণ জ্বালিয়া প্রদীপ প্রজ্বলিত করিয়াছিল, এবং দ্রব্যাদি অপহরণ করণানন্তর পুনরায় ঐ বাতায়ন দিয়া বহির্গত হইয়াছিল। শাল রুমাল ইত্যাদির কিয়দংশ লইয়াছে ও কিয়দংশ ফেলিয়া গিয়াছে। অপহৃত দ্রব্যের আনুমানিক মূল্য তিন লক্ষ টাকার ন্যূন নহে। এই দুর্ঘটনার পরে, নানা কারণে, নরহরিচন্দ্রের সহিত রাজার অসদ্ভাব হইতে লাগিল, এবং অনতিকাল মধ্যে বিলক্ষণ চিত্তভেদ হইয়া উঠিল। পরিশেষে উভয়ের মধ্যে যে নূতন সম্বন্ধ হইয়াছিল তাহা ১২৫১ বাঃ অব্দে দূরীভূত হইল।

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে রাজা বন্দোবস্ত করিয়া না লওয়াতে, অথবা রাজস্বের পরিমাণ জামিন দিয়া খাসকমিশনারীতে আপীল না করাতে, তাঁহার প্রায় সমস্ত নিষ্কর মহাল, কালেক্টরি হইতে অন্যের সহিত বন্দোবস্ত হইয়াছিল। ১২৪৫ বাঃ অব্দে, তিনি বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্টের নিকট এই রূপ আবেদন করিলেন যে, “আমার প্রায় সমস্ত জমীদারী নীলাম হইয়া গিয়াছে,—এক্ষণে কেবল নিষ্কর ভূমির উপস্বত্বের উপর নির্ভর করিয়া, অতি কষ্টে সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছি। যদি তাহার উপর কর-স্থাপন করা হয়, তবে আমার জীবিকা-নির্ব্বাহের আর কোন উপায় থাকিবেক না। আমার পূর্ব্বপুরুষ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, এ প্রদেশ আপনাদের অধিকৃত হইবার বিষয়ে, বহুতর যত্ন ও পরিশ্রম করিয়াছিলেন; অতএব আপনাদিগের রাজত্বে আমার এতাদৃশ দুর্গতি হওয়া ন্যায় ও বিচার সঙ্গত হয় না। এক্ষণে আমার

প্রার্থনা, আমার ঐ পূর্ব্ব পুরুষ কৃত উপকার স্মরণ পূর্ব্বক আমার প্রতি কৃপা করিয়া, আমার নিষ্কর ভূমির মুক্তিদান করুন, অথবা আমার জীবিকা নির্ব্বাহোপযোগী বৃত্তি দিয়া, আমার সমস্ত নিষ্কর ভূমি গ্রহণ করুন।” এ বিষয়ে সদর বোর্ডের সাহেবেরা, ১৮৪৬ খৃঃ অব্দে, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে এই রূপ লেখেন যে, “রাজার পূর্ব্বপুরুষ গবর্ণমেণ্টের কত দূর সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা আপাততঃ জানা যাইতেছে না, কিন্তু এই রাজা অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত-বংশোদ্ভূত, এবং ইদানীং সাতিশয় দুর্দ্দশাগ্রস্ত; অতএব ইঁহার প্রতি গবর্ণমেণ্টের কৃপাবলোকন করা উচিত। রাজা বিষয় ব্যাপারে যেরূপ অপটু এবং ইঁহার কর্ম্মচারিগণ যেরূপ বিশ্বাস-ঘাতক, তাহাতে ইঁহার সহিত এই নিষ্কর মহাল সকল বন্দোবস্ত করিলে, তিনি যে তাহার রাজস্ব যথানিয়মে দিতে পারিবেন, এরূপ বোধ হয় না; অতএব আমাদিগের বিবেচনায় এইরূপ করিলে ভাল হয় যে, যাবৎ এই রাজা জীবিত থাকেন, তাবৎ তাঁহাকে মাসিক এক সহস্র টাকা মোশাহেরা এবং তাঁহার নিষ্কর মহাল সমস্ত, কোন প্রকার বন্দোবস্ত করিয়া, তাহার বার্ষিক উৎপন্নের শত করা দশ টাকা মালিকানা দেওয়া যায়, এবং তাঁহার লোকান্তর গমনের পর, তাঁহার দত্তক পুত্র, যাঁহাকে মিতব্যয়ী বোধ হইতেছে, তাঁহার সহিত এই সকল মহালের বন্দোবস্ত করা হয়।” গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরি এফ, জে, হেলিডে সাহেব বোর্ডের পত্রের এই উত্তর লেখেন যে “তোমাদের প্রস্তাবিত বন্দোবস্তে রাজা সম্মত আছেন কি না ইহা জানিয়া লিখিবা।” রাজা এই রূপ বন্দোবস্তে অসম্মত হওয়াতে গবর্ণমেণ্ট ঐ বিষয়ে আর মনোযোগ করিলেন না।

যে প্রণালীতে রাজার নিষ্কর ভূমির বিচার হয়, সেই প্রণা-

লীতে নদীয়া জেলার অন্য অন্য লোকেরও নিষ্কর ভূমির বিচার হইয়াছিল। অতি অল্প ভাগ্যবান্ পুরুষ ব্যতীত প্রায় সমস্ত লোকেরই নিষ্কর ভূমি করের যোগ্য স্থির হয় এবং তাহার উপর এত অধিক কর ধার্য্য হয় যে, তাহা দিতে হইলে তাঁহাদের নিজের কিছুমাত্র লাভ থাকে না; সুতরাং, প্রথমে অনেকেই বন্দোবস্ত করিয়া লইতে অসম্মত হইলেন। কালেক্টর সাহেব তাঁহাদের মধ্যে কাহারও ভূমি অন্যকে ইজারা দিতে এবং কাহারও ভূমিতে তহসিলদার নিযুক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। দুর্ভাগা নিষ্কর-ভোগীদিগের মধ্যে কেহ বা, আপন বিষয় হস্তান্তর গত হইতেছে দেখিয়া, কেহবা, তহসিলদার কর্ত্তৃক আপনার রাইয়তগণকে প্রপীড়িত দর্শন করিয়া, অবশেষে ঐ উচ্চ জমাই স্বীকার পূর্ব্বক বন্দোবস্ত করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। যাঁহারা কিছু ধনশালী ছিলেন তাঁহারা কোনরূপে রাজস্ব প্রদান করিতে লাগিলেন; কিন্তু যাঁহাদের নিষ্কর ভূমির উপস্বত্ব মাত্র উপজীবিকা ছিল, তাঁহারা অল্প কালের মধ্যেই নির্দ্ধারিত কর প্রদানে অসমর্থ হইলেন। যদিচ গবর্ণমেণ্ট এই নিয়ম করিয়াছিলেন যে, এই রূপ নিষ্কর ভূমির বার্ষিক উৎপন্নের অর্দ্ধাংশ গবর্ণমেণ্ট লইবেন ও অর্দ্ধাংশ নিষ্কর ভোগীরা পাইবেন, তথাচ নিষ্কর-ভোগীদিগের কোন উপকার হয় নাই। রাজপুরুষেরা এই সকল ভূমির এত উচ্চ জমা ধার্য্য করিয়াছিলেন যে, তাহাতে ভূমির উৎপন্ন হইতে গবর্ণমেণ্টের প্রাপ্যাংশ পরিশোধ করণান্তে প্রায় কিছুই উদ্বৃত্ত থাকিত না। সুতরাং, অধিকাংশ লাখেরাজ-ভোগীরা, প্রথমে গ্রাসাচ্ছাদনের কষ্ট সহ্য করিয়াও এবং সর্ব্বস্ব বন্দক দিয়াও নির্দ্ধারিত রাজস্ব প্রদান করিলেন; কিন্তু দুই তিন বর্ষ পরে নিরুপায় হইয়া বহু-পুরুষের স্নেহের বস্তুর আশা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন।

অনতি দীর্ঘকাল মধ্যে রাজস্ব বাকী পড়াতে, চারিশত নম্বর লাখেরাজ নিলাম হইয়া গেল। যাহা অৰ্দ্ধসভ্য যবন ভূপালেরা, অথবা তাঁহাদের জমীদারেরা কাহারও ধর্ম্মের পুরস্কার, কাহারও গুণের পুরস্কার, বলিয়া, প্রজাগণকে দান করিয়াছিলেন, তাহাও বর্ত্তমান সভ্য শাসনকর্ত্তাগণ, অকাতর অন্তঃকরণ ও স্বচ্ছন্দ চিত্তে আত্মসাৎ করিলেন।

যৎকালে গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষস্থ নিষ্করভোগীদিগের প্রতি এইরূপ নিষ্পীড়ন করেন, তৎকালে এদেশস্থ কোন সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি, তাঁহার ইংলণ্ডবাসী জনৈক আত্মীয়কে লেখেন "আপনারা, ইংলণ্ডে বসিয়া, কেবল পূর্ব্ব, পশ্চিম, ও উত্তরে আমাদের যে যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে, তাহারই সংবাদের প্রতি মনোনিবেশ করিয়াছেন, কিন্তু এদেশের নিষ্কর ভূমি গ্রহণের অতি নিদারুণ উপায় অবলম্বন করাতে, ভারতবর্ষের ইঙ্গরেজাধিকারস্থ প্রজারা, গবর্ণমেণ্টের উপর, যে কত দূর অসন্তুষ্ট হইয়াছে, তাহা আপনারা কিছুই জানিতে পরিতেছেন না। এক্ষণে 'আমি এই ভূমির অধিকারী' ইহা কেহই বলিতে পারেন না। রাজপুরুষেরা গবর্ণমেণ্টভুক্ত করিবার মানসে, বিবিধ ছলে, সূচাগ্র ভূমি পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিতেছেন। তাঁহাদের কার্য্যপ্রণালী, স্পেনিশ্ ইন্‌কুইজিসন্ হইতেও অপকৃষ্ট, ইহা বলিলেও স্বরূপ বর্ণনা হয় না। ভূমিই যাঁহাদিগের সর্ব্বস্ব ধন, যাঁহারা এ পর্য্যন্ত ভূমির উপস্বত্ব দ্বারাই আপনাদের ও সন্তানসন্ততিদিগের গ্রাসাচ্ছাদন সম্পন্ন করিয়াছেন, এবং যাঁহারা, ঐ ভূমি আপন সম্পত্তি ভাবিয়াও, মরণান্তে ঐ ভূমি তাঁহাদের সন্তানদিগের উপজীবিকাস্বরূপ হইবে এই আশয়ে নিশ্চিন্ত হইয়া, সুখে কালাতিপাত করিয়া আসিতেছেন, সেই সকল ব্যক্তি, এক্ষণে এক জন অনীতিজ্ঞ কর্ম্মচারীর

লেখনীর সঞ্চালন প্রভাবে সেই সর্ব্বস্ব ধনে বঞ্চিত হইলেন। ইহাও সম্ভব যে ঐ কর্ম্মকারকগণ প্রভুর ইষ্টসাধনে আপনারা কত দূর ব্যগ্র ইহা দেখাইবার জন্য, অথবা আপনাদের পদের উন্নতির নিমিত্ত এইরূপ বিচার করিতেছেন *।

রাজা, ১২৪৮ বাঃ অব্দের অগ্রহায়ণ মাসে, উৎকট-জ্বরাক্রান্ত হইয়া, নবদ্বীপে নীত হন, এবং তথায় কয়েক দিন অবস্থান করণানন্তর ঐ মাসের ষড়্বিংশতি দিবসে মানবলীলা সম্বরণ করেন। তাঁহার বয়ঃক্রম পঞ্চান্ন বৎসর হইয়াছিল।

গিরীশচন্দ্র অতি সুশ্রী ছিলেন, কিন্তু যৌবনাবস্থা অতিক্রম না করিতেই, শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘনবশতঃ শ্বাসরোগাক্রান্ত হইয়া কৃশ ও দুর্ব্বল হইয়াছিলেন। ইনি কোন বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন না, কিন্তু সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা অনর্গল কহিতে ও অনায়াসে বুঝিতে পারিতেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে একরূপ ব্যুৎপত্তি ছিল; অতি অল্প বুদ্ধি, লঘুচিত্ত, এবং নিতান্ত অসার ছিলেন; সকলের কথাই শুনিতেন এবং সকলের প্রতিই বিশ্বাস করিতেন। তাঁহার দয়া ও ধর্ম্ম যথেষ্ট ছিল, কিন্তু কুসংস্কার দোষে তাহা হইতে কোন হিতজনক ফল উৎপন্ন হয় নাই। ব্যয় করিবার বিলক্ষণ ইচ্ছা ছিল, কিন্তু আয়ের প্রতি দৃষ্টি ছিল না। পূর্ব্বপুরুষের ন্যায়, ইহাঁরও শাস্ত্রালাপে ও রহস্য বিষয়ে আমোদ ছিল। ইহাঁর সভাতে নদীয়া জেলার অন্তর্গত বাগোয়ানের সন্নিহিত বাঁড়েবাঁকা গ্রামবাসী বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ কৃষ্ণকান্ত ভাদুড়ি নামক এক জন অসাধারণ দ্রুতকবি, সুরসিক, ও সদ্বক্তা ছিলেন। রাজা তাঁহার নাম রসসাগর রাখেন, এবং তিনি ঐ নামেই সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ হন। কেহ কোন

* George Thompsons Lectures on British India.

ভাবের এক বা সার্দ্ধ চরণ অথবা এক চরণের কিয়দংশ বলিলে, তিনি ক্ষণ বিলম্ব ব্যতিরেকে, উপর্য্যুপরি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে, তাহা অনায়াসে পূরণ করিতেন। তাঁহার নিজের ও প্রাচীন লোকের মুখে তদীয় রচিত যে সকল কবিতা শুনিয়াছি, দুর্ভাগ্যবশতঃ তন্মধ্যে উৎকৃষ্টগুলি বিস্মৃত হইয়াছি; সুতরাং, তাঁহার গুণের সম্পূর্ণ পরিচয় দিতে পারিলাম না। যে সকল কবিতা এখনকার প্রায় সকল প্রাচীন লোকেই জানেন তাহার মধ্যে কয়েকটি পশ্চাৎ উদ্ধৃত করিতেছি। যথা, একদা রাজমহিষী রাজার অপ্রিয় বাক্য শ্রবণে, ব্যথিতান্তঃকরণে স্বামিকে কহিলেন "বল বল বল।" রাজা অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইয়া রসসাগরকে কহিলেন "বল বল বল।" কবিবর তৎক্ষণাৎ ঐ সমস্যার এইরূপ পূরণ করিলেন;—

দম্পতি কলহে স্বামী হয়ে ক্রোধ মন।
কহেন প্রেয়সী প্রতি অপ্রিয় বচন॥
পতিবাক্যে সতী চক্ষে জল ছল ছল।
বলিতে দিয়াছে বিধি বল বল বল॥

মহারাজা সতীশচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিলে, রাজা, পৌত্রলাভে, যার পর নাই পুলকিত হইয়া, রসসাগরকে কহিলেন "মহী দূর কর মেয় নৃত্য করি।" তিনি ইহার এইরূপ পূরণ করিয়া দিলেন,

নৃপনন্দননন্দন রাজধানী অবতীর্ণ
য্যায়সে গোকুলে অবতার হরি।
চউদ্য ভুবন জন নাচেত গাওয়েত
চৌষট্ যোগিনী তাল ধরি॥

অপ্সর কিন্নর দশদিগধীশ্বর
তর্ তর্ শ্রীল গিরীশপুরী।
এৎনেক বোলে অহিরাজ কহে
মহী দূর কর মেয় নৃত্য করি॥

পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, যৎকালে প্লৌডিন সাহেব নামে এক জন বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত ডেপুটীকালেক্টর রাজার সমস্ত দেবোত্তর ও ব্রহ্মোত্তর আটক করেন, তৎকালে রাজসংসারের যৎপরোনাস্তি অপ্রতুল হয়, এবং তদানীন্তন কর্ম্মাধ্যক্ষ রামমোহন মজুন্দার নানা কৌশলে রাজার সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন। তিনি ধনাভাবে সকলকে মিথ্যা আশ্বাস দিতেন এবং মিথ্যা অঙ্গীকার করিতেন; তিনি, দিব দিচ্চি বলিয়া, অনেক দিন রসসাগরের বেতন দেন নাই। মজুন্দার এক দিবস রাজসভায় আছেন, এমন সময়ে, রসসাগর তাঁহার নিকট বেতন চাহিলেন। মজুন্দার বিরক্ত হইয়া কহিলেন "আর মেনে পারিনে।" রাজা কহিলেন, "রসসাগর আর মেনে পারিনে।" কবি অবিলম্বে ইহার পাদপূরণ করিলেন, যথা;

দাঁড়ি ফেলে শ্রীফেঁদে, সুধু হাঁড়ি পাত বেঁদে,
রেখেছি বচনে ছেঁদে, আশা ভঙ্গ করিনে।
সবে বলে মজুন্দার, দয়া ধর্ম্ম কি তোমার,
তিরস্কার পুরস্কার, তৃণ বোধ করিনে॥
খরচ চাই দণ্ড দণ্ড, নামিলে রজত খণ্ড,
কোনরূপে কর্ম্মকাণ্ড, ক্রিয়ে পণ্ড করিনে।
কোম্পানি কুপিত তায়, দ্বাদশ সূর্য্য উদয়,
প্লৌডিনের পূর্ণোদয়, বাঁচিওনে মরিওনে॥

সকলি দুঃখের পাড়া, এ রসসাগরে চড়া,
শ্রীচরণ ছায়া ছাড়া, কার ধার ধারি নে।
তিন দিগে তিন তেতম্বা, কি হইবে অপরম্বা,
কূল দেও মা জগদম্বা, আর মেনে পারিনে ॥

এক দিবস, রাজা নগর পরিভ্রমণ করিয়া আসিবামাত্র রসসাগরকে কহিলেন "গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর।" কবিবর কিঞ্চিৎ কাল চিন্তা করিয়া উত্তর করিলেন,—

কৃষ্ণের নগর কৃষ্ণনগর বাহির।
বারোয়ারি মা ফেটে হয়েছেন চৌচির ॥
ক্রমে ক্রমে খড় দড়ি হইল বাহির।
গাভীতে ভক্ষণ করে সিংহের শরীর ॥

একদা রাজা অর্দ্ধগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দর্শন করিয়া কহিলেন, রসসাগর "খেতে খেতে খেলেনা।" তিনি কহিলেন,—

কেঁদে কহে বিরহিণী, মণিহারা যেন ফণি,
অভাগীর পক্ষে হিত, কেহ ত করিলে না।
অবলার ভাগ্যফলে, পশুপতির কোপানলে,
মদনেরে এক কালে, দহিয়ে দহিলে না ॥
সেতুবন্ধে নানাগিরি, উপাড়িয়া বাঁধে বারি,
হনুমান্ বলবান্, মলয়া ভাঙ্গিলে না।
হেদে বেটা চণ্ডালিয়ে, পূর্ণ শশী মুখে পেয়ে,
গ্রহণেতে গ্রাসিয়ে, খেতে খেতে খেলেনা ॥

এক দিন শান্তিপুরের ঘাটে নৌকাতে রাজা ও রসসাগর আছেন, এমন সময়ে এক ডাকবাহক, ডাক পুলিন্দা স্কন্ধে করিয়া

ভাগীরথী তীরে উপনীত হইল, এবং পারঘাটের নৌকার নাবিককে দেখিতে না পাইয়া, মুকুন্দ নামে কর্ণধারকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিল। রাজা কহিলেন, 'রসসাগর মুকুন্দ মুরারে।' তিনি বলিলেন,—

পাপের পুলিন্দা বতে ভগ্ন হল পা রে।
নিয়মিত ঘণ্টা মধ্যে যেতে হবে পারে॥
নায়েতে নাহিক মাঝি ডাক রসনা রে।
গোপাল গোবিন্দ কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারে॥

রসসাগরের রচিত এই রূপ পাদপূরণ কবিতা বিস্তর আছে। কেবল তাঁহার প্রশ্নকর্ত্তার মনোগত ভাব অনুভব করিবার যে আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল, তাহা প্রদর্শনার্থ উপরোক্ত কবিতা কয়েকটি লিখিলাম। এই সকল কবিতাতে যে সমুদয় ছন্দঃপতন দোষ দৃষ্ট হয়, তাহা কেবল দ্রুতরচনা নিবন্ধন হইয়াছে, নচেৎ যে সকল সংস্কৃত বা ভাষা কবিতা অন্য অন্য সময়ে মনোনিবেশ পূর্ব্বক রচনা করিতেন, তৎসমুদয়ে এ সমস্ত দোষ স্পর্শ হইত না; কিন্তু, তাঁহার ঈদৃশ দ্রুতকবিত্ব শক্তি থাকাতেই, তিনি এতাদৃশ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কেহ সমস্যা দিলে, তিনি যে উপর্য্যুপরি ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ও নানা ছন্দে, তাহা পূরণ করিতেন সে আরও চমৎকার। যথা, একদা রাজসভায় কোন ব্যক্তি সমাগত হইয়া এই সমস্যা উল্লেখ করিলেন যে, "নন্দের আলয়ে কৃষ্ণ রাধা সঙ্গে দোলে।" নন্দ নিকেতনে কৃষ্ণের রাধার সঙ্গে দুলিবার অসম্ভাবনা প্রযুক্ত সমস্যাদাতার মনে এই সমস্যার উদয় হয়। রসসাগর প্রথমে চারি চরণে ইহা পুরণ করিলেন, রাজা, কবিতার অপূর্ব্ব ভাবে সাতিশয়

প্রীত হইয়া, তাঁহাকে চারি টাকা পুরস্কার দিবার ইঙ্গিত করিলেন। কবি মহারাজকে কহিলেন "যদি অনুজ্ঞা হয় তবে পুনরায় আর একভাবে ছয় চরণে ইহা পূরণ করি।" রাজা অনুমতি দিলেন, কবি দ্বিতীয় বার যাহা রচনা করিলেন তাহাও অতি চমৎকার হইল। রাজা পুনর্ব্বার ছয় টাকা দিবার ইঙ্গিত করিলেন। রসসাগর, চরণে চরণে পুরস্কার দর্শনে উৎসাহিত হইয়া, রাজার অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক তৃতীয়বার নূতন ভাবে আট চরণে এ সমস্যা পূরণ করিলেন (১)।

তাঁহার দ্রুতকবিত্ব ও পাদ-পূরণ-শক্তি যেমন চমৎকার ছিল, তাঁহার উপস্থিত বাক্‌পটুতাও তেমনি সকলের মনোরঞ্জন করিত। তিনি মধ্যে মধ্যে যে সুরস বাক্য কহিতেন এবং সুমধুর উত্তর দিতেন, তাহার দুইটি পশ্চাৎ উল্লিখিত হইতেছে। একদা তিনি চৈত্রসংক্রান্তির পূর্ব্বদিবস, রাজসংসারের কর্ম্মাধ্যক্ষ রামমোহন মজুমদারের নিকট, পরদিন কলসী উৎসর্গ করিতে হইবে বলিয়া, কিঞ্চিৎ বেতন চাহিলেন, এবং তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ না হওয়াতে অতিশয় বিষাদিত হইয়া যুবরাজ শ্রীশচন্দ্রের সন্নিধানে গমন করিলেন। যুবরাজ কতিপয় বয়স্য সমভিব্যাহারে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তিনি উপস্থিত হইলেন। রাজকুমার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আজ নূতন কি?" তিনি উত্তর করিলেন "শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কোন পিতৃক্রিয়া পণ্ড হইলে অরণ্যে রোদন করিয়া এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিবে, একারণ আমি কিয়ৎক্ষণ মজুমদারের নিকট রোদন করিয়া আইলাম।" কোন সময়ে, এই জেলাস্থ কোন বৈদ্য

(১) এই কয়েকটি কবিতা আমি কবির নিজের মুখে শুনিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ স্মরণ না থাকাতে পাঠকদিগের গোচর করিতে পারিলাম না।

জাতীয় ভূম্যধিকারীর ভবনে কলিকাতানিবাসী, অধুনা লোকান্তর-বাসী, প্রসিদ্ধ সুরসিক, সদ্বক্তা ও পাঁচালি গায়ক লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস আইসেন; ভূম্যধিকারী কৌতুকাভিলাষী হইয়া রসসাগরকে সেই সময়ে লইয়া যান। এই উভয় বিখ্যাত সুরসিকের পরস্পর বচনবৈদগ্ধী শ্রবণার্থ সকলেই কৌতুকাবিষ্ট হইলেন; এজন্য এক সমৃদ্ধ সভা হইল। এই রাজাদিগের অধিকার মধ্যে, কোন বৈদ্য গলদেশে যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতে পারিতেন না। যে গ্রামে এই ভূম্যধিকারীর বাস তাহা, ভিন্নরাজার অধিকার; সে স্থানের বৈদ্যেরা ব্রাহ্মণের ন্যায় পৈতা গলায় দিতেন; সুতরাং, সেখানকার বিপ্র ও বৈদ্য শ্রেণী মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ প্রত্যক্ষ হইত না। রসসাগর আপন পৈতাতে এক কড়া কড়ি বাঁধিয়া উপস্থিত হইলেন এবং ইহার কারণ কি, জিজ্ঞাসিত হইলে উত্তর করিলেন "এ বামুণে পৈতে" ইহা শ্রবণ মাত্রে ব্রাহ্মণেরা অতীব হাস্য করিয়া উঠিলেন, এবং বৈদ্যেরা অতিশয় লজ্জিত হইলেন। লক্ষ্মীকান্ত এক-চক্ষুহীন এবং রসসাগর শ্রীবিহীন ছিলেন। লক্ষ্মীকান্ত "আসুন আটপুণে ঠাকুর" বলিয়া রসসাগরকে সম্ভাষণ করিলেন; রসসাগর তৎক্ষণাৎ "থাকুরে বেটা চারিপুণে" বলিয়া, এই শিষ্টাচারের প্রতিশোধ দিলেন। সভাস্থগণ উভয়কেই জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনাদের কি বাক্‌চাতুর্য্য হইল, তাহা আমরা বুঝিতে প্যারিলাম না।" রসসাগর কহিলেন "প্রথম সম্ভাষণকারীকে জিজ্ঞাসা করুন।" লক্ষ্মীকান্ত উত্তর করিলেন "এ ঠাকুরটির আট-পুণের (অর্থাৎ দৈবজ্ঞ ব্রাহ্মণের) আকার কি না; দেখুন।" রসসা-গর প্রত্যুত্তর দিলেন "হাঁ, আমি আটপুণে বটে, কারণ আমার দুই চোখ, কিন্তু ও বেটার চারি পোণে এক চোখ।

এ রাজার সময়েও সংগীত শাস্ত্রের আলোচনা ভাল রূপ ছিল। তাঁহার পিতার সময়ের কএক জন বিদেশীয় ও স্বদেশীয় (১) বিখ্যাত গায়ক ও বাদক তাঁহার সময়েও বর্ত্তমান ছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি বিষয়াধিকারী হইবার অব্যবহিত পরেই, দিল্লি হইতে কায়েম্ খাঁ নামক এক জন গায়ক সপরিবারে হঠাৎ উপস্থিত হন। তাঁহার তুল্য ব্যুৎপন্নকেশরী গায়ক বঙ্গ রাজ্যে আর কখন আইসেন নাই। তিনি রাজসভায় উপনীত হইয়া নিবেদন করিলেন, মহারাজ, আমি দিল্লীশ্বর মহম্মদ সাহার গায়ক ছিলাম, তিনি স্বর্গারোহণ করাতে নিরাশ্রয় হইয়াছি। দিল্লী হইতে যে সকল গুণিগণ এদেশে আসিতেন, তাঁহাদের মুখে আপনার গুণমর্য্যাদক জনকের প্রভূত প্রশংসা শুনিয়াছিলাম; একারণ তাঁহার আশ্রয়ে থাকিব ভাবিয়া বহু ক্লেশ স্বীকার পূর্ব্বক এত দূর আসিয়াছি; কিন্তু তাঁহার পরলোক গমন হওয়াতে আমার সে আশাও মিথ্যা হইল।” গিরীশচন্দ্র কহিলেন “আমি নির্ধন ব্রাহ্মণ, যদি আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার আলয়ে থাকেন, তবে আমি আপনাকে স্বচ্ছন্দে রাখিতে ক্রুটি করিব না।” রাজা, এই বলিয়া, তাঁহার নিত্য ব্যয়ের নিমিত্ত মাসিক পাঁচশত টাকা নির্দ্ধারিত করিয়া দিলেন। কায়েম খাঁ অতি প্রাচীন হইয়াছিলেন, একারণ তিনি প্রায়ই গাইতেন না। মিয়াঁ খাঁ, হস্মু খাঁ ও দেলাওর খাঁ নামে তাঁহার যে তিন সুপণ্ডিত পুত্র সঙ্গে ছিলেন, তাঁহারাই গান করিতেন। কিছু কাল পরেই কায়েম লোকান্তর গমন করেন ও তদনন্তর মিয়াঁও তাঁহার পশ্চাদ্‌গামী হন। হস্মু খাঁ বহুকাল রাজবাটীতে থাকেন।

(১) এদেশীয় গায়ক দিগের মধ্যে গণপতি নামে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন।

তাঁহার স্বরের মাধুর্য্যের ন্যূনতা হইলে, তিনি, রাজার নিকট বিদায় লইয়া, প্রথমে কিয়ৎকাল শান্তিপুরে থাকেন, ও তৎপরে অবশিষ্ট জীবন কলিকাতায় যাপন করেন। কলিকাতার প্রসিদ্ধ গায়ক কালীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ইহাঁরি শিষ্য ছিলেন। কায়েমের কনিষ্ট পুত্র দেলাওর খাঁ যাবজ্জীবন রাজবাটীতেই থাকেন; মহারাজা শ্রীশচন্দ্র ইহাঁরি শিষ্য ছিলেন।

চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

যখন রাজা গিরীশচন্দ্র পরলোক গমন করেন, তখন তদীয় দত্তক পুত্র মহারাজা শ্রীশচন্দ্র দ্বাবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম অতিক্রম করিয়াছিলেন। পিতা বর্ত্তমানেই তিনি সাংসারিক ভার গ্রহণ করেন ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। বাল্যাবস্থা হইতেই, তিনি বিষয় বৃদ্ধি করিবার নিমিত্ত যথেষ্ট যত্ন ও শ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু পিতা বর্ত্তমানে কোন রূপেই পূর্ণমনোরথ হইতে পারেন নাই। এক্ষণে স্বাধীন হওয়াতে আপনার বাঞ্ছা পূর্ণ করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। তিনি প্রথমে সাংসারিক ব্যয়ের অনেক সঙ্কোচ করিলেন, তদনন্তর যে সকল নিষ্কর মহাল, গবর্ণমেণ্ট সকর করিয়া, তাঁহার পিতার হস্ত-বহির্ভূত করত, খাস তহসিলে রাখিয়াছিলেন, অথবা অন্যেকে ইজারা দিয়াছিলেন, তৎসমুদায় ক্রমশঃ বন্দোবস্ত করিয়া লইতে লাগিলেন, এবং এই সকল মহালের পূর্ব্বকার যে রাজস্ব দেনা ছিল, তাহা পরিশোধ করিবার কিস্তিবন্দি করিলেন। এই রূপে, সংসারের আবল্য অনেক দূরীভুত হইলে, তিনি সম্পত্তির উন্নতি সাধনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মধুসূদন সাণ্ডাল উখড়া এজমালিতে নিলাম খরিদ করেন; কিন্তু পরে, ঐ পরগণা বিভাগ করিয়া লন। মধুসূদন, ডিহি উসতপুর ও ডিহি শড়ক গোবিন্দনগর পান। কিছু কাল পরে, প্রথমোক্ত ডিহি ডেবিড্ সাহেবের নিকট ও শেষোক্ত ডিহি হারিস্ সাহেবের নিকট বিক্রয় করেন। রাজা ১২৫৩ বাঃ অব্দের ১২ ই ফাল্গুনে, ডেবিড্ সাহেবের অংশ ও ১৮৪৮ খৃঃ অব্দের ৫ ই এপ্রেলে, হারিস সাহেবের অংশ ক্রয় করিলেন। এই দুই ডিহি পাওয়াতে রাজার যার পর নাই আহ্লাদ হয়; কারণ এই উভয় ডিহি অধিকৃত হওয়াতে কৃষ্ণনগরের মধ্যে পাঁচ মৌজা ও তাহার সন্নিহিত সতের মৌজার উপর তাঁহার প্রভুত্ব হইল। পূর্ব্বে কৃষ্ণনগরের চারি আনা মাত্র তাঁহার ছিল, এক্ষণে বারো আনা হইল। রাজা, কিছু দিন পরে, নবদ্বীপ অধিকার করিবার জন্য অতিশয় ব্যগ্র হইলেন। নবদ্বীপ উখড়া পরগণার অন্তর্গত, সুতরাং ঐ পরগণা নিলাম হওয়াতে তাহাও নিলাম হইয়া যায়। ইদানীং এই নগরের মধ্যে, তেঘরি ও কালীনগর নামে দুই নিষ্কর মৌজা ও একটি পাড়া মাত্র রাজসংসারের ছিল।

যখন উভয় ক্রেতা এই পরগণা পরস্পর বিভাগ করিয়া লন, তখন নগরের দক্ষিণাংশ কাশীনাথের ও উত্তরাংশ মধুসূদনের হয়, এবং বুঁইচিআড়া নামে এক মৌজা সাধারণের থাকে। কিয়ৎ কালানন্তর মধুসূদনের অংশ রাসমণি ক্রয় করেন; রাজা ঐ দুই অংশই ক্রয় করিবার অথবা পত্তনী লইবার যত্ন করিতে লাগিলেন। পরে বহু যত্নে ও উচ্চ পণে কাশীনাথের অংশের কিয়দংশ ১২৫৯ বাঃ অব্দীতে ও অবশিষ্টাংশ ১২৬১ অব্দীতে, পত্তনি লইলেন; রাসমণির অংশ কোন রূপেই পাইলেন না।

তাঁহার পিতা পাঁচবাড়িয়া, সন্দহ ও ঘূর্ণী নামে যে তিন মৌজা পত্তনী দিয়াছিলেন, তিনি তাহা কৃষ্ণনগরের সংলগ্ন বলিয়া, বহু যত্নে ও ব্যয়ে ছেপত্তনী লইলেন। কৃষ্ণনগরের অবশিষ্টাংশও তিনি লইতে বিলক্ষণ কৃতসংকল্প হইয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার এক জন লোকের বিশ্বাসঘাতকতা প্রযুক্ত এ বিষয়ে সফল-যত্ন হইতে পারেন নাই।

ইংলণ্ডে রাজা কর্ত্তৃক কেহ লার্ড বা অন্য কোন সম্ভ্রান্ত উপাধি প্রাপ্ত হইলে তাহা যেমন পুরুষানুক্রমে তাঁহার বংশের থাকে, ভারতবর্ষে যবন অধিকার কালে সেরূপ প্রথা ছিল না। কোন সম্ভ্রান্ত উপাধি কেহ রাজার নিকট স্বয়ং না লইলে, তাঁহার পূর্ব্ব পুরুষের ঐ উপাধি ছিল বলিয়া তাহা ধারণ করিতে পারিতেন না। এ সকল উপাধি কেবল সম্রাটেরাই দিতেন; নবাব অথবা অন্য কোন রাজপুরুষরা দিতে পারিতেন না; একারণ, এ দেশ ইংরাজদের অধিকৃত হইলে, কোম্পানিও এই সকল উপাধি দিবার অধিকার আপন হস্তে রাখিলেন। রাজা শিবচন্দ্র নবাবের নিকট মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন; কিন্তু গবর্ণর জেনেরলের মঞ্জুর করিয়া লন। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও গিরীশ-চন্দ্র "ইঙ্গরেজ দিগের নিকট উপাধি লইলে কি মান বাড়িবেক" এই অহঙ্কার করিয়া পৈতৃক উপাধির প্রার্থী হন নাই। রাজা শ্রীশচন্দ্র পিতা ও পিতামহ অপেক্ষা বুদ্ধিমান্ ছিলেন, সুতরাং তিনি, তাঁহাদের দৃষ্টান্তের অনুগামী না হইয়া, ইঙ্গরেজ গবর্ণ-মেণ্টের নিকট পৈতৃক উপাধির প্রার্থী হইলেন। গবর্ণর জেনেরল ডালহৌসি সাহেব, ১৮৪৮ খৃঃ অব্দের জুলাই মাসের সপ্তবিংশ দিবসে, তাঁহার মহারাজা উপাধির ফরমাণ লেখাইয়া নদীয়া জেলার কালেক্টর সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

কালেক্টর সাহেব কৃষ্ণনগরের কালেজ গৃহে, বহু সমারোহ পূর্ব্বক, এক সভা করিয়া রাজাকে ঐ ফরমাণ প্রদান করিলেন। কিছু দিন পরে, প্রেসিডেন্সি বিভাগের কমিশনর সাহেব কৃষ্ণনগরে আসিয়া এ জেলাস্থ সমস্ত স্বদেশীয় ও বিদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি-গণকে আহ্বান পূর্ব্বক, এক সভা করেন এবং ঐ সভাতে রাজার বহু প্রশংসাবাদ করিয়া, তাঁহাকে গবর্ণমেণ্ট প্রদত্ত খেলেত দেন।

কিয়ৎকালানন্তর, শ্রীশচন্দ্র নদীয়া জেলাস্থ অনেক ভদ্র ও বুদ্ধিমান্ লোকের সহিত পরামর্শ করিয়া, রাজবাটীতে এক সাধা-রণ-হিতকরী সভা সংস্থাপন করিলেন এবং স্বয়ং ইহার সভাপতি হইলেন। সভ্যগণ প্রথমে নিষ্কর ভূমি-ভোগীদিগের দুরবস্থার প্রতিকার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন এবং ১৮৫০ খৃঃ অব্দে নদীয়া জেলাস্থ প্রায় যাবতীয় নিষ্কর ভূমির অধিকারিগণের স্বাক্ষরিত এক আবেদন পত্র সদর বোর্ডে দেওয়াইলেন। তৎকালে বোর্ডের প্রধান মেম্বর প্রসিদ্ধ সুহৃদয় ও সুবিচারক শ্রীযুত এইচ রিকেটস্ সাহেব ছিলেন। তিনি নদীয়া জেলার তদানীন্তন কমি-শনর জে. জে. হার্‌বি সাহেবের নিকট ঐ আবেদন পত্রের উত্তর চাহিলেন। কমিশনর, আপনার কৃত-কার্য্য স্থিরতর রাখিবার জন্য, যার পর নাই প্রয়াস পাইলেন এবং রোষাবিষ্ট চিত্তে রাজার আরও অনিষ্ট করিতে প্রবৃত্ত হইলেন; কিন্তু কিছুতেই তিনি আপনার দুষ্ট চেষ্টা সফল করিতে পারিলেন না। বোর্ডের সাহেবেরা, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া, লাখেরাজ ভূমির খাজানার নিরিখ তদন্ত করণার্থ, ই, টি, ট্রিবর সাহেবকে, ২৮ এ ডিসেম্বর, মফস্বলে পাঠাইলেন এবং তদন্তে হার্‌বি সাহেবের অবিচার সপ্রমাণ হইলে, ১৮৫২ খৃঃ অব্দের সেপ্‌টেম্বর মাসের দ্বিতীয় দিবসে, দুই শত টাকার অনধিক জমার মহালের রাজস্বের

তৃতীয়াংশ ও দুই শত টাকার অধিক জমার মহালের চতুর্থাংশ বাদ দিবার, এবং ঐ সকল মহাল, গবর্ণমেণ্টভুক্ত হওয়ার ছয় মাসের পর হইতে, অধুনাতন ন্যূন জমানুসারে সদর খাজানার হিসাব করিলে, লাখেরাজদারগণের যে টাকা প্রাপ্য হয়, তাহা তাঁহাদিগকে সুদ সহিত প্রত্যর্পণ করিবার, আর বাকী খাজানার নিমিত্ত যে সকল মহাল নিলাম হইয়া গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক ক্রীত হইয়াছিল, তৎসমুদায় লাখেরাজদারগণকে ফিরিয়া দিবার জন্য, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করিলেন। তৎকালে, বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরি মহামতি জে, পি, গ্রাণ্ট সাহেব ছিলেন; তিনি, কেবল সুদ দিবার অনুরোধ ব্যতীত, বোর্ডের আর সমস্ত অনুরোধ রক্ষা করিয়া, সেপ্টেম্বর মাসের সপ্তদশ দিবসে, বোর্ডে পত্র লিখিলেন (১)। এই ব্যাপার সম্পন্ন করিতে, রাজার বিস্তর অর্থ ব্যয় ও প্রভূত পরিশ্রম হয়। অন্য অন্য লাখেরাজদারগণের আবেদন পত্রে আপন আপন নাম স্বাক্ষর করা ব্যতীত আর কিছুই করিতে হয় নাই। রাজা স্বীয় লাভে যতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, তাঁহার দ্বারা শত শত লোকের মহোপকার হওয়াতে, তাহার চতুর্গুণ সন্তুষ্ট হন। তাঁহার পূর্ব্বপুরুষেরা ভূমি দান করিয়া যেরূপ আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছিলেন, তিনি, ঐ সকল রক্ষা করিয়া দেওয়াতে, সেইরূপ আশীর্ব্বাদ ভাজন হইলেন। হার্‌বি সাহেব, কমিশনরের পদের অযোগ্য স্থির হইয়া, অন্য পদে নিযুক্ত হইলেন।

---

(১) বাঙ্গালার গবর্ণমেণ্টের উপরোক্ত পত্রের এক স্থানে এইরূপ লিখিত আছে যে, "অসঙ্গত কর স্থাপনে নদীয়া জেলার লোকেরা যে বিষম ক্লেশ পাইয়াছে, এবং তন্নিবন্ধন রাজস্ব সংক্রান্ত বিচারের যে কলঙ্ক হইয়াছে, যদি এত ক্ষতি (অর্থাৎ অনেক টাকা লাখেরাজদারগণকে ফিরিয়া দিতে হইবেক) স্বীকার করিলেও, তাহার অপনয়ন হয়, তথাপি মঙ্গল বলিতে হইবেক।

কিছু দিন পরে, রাজা এতদ্দেশে বেদবিহিত ধর্ম্ম সংস্থাপন ও স্বদেশের কলুষিত রীতি সংশোধন করিতে যত্নবান্ হইলেন। তিনি, প্রথমতঃ, মনু, স্মৃতি, ভগবদ্গীতা, উপনিষদ্, ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠে প্রবৃত্ত হন, তদনন্তর, নবদ্বীপ ও ভাটপাড়া প্রভৃতি নানা স্থানের বৈদান্তিক, নৈয়ায়িক, ও স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণের সহিত বেদবিহিত পরব্রহ্মের উপাসনা এবং শাস্ত্রানুমোদিত বিধবা-বিবাহ বিষয়ের বিচার করেন। বুদ্ধিমান্ ও বিদ্বান্ পণ্ডিত-গণের মধ্যে যাঁহারা সরলচিত্ত, তাঁহারা মহারাজের অভিপ্রায় শাস্ত্র-সম্মত ও সর্ব্ব-জন-হিত বলিয়া স্বীকার করিলেন, কিন্তু দেশাচার ভয়ে, জন সমাজে আপনাদের মত প্রকাশ করিতে, বা তদনুযায়ী ব্যবস্থা দিতে, সাহস করিতে পারিলেন না। তাঁহাদের প্রধান ভয় এই হইল যে, তাঁহারা এই মত ব্যক্ত করিলে, সাধারণে, তাঁহাদিগকে নাস্তিক বলিয়া, তাঁহাদের নিম-ন্ত্রণ রহিত করিবেন। কেহ কেহ কহিলেন, "যদি আমাদিগের অন্যের দ্বারে যাইতে না হয়, জীবিকা-নির্ব্বাহের এরূপ সংস্থান করিয়া দিতে পারেন, তবে মুক্তকণ্ঠে আমাদিগের মত প্রচারিত করিতে পারি। রাজার তাদৃশ ধন ছিল না, সুতরাং তাঁহাদের আনু-কূল্য পাইলেন না। এই সময়ে, তিনি মধ্যে মধ্যে অত্যন্ত আক্ষেপ পূর্ব্বক কহিতেন "যদি আমার ন্যায় আমার পূর্ব্বপুরুষদিগের ইচ্ছা থাকিত, কিম্বা তাঁহাদের তুল্য আমার বিভব ও প্রভুত্ব রহিত, তাহা হইলে, বঙ্গদেশের এ সকল দূষিত আচার ব্যব-হারের সংস্কার করা ঈদৃশ দুরূহ হইত না। যাহা হউক, তিনি আপন অভিপ্রেত সাধনে হতাশ হন নাই।

১২৪৩ কি ৪৪ বাঃ অব্দে, কৃষ্ণনগর নিবাসী দেশহিতৈষী শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রসাদ লাহিড়ী নিজ নিকেতনে এক অবৈতনিক

ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তিনি একাদশ কি দ্বাদশ বৎসর বয়সে, কলিকাতার সুবিখ্যাত হেয়ার সাহেবের স্কুলে প্রবিষ্ট হন, এবং সে বিদ্যালয়ের অধ্যয়ন সমাপন করিয়া বাটী আইসেন। তিনি আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রম পূর্ব্বক অধ্যাপনা করিতেন, এবং দরিদ্র ছাত্রগণকে পাঠ্য পুস্তক ও কাগজ কলম দিতেন। এই সকল কারণে, অনতিকাল মধ্যে, তাঁহার বিদ্যা-লয়ে অনেক বালক পড়িতে লাগিল। ইদানীং এ প্রদেশে ইঙ্গরাজি বিদ্যা শিক্ষার যেরূপ আগ্রহ হইয়াছে, তদানীং সেরূপ ছিল না, তথাপি, ছাত্রের সংখ্যা প্রায় এক শত হইয়াছিল। শ্রীপ্রসাদের অগ্রজ সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রামতনু লাহিড়ী, সে সময়ে, কলিকাতার হিন্দু কালেজের এক জন শিক্ষক ছিলেন। তিনি অবকাশ মতে যখন বাটী আসিতেন, তখন এই বিদ্যা-লয়ের ছাত্রগণকে ধর্ম্ম-সংক্রান্ত নানা প্রকার সদুপদেশ দিতেন। তৎকালে, শ্রীপ্রসাদের স্বদেশীয় প্রচলিত ধর্ম্মের প্রতি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ছিল, সুতরাং, তিনি, প্রথমে এই ধর্ম্ম বিরুদ্ধ কোন উপদেশ দিতেন না। কিয়ৎকালানন্তর, তিনি ও তাঁহার সমবয়স্ক দুই তিন জন ছাত্র স্বদেশের ধর্ম্ম ও রীতিনীতির গুণাগুণের বিষয় আলোচনা করিতে আরম্ভ করেন, এবং ক্রমশঃ সাকার উপাসনার অলীকতা ও প্রচলিত আচার ব্যবহারের দোষ গুণ বুঝিতে পারেন। তিনি পূর্ব্বে ছাত্রগণের মনোবৃত্তির উন্নতিসাধনে যেমন যত্ন করিতেন, ইদানীং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎকর্ষ সম্পন্ন করণেও তেমনি যত্নবান্ হইলেন।

কিছুদিন পরে, তিনি এবং তাঁহার মতাবলম্বী ছাত্রগণ আপন আপন প্রতিবেশী ও আত্মীয় গণের কুসংস্কার দূরীভূত করিতে প্রগাঢ় যত্ন করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে, সোনডেঙ্গানিবাসী অধুনা

কৃষ্ণনগরবাসী শ্রীযুক্ত ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় এই নগরস্থ মিশনরি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন; মিশনরিরা তাঁহাকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী করিতে বহু প্রয়াস পাইয়াছিলেন, কিন্তু সফলযত্ন হইতে পারেন নাই। তিনি এক ব্রহ্মবাদী হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু খৃষ্টের ঈশ্বরত্বের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস হয় নাই। তিনিও শ্রীপ্রসাদের অনুকরণ করিয়া আপনার ছাত্র ও বান্ধবদিগের দূষিত সংস্কার সকল দূরীভূত করণে প্রবৃত্ত হন; এইরূপে কৃষ্ণনগরে প্রচলিত ধর্ম্মের বিপ্লব হইয়া উঠে। ক্রমে ক্রমে নগরের অনেক যুবা এই অভিনব মতের অনুরাগী হইলেন; যদিও তাঁহাদের বাহ্যিক ভাবের বড় বৈলক্ষণ্য হইল না, কিন্তু আন্তরিক ভাবের প্রভূত পরিবর্ত্তন হইল। নূতন সম্প্রদায়ের আন্তরিক ভাব যে এক কালে সাধারণের অগোচর ছিল এমনও নহে, নগরের অনেক প্রধানবংশোদ্ভূত যুবকগণ ঐ সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া ছিলেন, এবং রাজা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও আদর করিতেন, এই বলিয়া, কোন গোলযোগ উপস্থিত হইত না। ১৮১৬ খৃঃঅব্দে, মহামতি লার্ড হারডিঞ্জ মহোদয় কর্ত্তৃক কৃষ্ণনগরে কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইলে, শ্রীপ্রসাদ আপন ছাত্রগণকে ঐ বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট করাইয়া নিজের স্কুল উঠাইয়া দিলেন। তাঁহার ছাত্রদিগের মধ্যে, শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র দত্ত ও শ্রীনাথ সেন প্রভৃতি কয়েক জন, কালেজের প্রথম বৎসরের পরীক্ষাতেই জুনিয়ার ছাত্রবৃত্তি পান।

১৮৩৭ খৃঃঅব্দে, রাজা শ্রীশচন্দ্র ইঙ্গরেজি ভাষা পড়িতে আরম্ভ করেন। তাঁহার এই বিদ্যা শিখিবার বিলক্ষণ আগ্রহ ছিল, কিন্তু সর্ব্বদা বিষয় ব্যাপারে ব্যাপৃত ও বিবিধ সাংসারিক কার্য্যে অস্থির চিত্ত থাকাতে তিনি যথোচিত মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না। তথাচ ইউরোপের অনেক রীতিনীতি জানিতে পারিবেন বলিয়া

তাহাতে অনুরাগী হন; কিন্তু তৎকালে পিতার ভয়ে, চিত্তগত ভাব প্রকাশ বা মনোমত কার্য্য করিতে পারেন নাই; কেবল গোপনে নবসম্প্রদায়কে উৎসাহ প্রদান করেন। পূর্ব্বে সাধারণ বালকদিগের সহিত একাসনে উপবেশন ও কালেজের সাধারণ নিয়ম পালন করিতে হইবে বলিয়া, এদেশস্থ পুরাতন রাজবংশোদ্ভূত ভূম্যধিকারীরা, আপনাদের পুত্রগণকে কোন কালেজে বা স্কুলে দিতেন না। রাজা গিরীশচন্দ্রের পরলোক গমনের পর, রাজা শ্রীশচন্দ্র, ঐ প্রথা অবহেলন করিয়া, আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার সতীশ চন্দ্রকে কৃষ্ণনগর কালেজে অধ্যয়ন করিতে দিলেন এবং আপনি কালেজ কমিটীর সভ্য হইলেন। তিনি, এই কমিটীর প্রতি অধিবেশন কালে উপস্থিত হইয়া, সভার কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন, এবং প্রতিবৎসর ছাত্রগণের বঙ্গভাষার পরীক্ষার ভার লইতেন।

তিনি ১৮৪৪ খৃঃঅব্দে, এপ্রদেশস্থ তিন ব্যক্তিকে ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়া, রাজা রামমোহন রায়ের স্থাপিত কলিকাতার তদানীন্তন ব্রাহ্ম সমাজের প্রণীত ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের নিয়ম পত্রে তাঁহাদের স্বাক্ষর করাইলেন, এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম বিস্তার করণার্থ একজন বেদবিৎ উপদেষ্টাকে পাঠাইতে, তৎকালীন উক্ত সমাজাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পত্র লিখিলেন। তিনি সহসা বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত না পাইয়া, হাজারি লাল নামে একজন ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারককে পাঠাইয়া দিলেন। হাজারি একে শূদ্র জাতি, তাহাতে আবার সুন্দর বেদবেত্তা ছিলেন না, একারণ রাজা সাতিশয় ক্ষুণ্ণমনা হইলেন। তৎকালে রাজার নিকট ভাটপাড়ানিবাসী গোবিন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশ নামে একজন পণ্ডিত ছিলেন; তিনি বেদান্ত ও ন্যায় প্রভৃতি শাস্ত্রে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন, কিন্তু লোক-

নিন্দাভয়ে, প্রকাশ্য রূপে বেদান্তধর্ম্ম প্রচারে সম্মত ছিলেন না; সুতরাং রাজা, হাজারিকে তৎক্ষণাৎ বিদায় না করিয়া, রাজবাটীতে তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন। দুই তিন দিবস পরে, রাজা কোন প্রয়োজনানুরোধে মুরশিদাবাদে গমন করিলেন, এবং হাজারি ও ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়ের প্রতি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের ভার অর্পণ করিয়া গেলেন। রাজা মাসাবধি মুরশিদাবাদে অবস্থান করেন; এই কাল মধ্যে কৃষ্ণনগরে প্রায় চল্লিশ জন যুবা ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইলেন, এবং জ্যৈষ্ঠ কি আষাঢ় মাসে দুই বুধবারে, সকলে একত্রিত হইয়া, পরব্রহ্মের উপাসনা করিলেন। রাজা, শূদ্র জাতীয় হাজারি সমাজের উপাচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন শুনিয়া সাতিশয় বিরক্ত হইলেন, এবং বাটী প্রত্যাগত হইয়া ব্রাহ্মদিগকে রাজবাটীতে সমাজ করিতে নিষেধ করিলেন। ব্রাহ্মগণ, আমিনবাজারে একটি ক্ষুদ্র বাটী ভাড়া করিয়া, তন্মধ্যে সমাজ সংস্থাপন করিলেন; এবং আপাততঃ ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায় উপাচার্য্যের কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অল্পদিন মধ্যেই, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক জন বেদবেত্তা ব্রাহ্মণ উপাচার্য্য প্রেরণ করিলেন। ব্রাহ্মগণের শ্রেণী যেমন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, নগর মধ্যে এ বিষয়ের আন্দোলনও তেমনি হইয়া উঠিল। গ্রামান্তরবাসী যাঁহারা বিষয়কর্ম্মোপলক্ষে গোয়াড়িতে বাস করেন, তাঁহারা ব্রাহ্ম ধর্ম্মের অত্যন্ত বিদ্বেষী হইলেন। তাঁহারা বীরনগর-নিবাসী শ্রীযুক্ত বামনদাস মুখোপাধ্যায়কে সহায় করিয়া, গোয়াড়িতে এক ধর্ম্মসভা প্রতিষ্ঠিত করিলেন, এবং ব্রাহ্মদিগের অনিষ্ট সাধনে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইলেন, কিন্তু মহারাজা ব্রাহ্মগণের স্বপক্ষ থাকাতে, ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নতি ব্যতীত অবনতি হইল না। কিছু দিন

পরে, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনুকূল্যে ও ব্রাহ্মগণের প্রযত্নে, ১৭৬৯ শকে (১৮৪৭ খৃঃ অব্দে) বর্ত্তমান সমাজ মন্দির নির্ম্মিত হইল। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, এই গৃহ নির্ম্মাণার্থ, এক সহস্র টাকা দান করেন।

রাজা বেদানুমোদিত পরব্রহ্মের আরাধনা প্রচলিত করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, তথাপি বিধবাকামিনীদিগের অবস্থা এক দিনের নিমিত্তও বিস্মৃত হন নাই। তিনি এই স্থির করিয়াছিলেন যে, এ প্রদেশে বিধবা বিবাহ প্রচলিত করা শাস্ত্রের সহায়তায় যতদূর হইবেক, কেবল যুক্তি অবলম্বন করিলে তত দূর হইবেক না; একারণ, যদ্যপিও এ দেশস্থ পণ্ডিতগণ বিধবাবিবাহ শাস্ত্রানুমোদিত স্বীকার করিয়াও তাহার ব্যবস্থা দিতে অসম্মত হন, তথাপি রাজা, এই ব্যবস্থা পাইবার নিমিত্ত, বিবিধ কৌশল অবলম্বন করেন। অবশেষে, নবদ্বীপস্থ কয়েক জন পণ্ডিতও পুরস্কার লাভাশয়ে ব্যবস্থা দিতে সম্মত হন। ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ হইতেছে, এমন সময়ে, নগরস্থ নব্য সম্প্রদায় সহসা এখানকার কালেজ গৃহে এক সভা করিয়া স্বদেশের প্রচলিত রীতিনীতির বহুবিধ নিন্দাবাদ করণানন্তর বিধবাবিবাহ প্রচলিত করিতে যথাসাধ্য যত্ন করিবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বিরুদ্ধবাদিগণ, নবমতাবলম্বীরা কালেজে একত্র হইয়া স্বহস্তে গোহত্যা করিয়া, তাহার মাংস ভোজন ও মদিরা পান করিয়াছেন, এইরূপ অপবাদ সর্ব্বত্র রটনা করিয়া দিলেন। এই অমূলক কথা দূর ও অদূরবর্ত্তী নানা স্থানে আন্দোলিত হইতে লাগিল। প্রথমে, বীরনগরবাসী বামনদাস মুখোপাধ্যায় আপন সম্পর্কীয় বালকগণের কালেজে যাওয়া রহিত করিলেন, এবং দুই তিন দিনের

মধ্যে অনেক ভদ্র লোক তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুগামী হইলেন। কালেজে এরূপ সভা করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন বলিয়া, কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক কালেজের অধ্যক্ষ তিরস্কৃত হইলেন। মহারাজা, যাহাতে কালেজের হানি না হয়, তদ্বিষয়ে সাতিশয় যত্ন করিতে লাগিলেন। কিছু দিন পরেই, উপরোক্ত জনরবের মূল বৃত্তান্ত প্রচারিত হইল, এবং যে সকল বালক কালেজ পরিত্যাগ করিয়াছিল, তাহারা পুনরায় কালেজে প্রবেশ করিল, কিন্তু নগর মধ্যে এক বিষম দলাদলি হইয়া উঠিল। যাহা হউক, মহারাজার আনুকূল্য প্রযুক্ত নবদল সবল থাকিল, এবং দুই তিন বৎসরের মধ্যে, সমস্ত গোল তিরোহিত হইল। রাজা যে ব্যবস্থা লইবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন, তাহা এই গোলযোগে বিফল হইয়া গেল।

এই নগরের মিশনরি স্কুলে অনেক দরিদ্র বালক অধ্যয়ন করিত। মিশনরিগণ ছাত্রদিগকে খৃষ্টীয় ধর্ম্মাবলম্বী করণার্থ, হিন্দুধর্ম্মের অলীকতা ও খৃষ্টীয় ধর্ম্মের সত্যতা প্রতীতি করাইবার নিমিত্ত, যথাসাধ্য প্রয়াস পাইতেন। তাঁহাদের উপদেশে, ছাত্রদিগের স্বদেশের ধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা জন্মিত, কিন্তু উপদেষ্টাদিগের ধর্ম্মের প্রতিও বিশ্বাস হইত না; তাঁহারা কেবল নিরাকার-বাদী হইয়া উঠিতেন। পরে নগরে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইলে, অনেকেই ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে লাগিলেন, সুতরাং মিশনরিদিগের অভীষ্ট কোন মতে সিদ্ধ হইত না। বহু কালের পর, তাঁহাদের স্কুলের এদেশস্থ একজন খৃষ্টীয়-ধর্ম্মাবলম্বী শিক্ষক, কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত ভাৎজাংলা গ্রাম-বাসী চিন্তামণি নামক এক জন অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ব্রাহ্মণ বালককে নানা কৌশলে খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে সম্মত

করেন। এক জন মিশনরি সাহেব তাহাকে নিজ নিকেতনে রাখেন, বালকের পিতা এই সংবাদ পাইয়া, প্রথমতঃ ঐ মিশনরি সাহেবের বাটী গমন পূর্ব্বক পুত্রকে গৃহে আনিবার জন্য অনেক যত্ন পাইলেন। গৃহে আসা সুদূরপরাহত, পিতা, পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করিতেও পারিলেন না। দুর্ভাগ্য পিতা অতঃপর উপযুক্ত ধর্ম্মাধিকরণে মিশনরিদিগের নামে অভিযোগ করিলেন; কিন্তু বিচারেও পরাজিত হইলেন। অনতিকাল মধ্যে, পুত্র খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। মিশনরিদিগের এইরূপ ব্যবহার ও ধর্ম্মাধ্যক্ষের এইরূপ বিচার দর্শনে, অনেকেই, সাতিশয় শঙ্কিত হইয়া, আপন আপন বাটীর বালকগণের মিশনরি বিদ্যালয়ে যাওয়া রহিত করিলেন। তৎকালে কালেজ ও মিশনরি স্কুল ব্যতীত, এ নগরে অন্য বিদ্যালয় ছিল না; মিশনরি স্কুলে যে সকল বালক অধ্যয়ন করিত, তাহাদের কর্ত্তৃপক্ষদের এরূপ সঙ্গতি ছিল না, যে, তাহাদিগকে কালেজে দেন; সুতরাং নির্ধন বালকদিগের শিক্ষা এককালে রহিত হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠিল। যদ্যপিও তৎকালে, রাজা শ্রীশচন্দ্রের অবস্থা বড় ভাল ছিল না, তথাপি তিনি, করুণা-পরবশ হইয়া, আপন ভবনে এক অবৈতনিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিলেন; এই বিদ্যালয় অনেক দিবস উত্তম রূপে চলিয়াছিল। যৎকালে, লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর হেলিডে সাহেব কৃষ্ণনগরে আগমন করেন, তখন তিনি, এই স্কুল দেখিয়া, সাতিশয় সন্তুষ্ট হন।

রাজা, বাল্যাবস্থা হইতে পৈঁত্রিশ বর্ষ বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত, নিজের ও স্বদেশের হিত-চিন্তনে ও মঙ্গল-সাধনে সতত রত ছিলেন। তাহার পর, কলিকাতা-বাসী কতিপয় মধুর-ভাষী ধন-শালী ব্যক্তির সুধাচ্ছাদিত বিষপূরিত সংসর্গে তাঁহার আন্তরিক

ও বাহ্যিক ভাবের বিস্তর বিপর্য্যয় হইল। তাঁহার বিষয় কার্য্যে মনোনিবেশ করা অতি ক্লেশকর জ্ঞান হইতে লাগিল, এবং সুহৃদ্বর্গের সুহৃদ্বাক্য কর্ণকুহরে কণ্টকবৎ বোধ হইয়া উঠিল। আহার, বিহার, শয়ন, সকলই নিয়ম বহির্ভূত হইতে আরম্ভ হইল; দিবানিশি, কেবল মদিরা পানে ও গীতবাদ্যের আমোদে কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। দুই বৎসর মধ্যে, তাঁহার মনোবৃত্তি নিস্তেজ হইয়া উঠিল এবং শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল; অবশেষে, ১২৬৩ বাং অব্দের অগ্রহায়ণ মাসের ত্রয়োবিংশ দিবসে, ৩৮ বৎসর বয়সে, অকালে, কালগ্রাসে পতিত হইলেন।

শ্রীশচন্দ্র শ্রীমান্ ও বলবান্ ছিলেন; তাঁহার ন্যায় সুশীল, মিষ্টভাষী, নিরহঙ্কৃত, ও অক্রোধ পুরুষ, ধনবান্ লোকের মধ্যে অতি বিরল। তিনি বাল্যাবস্থায়, সংস্কৃত বিদ্যা ভালরূপে শিক্ষা করেন নাই, কিন্তু যৌবনাবস্থায়, সর্ব্বদা মনু, স্মৃতি, ভগবদ্গীতা, বেদান্ত ইত্যাদি শাস্ত্রের অনুশীলন ও পণ্ডিতগণের সহিত তাহার আলোচনা করিয়া, এতদূর ব্যুৎপত্তি লাভ করেন যে, প্রায় সকল সংস্কৃত গ্রন্থেরই মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরাশরোক্ত যে বচন মূল করিয়া, মহামতি শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বিধবা-বিবাহের অখণ্ডনীয় ব্যবস্থা দেন, রাজা, অনেক দিন পূর্ব্বে, সেই বচন সহায় করিয়া, বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন, এবং যখন বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহিত তাঁহার প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন তিনি বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গে, ঐ বচন উল্লেখ করেন। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল, বাঙ্গালাতে তাঁহার তুল্য সুগায়ক অল্প লোক জন্মিয়াছিলেন। তাঁহার বিষয়-বুদ্ধিও অতি চমৎকার ছিল; তিনি স্বয়ং বিবেচনা না করিয়া আপন কর্ম্মচারী বা

মোক্তার ও উকিলকে কোন কার্য্য করিতে অনুমতি দিতেন না। এই সকল কারণে এফ, জে, হেলিডে সাহেব, তাঁহাকে সাতিশয় ভাল বাসিতেন। সংস্কৃত ও ইঙ্গরেজি উভয় বিদ্যার উন্নতি বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট উৎসাহ ও যত্ন ছিল। অধ্যাপকগণকে যথা-সাধ্য আনুকূল্য করিতেন এবং তাঁহাদের টোলের ব্যয়ের জন্য বার্ষিক বৃত্তিও দিতেন। কৃষ্ণনগর কালেজ গৃহ নির্ম্মাণার্থ এ জেলার সমস্ত ভূম্যধিকারী অপেক্ষা, অধিক অর্থ প্রদান এবং ঐ বাটীর জন্য, তাঁহার অধিকারস্থ যে ভূমির প্রয়োজন হয়, তাহা দান করেন। কৃষ্ণনগরের গবর্ণমেণ্টের দাতব্য চিকিৎসালয় সংস্থাপনে যথেষ্ট আনুকূল্য করেন, এবং ঐ চিকিৎসাগৃহের নিমিত্ত যে ভূমির প্রয়ো-জন হয়, তাহাও দান করেন, অধিকন্তু মাসিক ২০ টাকা করিয়া চাঁদা দিতেন। এই চিকিৎসালয় ১৮৪৯ খৃঃ অব্দে সংস্থাপিত হয়।

শ্রীশচন্দ্রের তিন পুত্র ও এক কন্যা জন্মে, তন্মধ্যে দ্বিতীয় পুত্র সূতিকাগারে ও তৃতীয় পুত্র কুমার ক্ষৌশচন্দ্র ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে, গতাসু হন। বেলগড়িয়া-বাসী ফুলের মুখটী শ্রীযুক্ত অঘোরচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত রাজকুমারী কালীকুমারীর বিবাহ হয়। রাজদুহিতার ভরণ পোষণের জন্য, রাজা বার্ষিক দুই সহস্র টাকা বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন। জ্যেষ্ঠ পুত্র কুমার সতীশ চন্দ্র বিষয়াধিকারী হন।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

যখন মহারাজা শ্রীশচন্দ্র লোকান্তর গমন করেন, তখন কুমার সতীশ চন্দ্রের বয়ঃক্রম বিংশতি বৎসর। ১২৪৪ বাঃ অব্দে, ইঁহার

জন্ম হয়; ইনি কৃষ্ণনগর কালেজে অধ্যয়ন করেন; যদিও পাঠ অধিক করেন নাই, কিন্তু বাল্যাবস্থাবধি সর্ব্বদা ভদ্র ইঙ্গরেজদিগের সংসর্গে থাকাতে, অবিকল উচ্চশ্রেণীস্থ ইঙ্গরেজের ন্যায়, ইঙ্গরেজী ভাষা কহিতেন। পিতা বর্ত্তমানে, তিনি কখন বিষয় ব্যাপারে লিপ্ত হন নাই, কেবল আমোদ প্রমোদে কাল যাপন করিতেন। এক্ষণে বিষয়াধিকারী হইয়াও প্রকৃত প্রস্তাবে বিষয়ের ভার গ্রহণ করিলেন না; তাঁহার পিতার সময়ে, যিনি দেওয়ান ছিলেন, তিনিও তাঁহাকেই দেওয়ানী পদে নিযুক্ত রাখিলেন এবং তাঁহার উপর সমস্ত কার্য্যের ভার অর্পণ করিলেন। এই দেওয়ান তদীয় বাল্যাবস্থায় তাঁহার শিক্ষক ছিলেন এবং তাঁহাকে পুত্র নির্ব্বিশেষে স্নেহ করিতেন। দেওয়ান অভিনব রাজাকে বিষয় কার্য্যে আবিষ্ট করিবার নিমিত্ত, বহুতর যত্ন পাইলেন, কিন্তু কোন প্রকারে পূর্ণ মনোরথ হইতে পারিলেন না। যাহা হউক, তিনি বিষয় কার্য্যে মনোযোগ না দেওয়াতে তাঁহার কোন অনিষ্ট হয় নাই; দেওয়ান প্রাণপণে সকল কার্য্য সম্পাদন করিতে লাগিলেন। রাজা শ্রীশ-চন্দ্র একলক্ষ পঞ্চাশ সহস্র টাকার অধিক ঋণ্ রাখিয়া গিয়াছিলেন, এবং অনেক মহালের অনেক অগ্রিম কর লইয়াছিলেন। এই আগামী খাজানা লওয়াতে, তৎকালে জমীদারীর আয় এত অল্প হইয়াছিল যে, সাংসারিক সমুদয় ব্যয় নির্ব্বাহ করণানন্তর প্রায় কিছুই উদ্বৃত্ত থাকিত না; সুতরাং জমীদারীর উৎপন্ন হইতে ঋণ পরিশোধের উপায় ছিল না; একারণ জমীদারীর কিয়দংশ পত্তনী দিয়া পণ গ্রহণ পূর্ব্বক ঋণ পরিশোধ করিতে হইয়াছিল। সৌভাগ্যক্রমে পত্তনী দেওয়াতে পূর্ব্ব জমার কিছু মাত্র হ্রাস হয় নাই, বরং বৃদ্ধি হইয়াছিল। খাস মহালের ভাল রূপ তত্ত্বা-বধারণ করাতে, ক্রমশঃ জমীদারীর আয়েরও অনেক বৃদ্ধি হইল।

সতীশচন্দ্র, বিষয়াধিকারী হইবার অব্যবহিত পরেই গবর্ণমেণ্ট হইতে পৈতৃক উপাধি ও খেলেত্ প্রাপ্ত হন। ইনি, ইঁহার পিতামহ মহারাজা গিরীশচন্দ্রের ন্যায়, আয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, কেবল ব্যয় করা ভাল বাসিতেন, এবং অতিশয় ভ্রমণ-প্রিয় ছিলেন। প্রায় প্রতিবৎসর বর্ষাকালে, পশ্চিমদেশ ও পর্ব্বত প্রদেশ পর্য্যটন করিতেন এবং দুর্গোৎসবের অব্যবহিত পূর্ব্বে বাটী আসিতেন; কিন্তু ১২৭৭ বাঃ অব্দের আষাঢ় মাসে, যে গমন করিলেন, আর প্রত্যাগমন করিলেন না। যাওয়ার সময়, তাঁহার শরীর অসুস্থ ছিল, একারণ, যাহাতে তাঁহার যাওয়া না হয়, তদ্বিষয়ে তাঁহার রাণী ও আত্মীয় স্বজন সকলেই বিবিধ প্রকার যত্ন করেন, কিন্তু তিনি, তাঁহাদের কথা উপেক্ষা করিয়া, যাত্রা করিলেন এবং কাশী ও আগ্রায় কিছু দিন যাপন করিয়া, অবশেষে মসুরি শৈলে অবস্থিত হইলেন। পূজার সময়ে তাঁহাকে বাটী আনিবার জন্য মহারাণী অনেক প্রকার যত্ন করিলেন, কিন্তু কোন মতেই আনিতে পারিলেন না। পরে, ১ লা কার্ত্তিক, অপরিমিত সুরাপান জনিত উৎকট পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ৯ম দিবসে (১৮৭০ খৃঃ অব্দের ২৫ অক্টোবর) মানব লীলা সম্বরণ করিলেন। হরিদ্বারে তাঁহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া সম্পাদিত হইল। যদিচ তদীয় পিতা রাজা শ্রীশচন্দ্রও অকালে প্রাণত্যাগ করেন, তথাপি তাঁহার উপযুক্ত পুত্র বর্ত্তমান থাকাতে, পুরবাসীদিগের বিশেষ শোকানুভব হয় নাই। কিন্তু সতীশচন্দ্র অসময়ে বিগত-জীবন হওয়াতে সকলের শোকের সীমা থাকিল না।

সতীশচন্দ্রের স্বভাব অতীব সুমধুর ছিল; অহঙ্কার, অভিমান, দ্বেষ, হিংসা, তাঁহার হৃদয়ে কখন স্থান পায় নাই। যিনি তাঁহার সহিত একবার আলাপ করিয়াছেন, তিনি আর তাঁহাকে

কস্মিন্‌কালে বিস্মৃত হইতে পারেন নাই। রাজা যেমন সুশীল, তেমনি দয়াশীল ছিলেন, তাঁহার অন্তঃকরণ দয়ার আকর ছিল। কি স্বজাতি কি বিজাতি, কি স্বদেশী কি বিদেশী, কি আশ্রিত কি অনাশ্রিত, সকলেরই প্রতি তিনি দয়া করিতেন, এবং স্বীয় অপকার করিয়াও পরোপকার সাধনে তৎপর হইতেন। ইউরোপ দেশীয় রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের নিরতিশয় অনুরাগী ছিলেন। যে সকল ইউরোপীয়দিগের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল; তাঁহারা সকলেই তাঁহার প্রতি সাতিশয় শ্রদ্ধা ও অনুরাগ করিতেন। তিনি, মধ্যে মধ্যে, অত্রত্য ভদ্র ইঙ্গরাজ ও অধিবাসীদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, রাজবাটীতে একত্রিত করিতেন। ইহাতে উভয় সম্প্রদায়ই, পরস্পরের আলাপে সাতিশয় আনন্দিত ও প্রীত হইতেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পরেই, কৃষ্ণনগর কালেজে, ছাত্রদিগের পারিতোষিক প্রদান উপলক্ষে, যে সভা হয়, তাহাতে কালেজের অধ্যক্ষ স্যামুয়েল লব সাহেব, বহু বিলাপ পূর্ব্বক, কহেন "এখানকার ইংরেজ ও বাঙ্গালীদিগের মধ্যে মহারাজা গ্রন্থিস্বরূপ ছিলেন, তাঁহার অভাবে সেই গ্রন্থি ছিন্ন হইয়াছে, এবং অচিরাৎ আর কেহ যে ঐ রূপ গ্রন্থিস্বরূপ হইবেন তাহারও প্রত্যাশা নাই।"

রাজার, প্রথমে, এক সর্ব্বসুলক্ষণা বালিকার সহিত বিবাহের সম্বন্ধ হয়; ঐ কামিনী, কৃষ্ণনগরে আনীত হইলে, বিবাহের নিরূপিত দিবসের তিন দিন পূর্ব্বে, হঠাৎ ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইয়া পরলোক গমন করেন। রাজা শ্রীশচন্দ্র, উদ্বাহের সমস্ত আয়োজন হইয়াছে, এবং নানা স্থান হইতে নিমন্ত্রিত কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি সমূহ সমুপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া, নির্দ্ধারিত দিবসেই এ পরিণয় সংস্কার সম্পাদন করিবার সংকল্প

করিলেন, এবং নবদ্বীপনিবাসী রাজপুরোহিত-বংশোদ্ভূতা এক বালিকার সহিত বিবাহ স্থির করিয়া, তাঁহাকে আনিতে লোক পাঠাইলেন। ঐ বালিকার সহিত বিবাহের প্রস্তাব পুর্ব্বেও হইয়াছিল, কিন্তু বালিকাটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী নয় বলিয়া, পূর্ব্বোক্ত কামিনীর সহিত বিবাহ স্থির হয়। কাহার ভাগ্যে কখন কি ঘটে তাহা কিছুই বলা যায় না; যে দিনে ও যে পথে অর্দ্ধবিবাহিতা রাজপুত্র-বধূর মৃত দেহ দাহনার্থ নবদ্বীপাভিমুখে লইয়া যায়, সেই দিনে ও সেই পথে, ভাবি রাজপুত্র-বধূকে, যথোচিত আড়ম্বর পূর্ব্বক, নবদ্বীপ হইতে আনা হয়। এক জনের মৃত শরীর বংশে বন্ধন করিয়া, তাঁহার আত্মীয় স্বজন, রোদন করিতে করিতে, লইয়া যাইতেছে; আর এক জনকে, সুসজ্জীভূত যানে আরোহণ করাইয়া, তাঁহার বন্ধু বান্ধবগণ উল্লাস পূর্ব্বক লইয়া আসিতেছে। উদ্বাহ কার্য্য বহু সমৃদ্ধি ও আনন্দের সহিত সম্পাদিত হইল বটে, কিন্তু পরিণয়টি সুখের হইল না। যদিও নববধূ বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী ও গুণবতী ছিলেন, কিন্তু সম্পূর্ণ রূপবতী না থাকাতে, এবং রমণীর কালস্বরূপ বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকাতে, তিনি শ্বশুর শ্বাশুড়ী বা স্বামী কাহারও স্নেহপাত্রী হইতে পারিলেন না। বিবাহের কয়েক বর্ষ পরেই, রাজা ও রাজ্ঞী উভয়েই মনোমত কামিনীর অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, এবং ১২৬৩ বাঃ অব্দের বৈশাখ মাসে, বালীনিবাসী হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের পরম সুন্দরী দুহিতার সহিত সতীশচন্দ্রের বিবাহ দিলেন। উভয় মহিষীই অপুত্রবতী থাকাতে, রাজা সতীশচন্দ্র, ১২৬৬ বাঃ অব্দের ভাদ্র মাসের সপ্তম দিবস, এইরূপ এক অনুমতি পত্র করিলেন যে "রাজ্ঞীরা যদি পুত্রবতী না হন, তাহা হইলে, আমার অবর্ত্তমানে, কনিষ্ঠা রাণী দত্তক গ্রহণ করিবেন। যদি তিনি দত্তক না লন,

তবে জ্যেষ্ঠা রাজ্ঞী লইবেন।" এই অনুমতি পত্র হওয়ার কিয়ৎ-কালানন্তর, জ্যেষ্ঠা রাণী বিগত-জীবন হইলেন। কিছু কাল পরে, রাজা দত্তক গ্রহণের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই তিনি পরলোক গমন করিলেন।

মহারাজা লোকান্তর গমন করিলে, তাঁহার কনিষ্ঠা পত্নী মহা-রাণী ভুবনেশ্বরী পতির সমগ্র সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন; এবং কমিশনর সাহেবের উপদেশানুসারে, ১২৭৭ বাঃ অব্দের ২২শে পৌষ, (১৮৭১ খৃঃ অব্দের ৫ই জানুয়ারি) স্বীয় সমস্ত সম্পত্তির কর্ত্তৃত্বভার কোর্ট অব ওয়ার্ডসের প্রতি অর্পণ করেন। আর ১২৭৮ বাঃ অব্দের অগ্রহায়ণ মাসের ৯ম দিবসে, (১৮৭১ খৃঃ অব্দের ২৪ নবেম্বরে) নদীয়া জেলার অন্তর্গত আড়পাড়া-নিবাসী শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১) নামক জনৈক ভঙ্গ কুলীনের পুত্রকে দত্তক গ্রহণ করিয়াছেন। দত্তক গ্রহণ সময়ে এই জেলার জজ সর উইলিয়ম হর্শেল সাহেব, কালেক্টর সি, সি, ষ্টিবনস্ সাহেব এবং ডবলিউ বি, ওলডহাম সাহেব প্রভৃতি কয়েক জন রাজপুরুষ এবং এ প্রদেশস্থ অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তি সমাগত হইয়াছিলেন। দত্তক পুত্র ক্ষিতীশচন্দ্র নামে খ্যাত হইয়াছেন। কুমারটি অসা-ধারণ বুদ্ধিমান্। ১২৭৫ বাঃ অব্দের ৩০ বৈশাখ ইহাঁর জন্ম হয়।

সমাপ্ত।

(১) ইনি রাজা ভবানন্দের পুত্র গোবিন্দদেবের পুত্রের দৌহিত্রের বংশোদ্ভূত।

পরিশিষ্ট।

এই রাজবংশীয়েরা যে যে স্থানে বাস করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহার বিবরণ।

কাশীনাথ রায়ের কয়েক পূর্ব্বপুরুষ কিশোরগ্রামে ও কয়েক পূর্ব্ব পুরুষ কাঁকদি গ্রামে বাস করেন; কাশীনাথ কাঁকদি হইতে এ প্রদেশে আইসেন। তাঁহার অগ্রজ বাণীপতি রায়ের বংশ কাঁকদি ও গোবরাগোবিন্দপুর গ্রামে আছেন। কাশীনাথের পুত্র রামচন্দ্র সমাদ্দার বাগোয়ানে থাকেন; রামচন্দ্রের পুত্রাদির মধ্যে, ভবানন্দ প্রথমে বাগোয়ানে ও পরে মাটিয়ারিতে বাস করেন, জগদীশের সন্তানেরা কুড়ুলগাছি, হরিবল্লভের সন্তানেরা ফতেপুর, এবং সুবুদ্ধির সন্তানেরা পাটকাবাড়ি, রাঢ়িপাড়া, বাদ তেহট্ট ও বড়গাছিতে বাস করিতেছেন। ভবানন্দের পুত্রদিগের মধ্যে, গোপাল মাটিয়ারিতেই থাকেন, শ্রীকৃষ্ণের সন্তানেরা শ্রীকৃষ্ণপুর, শিবালয় সন্তোষপুর, ও কোড়কদি গ্রামে, এবং গোবিন্দের সন্তানেরা গোটপাড়া, আড়পাড়া, বামনপুখরিয়া, আকাইপুর, ঘাটেশ্বর বেজপাড়া, নবদ্বীপ, দিগম্বরপুর, জয়রামপুর, ও খাসকুল গ্রামে অবস্থান করিতেছেন। গোপালের তিন পুত্রের মধ্যে, রাঘব কৃষ্ণনগরে উপনিবেশ করেন, নরেন্দ্রের পর-পুরুষেরা নবলা, সিমলা, আনুলে, দুর্গাপুর ও শাল গাঁ গ্রামে, এবং রামেশ্বরের বংশীয়েরা বেড়িপলতায় অবস্থিত আছেন। রাঘবের প্রথম পুত্র রুদ্রনারায়ণ কৃষ্ণনগরেই থাকেন, দ্বিতীয় পুত্র প্রতাপনারায়ণ বাগোয়ানে যাইয়া বাস করেন। রুদ্রের পুত্রদিগের মধ্যে রামজীবন পৈতৃক বাটীতেই থাকেন, রামকৃষ্ণের সন্তানেরা আসান্নগরে আছেন। রামজীবনের পুত্রদের মধ্যে, রঘুরাম কখন কৃষ্ণনগরে

কখন শ্রীনগরে থাকিতেন, রামগোপালের পর-পুরুষেরা কৃষ্ণনগরের সন্নিহিত দোগাছিয়াতে বাস করিতেছেন। রঘুরামের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র প্রথমে কৃষ্ণনগরে ও পরে শিবনিবাসে অবস্থান করেন। ইঁহার প্রথম পুত্র শিবচন্দ্র কখন শিবনিবাসে কখন কৃষ্ণনগরে থাকিতেন; শিবচন্দ্রের সন্তানেরা কৃষ্ণনগরে বাস করিতেছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের অপর পুত্রদিগের মধ্যে শম্ভুচন্দ্রের বংশীয়েরা হরধামে ও ঈশানচন্দ্রের বংশীয়েরা আনন্দধামে বাস করিতেছেন, ভৈরবচন্দ্রের দৌহিত্রের সন্তানেরা এবং মহেশচন্দ্রের পৌত্রের দৌহিত্রগণ কৃষ্ণনগরের চাঁদ-সড়কে আছেন। ভৈরবচন্দ্রের কন্যার বংশের মধ্যে এক্ষণে রায় যদুনাথ রায় বাহাদুর প্রসিদ্ধ।

রঘুরামের জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজেশ্বরীর সন্তানেরা চাঁদসড়কে এবং কনিষ্ঠা কন্যা ভুবনেশ্বরীর সন্তানেরা শিবনিবাসে আছেন। কৃষ্ণচন্দ্রের প্রথমা রাজ্ঞীর কন্যা অন্নপূর্ণার বংশীয়দিগের মধ্যে, কেহ শিবনিবাসে কেহ কৃষ্ণনগরে বাস করিতেছেন। দ্বিতীয়া রাণীর দুহিতা বিশ্বেশ্বরী, দুর্গেশ্বরী, উমেশ্বরী, এই তিন জনের মধ্যে দুর্গেশ্বরীর সন্তানেরা হরধামে আছেন, উমেশ্বরী নিঃসন্তান, বিশ্বেশ্বরীর বংশ ধ্বংস হইয়াছে। শিবচন্দ্রের তনয়া দক্ষিণাকালীর সন্তানেরা কৃষ্ণনগরের দেউলিয়া, এবং শ্রীশচন্দ্রের দুহিতা কালীকুমারীর পুত্র শ্রীযুক্ত শ্যামাধব রায় কৃষ্ণ-নগরে অবস্থান করিতেছেন।

ফরমানের মর্ম্ম।

সম্রাট জাহানগিরের মোহর।

ভবানন্দ চৌধুরীকে বাঙ্গালা সুবার অন্তর্গত নিম্ন লিখিত পরগণা ও মহালের চৌধুরায়ী ও কানুনগুয়ী দেওয়া গেল। তাঁহার কর্ত্তব্য যে যাহাতে এই সকল প্রদেশের হিতসাধন ও অনিষ্ট নিবারণ হয় ও দুর্ব্বলের উপর সবলে দৌরাত্ম্য করিতে না পারে, তদ্বিষয়ে

বিশেষ যত্নবান থাকেন, এবং প্রতিবর্ষের শেষে উক্ত সুবার রাজপুরুষদিগের নিকট ঐ সকল পরগণা ও মহালের জমা ওয়াসিল বাকী প্রভৃতি কাগজ প্রদান করেন। সুবার রাজকর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা উপরি উক্ত ব্যক্তিকে উল্লিখিত রাজদত্ত পদ সকল অর্পণ করেন এবং প্রতি বৎসর ইহার নূতন সনন্দ না চাহেন। ঐ সকল পরগণার অধিবাসীদিগের কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা উক্ত ব্যক্তিকে আপনাদের চৌধুরী ও কানুনগুই জানিয়া তাঁহার পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে থাকেন। তারিখ ১০২২ হিজরি (১)।

সম্রাট সাহা জাহানের মোহর।

ফরমানের মর্ম্ম।

মাটিয়ারি ও আসলামপুর পরগণার চৌধুরী আনন্দ নারায়ণ, আপনার এলাকা অয়রাণ্ করাতে, তাহার মালগুজারী করিতে অশক্ত হইয়া স্বেচ্ছা পূর্ব্বক, ঐ দুই পরগণা প্রজার পরম হিত সাধক রাঘব চৌধুরীর পুত্র বিশ্বনাথের নিকট বিক্রয় করিয়া তাহার কাগজ পত্র অর্পণ করিয়াছে। একারণ এক্ষণে আদেশ করা যাইতেছে যে, বিক্রয়ের সনন্দ অনুসারে উক্ত দুই পরগণায় ক্রেতার নাম জারি করা হয়, এবং ক্রেতা উল্লিখিত পরগণা দ্বয়ের উন্নতি সাধনের

(১) সম্রাট দত্ত যে সকল ফরমান রাজবাটীতে ছিল, তাহার অধিকাংশ ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। ইদানীং অষ্টাদশ খানি মাত্র রাজবাটীতে বিদ্যমান আছে। তাহার মধ্যেও কোন কোন ফরমানের অক্ষর সকল এত বিকলাঙ্গ হইয়া গিয়াছে যে, তাহা পাঠ করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিয়াছে। রাজা মানসিংহ ভবানন্দকে প্রথমে মহৎপুর প্রভৃতি যে কয়েক পরগণা দেন, তাহার ফরমান রাজবাটীতে আছে। কিন্তু তাহার কোন কোন স্থানের অক্ষর সকল এক কালে নষ্ট হইয়া যাওয়াতে তাহার মর্ম্ম লিখিতে পারিলাম না। ঐ ফরমানের তারিখ ১০১৫ হিজরি।

প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সরকারের যথোচিত মালগুজারী করেন, এবং কোন জমীদারকে আপন অধিকারের উপর অত্যাচার করিতে না দেন। আর কোন ব্যক্তি এই আদেশের অন্যথাচরণ না করেন। তারিখ ১০৬৬ হিজরি।

সম্রাট আলমগিরের মোহর।

ফরমানের মর্ম্ম।

বিদিত হইল যে বাঙ্গালা সুবার অধীন সলিমাবাদ সরকারের অন্তর্গত মূলগড় পরগণা ও সপ্তগ্রাম সরকারের অন্তর্ভূত আঙ্গুরীয়া পরগণার চৌধুরী বিষ্ণুদেব, রাঘবানন্দ, রঘুনাথ ও রামবিনোদ মালগুজারী করিতে অসমর্থ হইয়া পলাইয়াছে, এবং ১০৮০ হিজরি অব্দে মূলগড়ে এগার হাজার ও আঙ্গুরীয়ায় আড়াই হাজার টাকা মালগুজারী বাকী পড়িয়াছে। উখড়া প্রভৃতি পরগণার চৌধুরী রুদ্র জমীদারীর উন্নতি সাধন ও সরকারের মালগুজারী যথোচিত-রূপে প্রদান করিয়া থাকেন এবং ঐ দুই পরগণার বাকী খাজানা সরকারে দাখিল করিলেন। একারণ উক্ত দুই পরগণার চৌধু-রায়ী, তালুকদারী ও জমীদারী পূর্ব্বোক্ত চৌধুরীদিগের হস্ত-বহির্ভূত করিয়া ইহাঁকে অর্পণ করা গেল। বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ মুতসদ্দি-দিগের কর্ত্তব্য যে, ইহাঁর চৌধুরায়ী ও জমীদারী পদ বলবৎ রাখেন, ইহাঁকে নানকার প্রভৃতি কার্য্য যথারীতি অর্পণ করেন, এবং ইহাঁর কাগজ পত্র ও দস্তখৎ মাতব্বর বলিয়া জ্ঞান করেন। ইহাঁর কর্ত্তব্য যে সরকারের মঙ্গলাভিলাষী থাকেন, রাইয়তদিগকে স্বচ্ছন্দে রাখেন, তাহাদের স্থানে নিষিদ্ধ আবোয়াব ও অতিরিক্ত খাজানা না চাহেন এবং কৃত্রিম হিসাব প্রস্তুত বা অন্য কোনরূপ মন্দ ব্যবহার না করেন। তারিখ দ্বাবিংশ জলুস।

ফরমানের মর্ম্ম।

সম্রাট আমলগিরের মোহর।

সুবে বাঙ্গালার অন্তর্গত সপ্তগ্রাম ও সলিমাবাদের অন্তর্ভূত পৃষ্ঠের লিখিত নদীয়া ও উখড়া প্রভৃতি পরগণার রাজকর্ম্মচারিদিগকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে রাজদত্ত ফরমান ও অন্য অন্য সনন্দ অনুসারে ভবানন্দের পৌত্র রাঘবের ঐ সকল পরগণার চৌধুরায়ী, কানুনগুয়ী এবং জমীদারীতে অধিকার ছিল। রাঘব নানকারও ঐ সকল কর্ম্ম আপন জীবদ্দশায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রকে দিয়া যান এবং কাজির ও আপনার মোহর করা পত্র দেন। আর উজিরের নিকট হইতে সনন্দ দেওয়ান। রাঘবের কনিষ্ঠ পুত্র প্রতাপনারায়ণ প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিতেন, এবং পিতার সহিত নানাবিধ অসদ্ব্যবহার করিয়া স্থানান্তরে থাকিতেন, এ কারণ রাঘব তাঁহাকে বিষয়ের অনধিকারী করেন। পরে, নদীয়া, মহৎপুর, আসলামপুর ও মাটিয়ারি প্রভৃতি যে সকল পরগণা পূর্ব্বরীত্যনুসারে তাঁহার নিজস্ব হইয়াছিল, তদ্ব্যতিরেকে অন্যান্য মহালের দশমাংশ জ্যেষ্ঠ পুত্র রুদ্রকে ও ষষ্ঠাংশ কনিষ্ঠপুত্র প্রতাপনারায়ণকে দেন। রুদ্র প্রতাপনারায়ণকে সম্মত করিয়া তাঁহাকে বাগওয়ান প্রভৃতি কয়েক পরগণা প্রদানপূর্ব্বক অবশিষ্ট সমস্ত পরগণা আপনি অধিকার করিয়া সরকারের মালগুজারী দিতেছেন এবং প্রজাদিগের সহিত সুহৃদ্ব্যবহার করিতেছেন। এক্ষণে তিনি এই বিষয়ের ফরমান পাইবার প্রার্থনা করাতে, হুজুরের ফরমান ও বিক্রয় পত্র দৃষ্টি করিয়া এই আদেশ করা যাইতেছে যে, উল্লিখিত সমস্ত মহালের চৌধুরায়ী, কানুনগুয়ী এবং

জমীদারী সম্পূর্ণরূপে রুদ্রেরই থাকিবে। তাঁহার কর্ত্তব্য যে জমীদারীর ও রাইয়তের অবস্থার উন্নতি সাধনে বিশেষ যত্ন করেন এবং রাইয়তের স্থানে নির্দ্ধারিত কর অপেক্ষা এক কপর্দ্দক অধিক না লন; কৃষক ও অন্য অন্য রাইয়তকে তুষ্ট রাখেন এবং কেহ তাহাদের প্রতি অত্যাচার করিতে না পারে তদ্বিষয়ে বিশেষ যত্নবান্ থাকেন। বৎসরের শেষে মহালের কাগজ সুবার দেওয়ানের নিকট দাখিল করেন এবং চৌধুরায়ী ও কানুনগুয়ীর রসুম ও জমীদারীর মালিকানা ধারাবাহিকরূপে আদায় করিতে থাকেন। ইহা ব্যতীত রাইয়তের নিকট কোন অন্যায্য দাওয়া না করেন। সুবার সমস্ত কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্য যে ইহাঁকে উক্ত সমস্ত মহালের চৌধুরায়ী, কানুনগুয়ী এবং জমীদারী প্রদান করেন ও কোন ব্যক্তিকে ইহাঁর সহাধিকারী করিয়া না দেন। আর, রাইয়তদিগের কর্ত্তব্য যে তাহারা ইহাঁর উপদেশের বহির্ভূত না হন এবং কেহ ইহাঁর স্থানে প্রতিবৎসর নূতন রাজ সনন্দ না চাহে। তারিখ ঊনবিংশ জলুস।

ফরমানের মর্ম্ম।

সম্রাট আলমগিরের মোহর।

অবগতি হইল যে সপ্তগ্রাম ও সলিমাবাদ সরকারের অন্তর্গত উখড়া, নদীয়া ও পাঁচ নগর প্রভৃতির জমীদার রাজা রুদ্র সরকারের হিতাকাঙ্ক্ষী, এবং যথা নিয়মে মালগুজারী করিয়া থাকেন ও হুজুরের ফরমান এবং পৃষ্ঠের লিখিত অন্য অন্য বিশিষ্ট সনন্দ ইহার হস্তে আছে। এ কারণ, তাঁহার উল্লিখিত পরগণা সমূহের দরবস্ত জমীদারী ও চৌধুরায়ী পূর্ব্ব রীত্যনুসারে বহাল রাখা গেল। বর্ত্তমান ও ভাবিকালের রাজকর্ম্মচারীদিগের কর্ত্তব্য যে তাঁহারা, এই আজ্ঞার অনুবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে স্বীয় পদে

প্রতিষ্ঠিত রাখেন, চৌধুরায়ী ও নানকারের রস্তুম পূর্ব্বমত গ্রহণ করিতে দেন এবং তাঁহার কাগজ পত্র ও দস্তখৎ মাতব্বর বলিয়া জ্ঞান করেন। তাঁহার কর্ত্তব্য যে সর্ব্বদা সরকারের সহিত সদ্ব্যবহার করেন, সরকারের মঙ্গলাভিলাষী থাকেন, এবং প্রজাপুঞ্জের হিত সাধনে তৎপর রহেন।

ফরমানের মর্ম্ম।

সম্রাট সাহা আলমের মোহর।

একান্ত রাজানুগত, বিবিধ গুণান্বিত এবং রাজানুগ্রহের যোগ্য পাত্র মহারাজেন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র বাহাদুর জ্ঞাত হইবে যে বর্ত্তমান শুভ সময়ে তোমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক মহারাজেন্দ্র বাহাদুর উপাধি, পতাকা, নাকারা, ঝালরদার পাল্‌কি প্রদান করা গেল। তোমার কর্ত্তব্য যে এই অসীম অনুগ্রহের নিমিত্ত আপনাকে চরিতার্থ জ্ঞান করিয়া সকৃতজ্ঞ চিত্তে বাদসাহীর মঙ্গল সাধনে তৎপর থাক। তারিখ সপ্তম জলুস।

ফরমানের মর্ম্ম।

গবর্ণর জেনেরল ড্যালহৌসি বাহাদুরের মোহর।

Dalhousie

নদীয়ার জমীদার মহারাজা শ্রীশচন্দ্র রায় বাহাদুরের পূর্ব্ব পুরুষ কর্ত্তৃক সরকারের হিতসাধনের এবং ইহাঁর নিজের সচ্চরিত্রের

বিষয় যশোহর বিভাগের কমিশনর সাহেবের দ্বারা অবগত হইয়া ইহাকে মহারাজা বাহাদুর উপাধি এবং তদুপযুক্ত মর্য্যাদা সূচক পরিচ্ছদ প্রদান করা গেল। এই বিশেষ অনুগ্রহের নিমিত্ত ইহাঁর কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও সৎক্রিয়ান্বিত হইয়া সরকারের হিত সাধনে তৎপর থাকেন। তারিখ, ১৮৪৮ সাল ২৭এ জুলাই।

পং আরজবেগী বসু।

কৃষ্ণনগর চাকলার সোনদহ ও খাঁপুরের ইজারদারের গোমস্তা প্রতি আগে। নদিয়ার রামভদ্র সিদ্ধান্তের পৌত্র শ্রীরামসুন্দর ভট্টাচার্য্য ও উযুতপুরের শ্রীরতিকান্ত মুহরির দুইজনে বৃত্তির ভূমি লইয়া বিরোধ করিয়া আসিয়াছিল। মুকাবিলায় জিজ্ঞাসা করা গেল ভট্টাচার্য্য কহিলা সোনদহ খাঁপুরে আমার বহালবৃত্তির ভূমি যে আছে তাহা কারসাজি করিয়া মুহরির ভোগ করেন। মুহরির কহিলা আমার পৈতৃক বহাল বৃত্তির ভূমি অবিরোধে অনেক কালাবধি ভোগ করিয়া আসিতেছি ভট্টাচার্যর ভূমির সহিত আমার বিষয় কি। পরে মুহরির স্থানে ভূমির সনদ চাহিলে কহিলেন সনদ পত্র যে ছিল তাহা কালক্রমে নষ্ট হইয়াছে তাহার নমুদ কিছু নাহি। ভট্টাচার্য মিত্র দেওয়ানের দস্তখতি বহালি ফর্দ্দ দৃষ্ট করাইলা এবং আর আর লিখনও আছে পরে সন্দেহ প্রযুক্ত এবিষয় তহকিক করিয়া আনিতে দুই গ্রামের কর্ম্মচারি ও হালসানার নামে লিখন গিয়াছিল তাহারা ওয়াকিবহাল প্রজা লইয়া তজবিজ করিয়া যে লিখিয়াছে তাহা দৃষ্ট হইল সোনদহের কর্ম্মচারি লিখিয়াছে

এ ভূমি ভট্টাচার্য্যেরদিগের বহালবৃত্তির পূর্ব্ব ভট্টাচার্য্যরা জোত-দারের স্থানে খাজানা লইয়া যাইতেন পরে বৎসর কয়েক মুহরিরা লইয়াছেন। খাঁপুরের কর্ম্মচারি লিখিয়াছে ভট্টাচার্য্যর বহালবৃত্তির ভূমি শ্রীরঘুনাথ মুহরিরের দখলে আছে তাহার পুত্র রতিকান্ত জোত-দারের স্থানে খাজানা লইয়া যান ইহাতে রতিকান্তের বৃত্তি ছাবেত্ হয় না এ বিষয় আদালতে এই নিষ্পত্তি করিয়া দেওয়া গেল মুহরির সনদ পত্র কিছু দিতে পারিল না কর্ম্মচারিরা ওয়াকেবহাল প্রজা লইয়া তজবিজ করিয়া যে লিখিয়াছে তাহাতে ভট্টাচার্য্যের বৃত্তির ভূমি প্রমান হইল অতএব মিত্র দেওয়ানের দস্তখতি ফর্দ্দ দৃষ্টে ভট্টাচার্য্যকে ভূমিতে দখল দিবা রতিকান্ত এভূমির খাজানা যে লইয়াছেন তাহা ভট্টাচার্য্যকে ফিরিয়া দিবেন। ইতি সন ১১৮৬ ৬ জ্যৈষ্ঠস্য সহি।

কৃষ্ণনগরের গোমস্তা প্রতিআগে।

কৃষ্ণনগরের গোবিন্দ চাটুয্যারা তিন সহোদর ছিলা চাটু-য্যার বহালবৃত্তির বাটী ও বাগিচা ও ভূম্যাদি লইয়া তাঁহার দুই ভ্রাতা পূর্ব্ব বিরোধ করিয়াছিলা তাহাতে স্বাক্ষর লিখন ক্রমে আমিন নীলকণ্ঠ রায় ও কালিদাস সিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য ও কৃষ্ণ মুখর্য্যা ও মুক্তিরাম মুখর্য্যা ইহারা তজবিজ করিয়া নিষ্পত্তি করিয়া দিয়া ফারখত লিখাইয়া দিয়াছেন ফারখতে রায় আমি-নের দস্তখতে ৺ নামও আছে কালিদাস সিদ্ধান্তের অক্ষরও

জানা গেল অতএব যে ফারখত পূর্ব্ব হইয়াছে সেই প্রমান বাগিচা ও বাটী গোবিন্দ চাটুর্য্যারই আছে গোবিন্দের ভ্রাতার সন্তানের দিগের সহিত তাহার দাওয়ার বিষয় নাহি গোবিন্দের দুই পুত্র রামনাথ ও গোকুল ছিলা রামনাথের পুত্র সন্তান নাহি তাঁহার দৌহিত্র হরিনদীর শ্রীমনোহর বখসী ও গোকুলের পুত্র শ্রীফকির চাটুর্য্যা ইহারা দুইজনে গোবিন্দের বাটী ও বাগিচা ও ভূম্যাদির বিরোধ করিয়া এখানে আসিয়াছিলা তাহাতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ব্যবস্থা-নুসারে রামনাথের অংশ তাঁহার দৌহিত্র মনোহর বখসী পাইলা বসতিও সপরিবারে রামনাথের বাটীতে করিতেছেন যেখানে ভূম্যাদি থাকে এইমত দখল দেয়াবা গোকুলের অংশ ফকির চাটুর্য্যা-রই আছে এই নিষ্পত্তি হইল ইহার অতিক্রম করিয়া কেহ কখন বিরোধ করিতে না পারেন তাহা করিবা ইতি সন ১১৮৭ সাল ২৫ জ্যৈষ্ঠস্য শ্রী—

রাজাদিগের জন্মতিথিকৃত্যে যথাশাস্ত্র মহোৎসব হইয়া থাকে। জন্মদিনে "স্বনক্ষত্রঞ্চাপি পিতরৌ তথা দেবপ্রজাপতিঃ" এই শাস্ত্রা-নুসারে পিতৃপূজার বিধি থাকাতে রাজকুমারেরা পূজার অন্যান্য উপচারের সহিত পিতৃবন্দনার সংস্কৃত কবিতা লিখিয়া দিতেন এবং রাজারাও তৎকালে সংস্কৃত শ্লোকে প্রত্যুত্তর-ব্যাজে পুত্রদিগকে আশী-র্ব্বচন প্রয়োগ করিতেন। তদানীন্তন রাজা ও রাজকুমারদিগের সংস্কৃত ভাষায় কিরূপ ব্যুৎপত্তি ও কিরূপ অনুরাগ ছিল, তৎপ্রদর্শনার্থ নিম্নে উক্ত বিষয়ের কতিপয় কবিতা উদ্ধৃত হইল।

যুবরাজ শিবচন্দ্র বাহাদুরের লিখিত কবিতা।

প্রজানামীশত্বাৎ সলিলনিধিকন্যাদৃততয়া
বিভূত্যা যুক্তত্বাদ্বিধিহরিমহেশৈশ্চ সমতা।
ভবাস্তে ভূপৌঘার্চ্চিতচরণ তেষাং পুনরহো
ন চ ত্রিত্বং কস্মিন্ ত্বয়ি জনক নিত্যং ত্রিতয়তাং॥

বর্ষান্তরে তদীয় কবিতা।

আত্মীয়ানুগচক্রবাকনিকরে দুর্হৃচ্চকোরব্রজে
দৌঃশীল্যানয়গামিনেত্রকুমুদে সল্লোকহৃৎপঙ্কজে।
দারিদ্র্যালয়কুজ্ঝটৌ শ্রুতিপথব্যক্তীকৃতৌ সর্ব্বদা
তাত ক্ষমাপতিবৃন্দসেবিত নমঃ সূর্য্যায়মাণায় তে॥

প্রত্যুত্তর আজ্ঞা।

ভক্ত্যা নির্ম্মলয়া তথা কবিতয়া পূজোপচারাদিনা
প্রীতোঽহং ভবতাং সতাং প্রতিদিনং প্রাণাধিকানাং তথা।
প্রীতির্ম্মিত্রকলত্রসন্ততিগণৈঃ পুত্রৈশ্চিরংজীবিভি-
স্তেষামপ্যনুবাসরং ভবতু সা যুষ্মাসু ভক্তিঃ স্থিরা॥

মধ্যম রাজকুমার কৃত কবিতা।

ভূদেবেন্দ্রং মহীন্দ্রং গুণগণনিলয়ং রাজরাজেন্দ্রসংজ্ঞং
নানাশাস্ত্রাভিরামং নিখিলজনহিতং ধীরধীরং সুসেব্যম্।
শ্রীমন্তং ধর্ম্মরূপং হরিহরচরণাম্ভোজযুগ্মৈকচিত্তং
ধ্যাত্বা স্তুত্বা শরণ্যং নৃপমুকুটমণিং তাতমগ্র্যং নমামি॥

চতুর্থ রাজকুমারের কৃত কবিতা।

শ্রীমহারাজরাজেন্দ্র প্রসীদ কৃপয়া পিতঃ।
কঃ প্রসাদয়িতুং শক্তঃ শক্তিস্ত্বয্যেব সর্ব্বিকা॥
যত্র শ্রীমান্ কবীন্দ্রো নৃপতিবর মহারাজরাজাধিরাজ-
স্তদ্বদ্ভোস্তৎকনীয়ান্ নৃপতিকুলতিলকঃ শ্রীমহেশোমহেশঃ।
তস্যাং শ্রীমৎসভায়াং মম বচনমহো বালকস্যেব সত্যং
তত্তাত ত্বৎপদাব্জেঽবরমপি রমতে যৎ সুধা শৈশবোক্তিঃ॥
নমঃ পদাব্জায় মনোরমায় মিত্রপ্রিয়ায়াশ্রিততাপহায়।
সদ্ভক্তহৃৎস্বচ্ছজলালয়ায় রজঃপবিত্রায় লসদ্দলায়॥

কনিষ্ঠ রাজকুমারের কৃত কবিতা।

প্রেষিতং ভক্তিতঃ স্তোকং পূজোপকরণং পিতঃ।
গৃহাণ কৃপয়া ভূপ ভূপালভালভূষণ॥
নৃপতিগণকিরীটস্থায়িরত্নাংশুজালৈ-
র্দিনকরকরবিম্বৈঃ শোভিতং লোভিতঞ্চ।
প্রণতজনসমূহস্বান্তমাধ্বীকপানাং
জনকপদসরোজং সাদরোঽহং নমামি॥

বর্ষান্তরে ছোট রাজকুমারের কৃত কবিতা।

যং পার্থং প্রবদন্তি ভার-তরণপ্রখ্যাতকীর্ত্ত্যা বুধাঃ
সিন্ধুং কেচন বাহিনীপতিতয়া কেচিৎ সুধাদীধিতিম্।
ত্রৈলোক্যে করসঞ্চরেণ চ মহাসেনাশ্রয়ত্বাৎ শিবং
গোবিন্দং বসুদেবতোষকতয়া তং তাতমীশম্ভজে॥

বর্ষান্তরে চতুর্থ রাজকুমারের কৃত কবিতা।

নো চিন্তামণিরিষ্যতে স তু যতশ্চিন্ত্যার্থমাত্রপ্রদ-
শ্চিন্তাতীতশুভন্দদাতি সততন্তাত ত্বদঙ্ঘ্রিদ্বয়ম্।
পদ্মং মিত্রবিকাশকং বিকশিতঞ্চন্দ্রেণ খে রাজিতং
সেবাপ্যস্য সুখাপ্তিকেত্যবনমন্নাশ্রেয়সারম্ভজে॥

বর্ষান্তরে ছোট রাজকুমারের কৃত কবিতা।

ক্ষৌণীত্বং ক্ষময়া দধাসি জলতাং স্নেহাশ্রয়েণ ক্রুধা
বহ্নিত্বং বলবত্তয়া পবনতাং খত্বং বিভুত্বেন চ।
যাগাদ্যৈর্যজমানতাং তনুরুচা রাত্রীশতামোজসা
সূর্য্যত্বং শিবরূপধারক পিতস্তুভ্যং নমঃ কোটিশঃ॥

রাজা ঈশ্বরচন্দ্রের পৈতৃক জমীদারী লইয়া জ্ঞাতিদিগের সহিত যে মোকদ্দমা হয় তাহাতে পণ্ডিতেরা আপন আপন ব্যবস্থায় যে বাঙ্গালা অনুবাদ করিয়া দেন তাহার প্রতিলিপি।

কৃপারাম তর্কভূষণ, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন এবং হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌমের ব্যবস্থা।

প্রথম রত্নাকরে নারদ মণির বচন স্নেহ প্রযুক্ত পুত্র প্রভৃতিকে দিলে সিদ্ধ হয় দ্বিতীয় বিবাদ চিন্তামণিতে বৃহস্পতি মুণির বচন অনুগ্রহ করিয়া পুত্র প্রভৃতিকে দিলে সিদ্ধ হয় তৃতীয় দায়ভাগ দায়তত্ব রত্নাকর বিবাদ চিন্তামণিতে নারদ মুণির বচন যুদ্ধে প্রাপ্তধন বিবাহ কালে প্রাপ্তধন বিদ্যাধন পিতৃ প্রভৃতির স্থানে প্রসাদলব্ধ ধন এই চারি ধনে অন্য ভ্রাতারা অংশ পান না চতুর্থ দায়ভাগে ব্যাস মুণির বচন পিতৃ পিতৃব্য প্রভৃতির স্থানে প্রসাদ যে পান তাহাতে অন্য ভ্রাতাদিগের অংশ নাই, পঞ্চম দায়ভাগ রত্নাকরে ব্যাস মুণির বচন পিতামহ পিতা মাতা ইহাঁরা প্রীত পূর্ব্বক পৌত্রকে এবং পুত্রকে যাহা দেন তাহাতে ভ্রাতাদিগের অংশ নাই ষষ্ঠ বিবাদ রত্নাকর বিবাদ চিন্তামণিতে বৃহস্পতি মুণির বচন পিতা পিতামহের মরণোত্তর পুত্র পৌত্র যে ধন পায়, তাহার নাম দায়; পথে কুড়াইয়া যে অস্বামিক ধন পায়, তাহার নাম লাভ; মূল্য দিয়া কিনিয়া লয়, তাহার নাম ক্রয়; যুদ্ধে জয় করিয়া লুটিয়া যে ধন পায়, তাহার নাম জয়; কর্জ্জ দিয়া যে সুদ পায়, তাহার নাম প্রয়োগ; কৃষি বাণিজ্যাদি করিয়া যে ধন উপার্জ্জন করে, তাহার নাম কর্ম্মযোগ; বিশিষ্ট লোকের স্থানে ভিক্ষা করিয়া যে ধন পায়, তাহার নাম সৎপ্রতিগ্রহ; এই সাত প্রকার ধনের মধ্যে যে যে ধন স্থাপন গৃহ ক্ষেত্রাদি দেয় তাহা দিতে পারে এই কল্পতরুমত লিখিয়া আপন মত লেখেন রত্নাকরকার যাবত প্রকার ধন উপার্জ্জন পাইয়া থাকে সকল প্রকার উপার্জ্জিত ধন মধ্যে কুটুম্ব ভরণোচিত রাখিয়া অধিক দিতে পারে ইহা দিলে সিদ্ধ হয় ইতি পরের দ্রব্য আপনার স্থানে গচ্ছিত যে থাকে তাহা দিতে পারেনা দিলেও সিদ্ধ হয় না ইতি

বিবাদ চিন্তামণিতে এইরূপই অর্থ ইতি বিবাদ চিন্তামণিকার স্মৃতি-সারের মত লিখেন যদি কুটুম্ব ভরণোচিত দ্রব্য না রাখিয়া সর্ব্বস্ব দান করে তথাপিও দান সিদ্ধ হয় কিন্তু দাতার পাপ হয় কুটুম্ব ভরণ বাদ করিয়া সকল স্থাবর দান নিষিদ্ধ ইতি এখানে নিষেধ কখনই দান করিলেই দান সিদ্ধ হয় কিন্তু দাতার অধর্ম্ম হয় যদি সদ্বচন দানাভাব বোধক থাকে তথাপি যে দান হইয়াছে তাহা অসিদ্ধ হয় না দান করিলে অধর্ম্ম হয়, পিতৃমরণাদির পর যে দ্রব্য পাঁচ ভ্রাতার অধিকার যে খানে হইয়াছে সে খানে এক ভ্রাতা অন্য ভ্রাতার অনুমতি ব্যতিরেকে যে দ্রব্য দিলে দান সিদ্ধ হয় কিন্তু উভয়রি অংশের মত দান সিদ্ধ হয় অতএব আপন মাত্রের ধন যদি কেহ দেয় তবে অবশ্য সিদ্ধ হয় এই স্মৃতিসারাদি অনেক গ্রন্থকার সম্মত দায়ভাগ ধৃত যাজ্ঞবল্ক্য বচনানুসারে পিতামহ স্থাবরাদিতে পিতা পুত্র দুয়েরি সমান স্বামিত্ব অতএব পিতা দিলেও পুত্রাংশের দান হয় না এই রূপ প্রকার তাহাতে অত্যন্ত দোষ হয় এই কারণ জীমুতবাহন আর প্রকার অর্থ করেন এই বচন যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় বিভাগ প্রকরণে আছে যদি পিতামহ বর্ত্তমানে পিতা মরেণ সে সময়ে পৌত্র বাঁচিলে তখন পিতামহ ধনে পিতার যেমন স্বামিত্ব হইত পৌত্রেরও তেমতি স্বামিত্ব হয় অতএব আঁপন পিতৃব্যের স্থানে পিতৃযোগ্য অংশ পৌত্র লইবেন এই একত্র পিতা পুত্র দুয়েরি স্বামিত্ব হয় এমত অর্থ নয় তাহাতে দেবল মুনির বচন ইহাতে পিতৃ বর্ত্তমানে তাঁহার ধনে পুত্রের স্বামিত্ব হয় না এই অর্থ স্বার্জ্জিত ধন পর দেবল মুনির বচন ইহা কহেন প্রমাণ নাহি। স্মার্ত্তভট্টাচার্য্য প্রভৃতিও এমতি বাক্যার্থ করেন। পিতার অনুগ্রহে বস্ত্রালঙ্কার ভোগ হয় স্থাবর ভোগ হয় না, এই রূপ প্রকার ইহাতে সমাধা যদি দান সিদ্ধ না হয় এ বচনের অর্থ তবে জীমুত বাহনের গ্রন্থ লগ্ন হয় না অতএব পূর্ব্ব বচনের মত স্থাব দানেতে পিতার পাপ হয় এই বচনার্থ এবং স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের মতে এই অর্থ বাল্মীকি রামায়ণ অযোধ্যা কাণ্ডে দশরথের পৈতৃক রাজ

রামে সমর্পণ প্রস্তাবে কৈকেয়ীর প্রতি মন্থরার বাক্য রাম রাজা হইলে ইহাঁর পুত্র রাজা হইবেন এই ক্রমে ইহারি বংশে রাজা হইবেন ভরত বংশে রাজা হইবেন না পর বচনের অর্থ রাজারা জ্যেষ্ঠ পুত্রে রাজ্য সমর্পণ করেন জেষ্ঠ পুত্র নির্গুণ হইলে ইতর পুত্রে গুণ থাকিলে তাহাকেই সমর্পণ করেন জ্যেষ্ঠ পুত্রের গুণ থাকিলে তাহাকে অবশ্য রাজ্য সমর্পণ করেন ভ্রাতাকে রাজ্য দেন না ইতি ইহা বুঝিয়া যদি গুণবান জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দান করেন তবে অবশ্য সিদ্ধ হয় পিতার আজ্ঞা ব্যতিরেকে পিতার অভিমত কর্ম্ম যে করে সেই উত্তম পুত্র পিতার আজ্ঞায় যে পিতার অভিমত কর্ম্ম করে সে মধ্যম পিতার আজ্ঞাতেও যে না করে সে পুত্র মল স্বরূপ ইতি অতএব সে পিতার ধনে অধিকারী নহে আমাদের পুরুষানুক্রমে কখন রাজ্য বিভাগ হয় নাহি এই কথা যদি দান পত্রে লেখা থাকে পশ্চাৎ যদি কোন পুরুষে রাজ্য বিভাগ প্রতিপন্ন হয় তাহাতেও দান অসিদ্ধ হয় এ সব শাস্ত্রে নাহি তথাহি বিবাদ রত্নাকর চিন্তামণিতে নারদ মুনির বচন ইনি আমার এই উপকার করিবেন এই ভ্রমে যদি দান করে যদি বা সে উপকার সে ব্যক্তি না করে তবেই দান অসিদ্ধ ইহাই অর্থ।

মুরশিদাবাদের পণ্ডিতগণের ব্যবস্থার ভাষ্যার্থ কনিষ্ঠ পুত্রদিগের জীবনোপভোগী ধন নির্ব্বন্ধ করিয়া দিয়া জ্যেষ্ঠ পুত্রকে নিজ পৈতৃক জমীদারী দান করিয়াছে জেষ্ঠপুত্র তৎকালাবধি সেই জমীদারী ভোগ করিয়াছে এরূপ দান সিদ্ধ হয় ইহা অন্যথা হয় না অতএব কনিষ্ঠ পুত্রেরা জমীদারির দাওয়া করিলে অংশ পায় না ইতি সকল শিষ্ট পরম্পরা শাস্ত্রে সম্মত ব্যবস্থিত।

শ্রীগৌরহরি শর্ম্মণঃ।

জাঁহাগির নগরের পণ্ডিতগণের ব্যবস্থার ভাষ্যার্থ।

পিতা যদি পৈতৃক জমীদারী জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দান করিয়া থাকেন কনিষ্ঠ পুত্রদিগের জীবিকা দিয়া থাকেন কনিষ্ঠ পুত্রেরা সম্মতি

ক্রমে গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং পিতা যদবধি দানপত্র দিয়াছেন তদবধি জ্যেষ্ঠ পুত্রও দানপত্রানুসারে জমীদারী আমল করিয়া থাকেন তবে সেই দান সিদ্ধ হয় আর কনিষ্ঠ পুত্রেরা সেই জমীদারীর হিস্যার দাওয়া করিয়া লইতে পারেন না এই দায়ভাগাদি শাস্ত্র সম্মত ব্যবস্থা।

শ্রীরামজীবন বিদ্যালঙ্কার শ্রীরামনাথ বিদ্যাভুষণস্য
শ্রীমহাদেব পঞ্চাননস্য শ্রীপার্ব্বতিচরণ বিদ্যাবাচস্পতি
শ্রীরঘুনাথ বাচস্পতি।

দিনাজপুরের পণ্ডিত দিগের ব্যবস্থার ভাষ্যার্থ।

ছল ব্যতিরেকে দান করিয়া থাকে তবে শাস্ত্রানুসারে এমত দান সিদ্ধ হয় এবং কনিষ্ঠ পুত্রেরা অংশ পায় না ছল ক্রমে দান করিয়া থাকে তবে দান সিদ্ধ হয় না কনিষ্ঠ পুত্রেরা অংশ পায় শাস্ত্রানুসারে এই ব্যবস্থা (১)।

শ্রীসদাসিব শর্ম্মণঃ শ্রীসম্ভুনাথ শর্ম্মণঃ
শ্রীগোকুলচন্দ্র শর্ম্মণঃ শ্রীকালী শঙ্কর শর্ম্মণঃ

বারাণসী ও গয়াবাসী পণ্ডিত গণের ব্যবস্থা পারস্য ভাষায় লিখিত হইয়া আইসে। বারাণসী নিবাসী পণ্ডিত দিগের ব্যবস্থার স্থূল মর্ম্ম এই যে, যদি কোন রাজা, কনিষ্ঠ পুত্রগণকে মোশাহের

---

(১) এই সমস্ত ব্যবস্থার যে অবিকৃত প্রতিলিপি রাজবাটীতে ছিল তাহার অবিকল নকল লিখিলাম। তৎকালীন পণ্ডিত দিগের লিখিবার রীতি প্রদর্শনা আমি ইহার কিছুমাত্র তারতম্য করিলাম না। হ্রস্ব, দীর্ঘ, ছেদ ইত্যা সমস্তই অপরিবর্ত্তিত রহিল।

দিয়া, গুণবান জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্য দান করেন, তবে সে দান শাস্ত্রসিদ্ধ, এবং অন্য পুত্রেরা ঐ রাজ্যের অংশের দাওয়া করিতে পারেন না। যদি কোন জমীদার অন্য পুত্রদিগের মোশাহেরা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া, জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পৈতৃক জমীদারী প্রদান করেন তবে সে দান সিদ্ধ হয়। অপর পুত্রগণ ঐ জমীদারীর অংশ পাইতে পারেন না।

গয়া নিবাসী পণ্ডিত দিগের ব্যবস্থার স্থূল মর্ম্ম এই যে, যদি কোন ব্যক্তি কনিষ্ঠ পুত্রগণকে মোশাহেরা প্রদান পূর্ব্বক জ্যেষ্ঠ পুত্রকে পৈতৃক জমীদারী দান করিয়া দান পত্র লিখিয়া দেন তবে অন্য পুত্রেরা অগ্রজের জীবনাবধি ঐ জমীদারীর অংশের দাওয়া করিতে পারেন না। কিন্তু ঐ অগ্রজ যদি অনুজ বর্ত্তমানে পুত্রকে আবার ঐ জমীদারী দান করেন তবে সে দান সিদ্ধ থাকিতে পারে না। অগ্রজেরা ঐ জমীদারীর অংশ পাইতে পারেন (১)।

---

(১) এই ব্যবস্থাটি নূতন আকারের বোধ হওয়াতে, আমি নবদ্বীপস্থ অধুনাতন স্মার্ত্ত প্রধান ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন প্রভৃতি কতিপয় ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবসায়ীর নিকট ইহার কথা উত্থাপন করিয়াছিলাম, তাঁহারা সকলেই কহিয়াছেন "আমরা এরূপ ব্যবস্থা কখন দৃষ্টি বা শ্রবণ গোচর করি নাই।"

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৩	৩	সুপ্ পুখরিয়া	সুখপুখরিয়া
৪	৬	মহিষপুর	মহেশপুর
৬	৭	প্রশারণ	প্রসারণ
৭	১১	ছেপত্তনি	সে-পত্তনি
১১	২৫	ভৃত্যাদিগের	কর্ম্মচারিগণের
১২	২৩	ব্রহ্মত্তর	ব্রহ্মোত্তর
১৫	৫	ভৃত্যেরা	কর্ম্মচারিগণ
১৯	৬	কখন	কখন কখন
৩০	২	সমাজ্ব চলিত	সমাজে চলিত
৪২	২২	পূর্ব্ব পারস্থ	পূর্ব্বপারস্থ জাতি অ
৪৯	২৫	উদ্ধ	উদ্ধৃত
৫৬	২১	শাত	সাত সাত
৮২	২২	নদীয়	নদীয়া
৮৪	২২	বহূনামাধিষ্ঠানামতঃ	বহূনামধিষ্ঠানমতঃ
৮৮	২০	রাজ্ঞা	রাজ্ঞ
ঐ	২২	উপায়	উপায়ঃ
৯৬	৫	বৈমাত্র	বৈমাত্রেয়
১৩৪	১৬ । ১৮	পুষ্যাপুত্র	পোষ্যপুত্র
১৩৫	১৬	বৈমাত্র	বৈমাত্রেয়
১৪৭	২১	হিমালয়াং	হিমালয়াৎ
১৫৮	৮ ১৮	খুড়তিত	খুড়তুত
১৬২	১১	দিয়াছেন	গিয়াছেন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬৪	১৮	জঙ্গলমর	জঙ্গলময়
১৭০	১৬	সুরধুনী	সুরধূনী
১৭১	৪	লুটিয়া	লুঠিয়া
১৭৪	১৬	স্তুতি	বিনয়
২২৫	১৮	ভট্টাচার্যর	ভট্টাচার্য্যের
২২৬	১	ভট্টাচার্যেরদিগের	ভট্টাচার্য্যদিগের
ঐ	৯	প্রমান	প্রমাণ
ঐ	১৮	চাটুর্য্যারা	চাটুয্যেরা
২৩০	মুনিশব্দ	মণিওমুণি	মুনি
ঐ	১৯	লুটিয়া	লুঠিয়া
২৩২	১৪	মুণি	মুনি
ঐ	১৪	শ্রীসদাসিব	শ্রীসদাশিব
ঐ	ঐ	শ্রীসম্ভুনাথ	শ্রীশম্ভুনাথ